গঞ্জের মানুষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
অসিত সরকার
গ্রন্থনা
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রিট
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

'রা-স্বা'

শ্রীরবীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্তা বীণা মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

৭

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য উপন্যাস ও গল্প

শূন্যের উদ্যান

ভুল সত্য

জীবনপাত্র

ট্যাংকি সাফ

গল্পসংগ্রহ (১ম) (২য়)

সূচীপত্র

একটুখানি বেঁচে থাকা

নদীর ধারে আমার জন্ম।

একটা উপন্যাস লিখেছিলাম, 'আশ্চর্য ভ্রমণ'। তাতে ছিল ইন্দ্রজিৎ নদীকে জিজ্ঞেস করছে—কোথা হইতে আসিতেছ নদী ?

নদী উত্তর দেয়—তোমার শৈশব হইতে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রও গঙ্গাকে অনুরূপ প্রশ্ন করতেন, নদী অন্য রকম উত্তর দিত। অনেকের তা মনে থাকতে পারে।

যে নদীর ধারে আমার জন্ম সেই ব্রহ্মপুত্র আমার ছেলেবেলাকে তার খুঁটে বেঁধে রেখেছে আজও। গৈরিক পলিমাটির স্তর দিয়ে যে মেখে রাখছে আমার শৈশব। তাই পৃথিবীর ওপর বা জীবনের প্রতি আজও তেমন রাগ বা অভিমান অনুভব করতে পারি না, কখনো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় না, কখনো বলিনি —এ জীবনটা কিছুই নয়।

একটা নদী ঐ অতখানি করেছিল।

বাসার সামনে ছিল একটু মাঠ, দাদুর কাছারিঘর, তারপর গরীব বোষ্টম, গয়লা, ঘানিওলা, ধোপাদের কাঁচা ঘর, লাল সুরকির রাস্তার ধারে কদম গাছ, একটা ইস্কুলবাড়ি। এসব স্থাবরতা, পেরিয়ে গেলেই দেখা যেত বহু দূর ভাঙা পাড নেমে গেছে, কাঁটাঝোপ, মানুষের মল, আঘাটায় পচা মুলিবাঁশের কটু গন্ধ কিন্তু চোখ তুলে চাইলেই দেখা যায় সব বন্ধন ছুঁয়ে ছুঁয়ে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়-তার অনন্ত বয়ে-যাওয়া নিয়ে নদী। বড হয়ে এই নদীর কথা যখন লিখছি 'উজান' উপন্যাসে তখন বাহ্য চৈতন্য থাকত না প্রায়ই। বালী স্টেশনের দক্ষিণ ধারে ছোট্ট জনপদ দুর্গাপুর। সেখানে এক ধরের বাসায় থাকি তখন। ধারে কাছে নদীর চিহ্ন নেই। একশ গজ দূর দিয়ে অনবরত লোকাল ট্রেনের যাওয়া-আসা, ভাড়াটে বাড়ির গোলমাল, আর তখন সকাল থেকেই ছিল রাত অবধি অন্নচিন্তা চমৎকার, পাশের বারান্দায় ব্রীজ খেলার ঝগড়া চরমে ওঠে, আমার আট মাসের মেয়ে এসে বার বার হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে নানা শব্দ করে আমার মনোযোগ চায়। কিন্তু তখন আমি কোথায়, কোন গহীন স্মৃতির ডুবজলে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের ধারে ধারে আমার বিচূর্ণ শৈশবের টুকরো কুড়িয়ে জড়ো করছি। কখনো সেই নদী হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুনদী, তার পরপারের অন্ধকারে ঘোরলাগা রহস্যের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে আলেয়ার আলো। সেই নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকতেন আমার দাদু, বড় ঘরের বারান্দায় একটা মস্ত ডেক চেয়ারে। শেষ বয়সে তিনি চেয়ে দেখতেন, ঐ নদীতে বৈতরিণীর

ছায়া পড়েছে। তখন কাছে গেলে তিনি আমাকে চুপ করে ধরে বসে থাকতেন। অনুভব করতেন আমার ভিতরে তাঁর পরোক্ষ বেঁচে থাকা।

মৃত্যু নয়, আয়ুর শেষে এক নদীই বুঝি এসে মানুষকে নিয়ে যায়।

ময়মনসিংহের সেই ব্রহ্মপুত্র ছেড়ে এসেছি কতকাল হয়ে গেল। তবু বারবার সেই নদী ভূগোলের সীমানা ভেঙে বয়ে আসে আমার কাছে। কত নরম পলির স্তর ফেলে যায়। পৃথিবীর ওপর রেগে উঠতে পারি না, জীবনকে মনে হয় না অর্থহীন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের দেশ থেকে আমার মোক্তার দাদু আইনব্যবসার প্রসার জমাতে ময়মনসিংহে এসেছিলেন। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হয়, এখানে ঐ নদীর ধারে আমার জন্ম হবে বলেই যেন তাঁর ঐ আসা।

বাবার চাকরি ছিল রেলে। শৈশব ভাল করে পরিস্ফুট হয়নি তখনো, তার আগেই শুরু হল এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতায়, আর যুদ্ধ থামবার আগেই বাবার সঙ্গে বদলি হয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা সাতঘাটের জল খেয়েছি। বিহার, উত্তর বাংলা, পূর্ব বাংলা, আসাম। এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায়। পিছনে ফেলে এসেছি পুরোনো আসবাব, ছেঁড়া বই, প্রিয় বন্ধু, পোষা কুকুর। কত কেঁদেছি, মনে মনে বলেছি—আমি এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবো না। পরে দেখেছি জীবন যা কেড়ে নেয় তাই ফিরিয়ে দেয় আবার। একটা সরে গিয়ে আর একটার কেমন জায়গা করে দেয়। পুরোনো জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গায় গিয়ে নির্লজ্জের মতো বন্ধু পাতিয়েছি কতজনার সঙ্গে।

একটা গল্প লিখেছিলাম, 'আমি সুমন'। তাতে একটা কোকিলের ডাকের কথা ছিল। কাটিহারে এক শীতের ভোরে আমাদের রেলের বাংলোবাড়ির বাগানে মাদার গাছে একটা কোকিল ডেকেছিল। সে কি ডাক। চরাচর শূন্য করে দিয়ে আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে, কাঁদিয়ে, ভাসিয়ে ভীতত্রস্ত করে ডেকেছিল সেই কোকিল। লিখেছিলাম, পৃথিবীতে হাজার বছরে মাত্র একবারই সে কোকিলের ডাকে, জীবনে আর দ্বিতীয়বার তার ডাক শোনা যায় না।

ভাষা দিয়ে, মানুষের ধ্বনি দিয়ে সব অনুভূতি বোঝানো যায় না। কি করে বোঝাবো সেই কবে কাটিহারের শীতভোরে সেই কোকিলের হু-হু বিষাদভরা আর্তনাদ আমাকে কেমন জাদু করেছিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য এই ঐহিক মর্ত্যভূমি থেকে সে আমাকে তুলে নিল এক অবাস্তব অনুভূতির লোকে। বাগানের মধ্যে আমি অনেকক্ষণ ছোটাছুটি করেছিলাম অস্থিরতায়।

এই রকম অস্থিরতা বার বার এসেছে জীবনে। এক ভুতুড়ে অবাস্তবতার অনুভূতি কোথায় লুকিয়ে থাকত। বুঝি কপাটের আবডালে, দেওয়ালের ওপাশে,

কিংবা বাতাসে জীবাণুর মতো ভেসে বেড়াত। খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, খেলছি, কোথাও কিছু না, হঠাৎ মাথাটা ঝিম করে উঠল, বুক উঠল ঢিপঢিপ করে, তখন চারদিকে চেয়ে কিছুই যেন চিনতে পারতাম না। মনে হত, এ জগৎ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি এখানে কেন? এরা সব কারা? এসব গাছপালা, বাড়ি ঘর এগুলি কি? কেন? এরকম যখন হত তখন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করত ভয়ে। আমার এরকম মনে হচ্ছে কেন? আমি কেন স্বাভাবিক নই? এই অবস্থায় কতবার দেয়ালে মাথা ঠুকেছি, রাস্তার পাথর তুলে হাত থেঁতলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, নিজেকে ব্যথা দিয়ে ফিরে আসবার চেষ্টা করেছি স্বাভাবিকতায়। সেই বয়সে যাকে সব কথা বলা যায় সেই মাকে আমার এই অসুখের কথা বলেছিলাম। মা জ্যোতিষ পেলেই ডেকে আনত, সাধু দেখলেই আমাকে হাজির করত নিয়ে তার কাছে। কিছু হয়নি তাতে। আশৈশব ঐ আশ্চর্য অনুভূতি আমাকে তাড়া করে ফিরেছে।

'দুঃখরোগ' গল্পে, 'যাও পাখি' উপন্যাসে এবং আরো কয়েকটি লেখায় এই অনুভূতির কথা আছে। একটা সৃষ্টিছাড়া গল্প লিখেছিলাম, 'ক্রীড়াভূমি', তার মধ্যে এই অভিজ্ঞতা খুব কাজে লেগেছিল।

আমরা কোথাও স্থিতু হতে পারতাম না। বিহার ছেড়ে উত্তর বাংলা, পূর্ব বাংলা, আসাম কত ঘুরে বেড়িয়েছি। পাহাড়, জঙ্গল, নদী আমার সে বয়সটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নির্জন সব জায়গা, নিঝুম বন পাহাড়, আদিগন্ত চা-বাগান, এ সবই ছিল আমাদের পরিবেশ। মাল জংশন, দোমোহানি, আমিনগাঁও, পাণ্ডু, লামডিং, বদরপুর, আলিপুর দুয়ার, শিলিগুড়ি, কুচবিহার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে শৈশবের অস্তিত্ব।

আমার তুচ্ছ লেখালেখির মধ্যে বার বার এ শৈশবের কথা এসে পড়ে। মুষ্টিমেয় যে ক'জন আমার লেখা পড়েন তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, কেন ছেলেবেলার কথা এত লেখ তুমি?

এ প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে যাই। একবার 'আত্মপ্রকৃতি' নামে একটি গল্পে লিখেছিলাম—ছেলেবেলার পর আমি কি আর বেড়ে উঠিনি? আমার যা কিছু সবই কি সেই শৈশবেই প্রোথিত? এ কি প্রত্নতাত্ত্বিক?

উল্টো করে বলা যায়, সেই শৈশবই যেন তার সময়সীমা অতিক্রম করে চলে আসছে কাছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও চলেছে। জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়লে যখন রহস্য অবসিত হয়, রুক্ষ জীবনের ধুলো আর রোদ ক্লান্ত করে, তখন মাঝে মাঝে ঐ স্মৃতির আশ্চর্য শৈশব থেকেই আসে কুসুম গন্ধ, কোকিলের

অপার্থিব ডাক, নদীর জলের নরম শব্দ। শৈশবের দিকের জানালাটা খুলে মাঝে মাঝে ঝুম হয়ে বসে থাকি। বেঁচে থাকার অনন্ত পিপাসা জেগে ওঠে, বার বার পৃথিবীতে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে।

অপুকেও ছাড়েনি তার নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম। বহু দেশ ঘুরেও সেই প্রকৃতিমুগ্ধ শৈশবপ্রেমিক অপুর কাছে নিশ্চিন্দিপুরই হয়ে রইল মায়ের কোল। কতবার মনে হয়েছে, আমিই অপু। যারা গাঁয়ে গঞ্জে গাছগাছালি, মাঠ, নদীর কাছে বড় হয়েছে তাদের অনেকেরই এরকম মনে হয়।

কিন্তু অনেক ভেবে দেখেছি, শেষ পর্যন্ত আমি অপু নই। যদিও আশ্চর্য শৈশবের নানা বিস্ময়, বর্ণ আর শব্দ আমার চারধারে এক স্বপ্নের ঘেরাটোপ সৃষ্টি করে রেখেছিল, তবু আমি তো ছিলাম না নরম আর ভীতু আর ভাবালুতায় ভরা শিশু। ইস্কুলের একদম নিচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই দামালপনার জন্য মাস্টার-মশাইদের হাতের বেত সপাটে আছড়ে পড়ত হাতের তেলোয়, সর্বাঙ্গে দাগড়া দাগ ফুলে উঠতো দড়ির মতো। বাসায় ফিরে মারখাওয়া রক্তাভ হাত মায়ের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখতাম। প্রায় প্রত্যেক দিন মার খেয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেল। হাতের তেলো দুটো আজও শক্ত। মারপিটে বেশ আগ্রহ ছিল। আমার অত্যাচারে কতবার বাড়ির চাকর পালিয়েছে। দিদির চুলের মুঠি ধরে ঝুলে পড়তাম রাগ হলে, একবার রড নিয়ে মাকে মারতে গিয়েছিলাম ক্ষ্যাপামীর মাথায়। একবার আমার গুলতি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল একটা ছেলে। বন্ধুবান্ধবদের মেরেছি, মার খেয়েছি তাদের হাতে। ছিলাম অসম্ভব রকমের পেটুক, ভীষণ দুষ্টু, দামাল। সবাই আমাকে চিনত দুষ্টু ছেলে বলে। দুষ্টু ছেলেদের তাই আমি বেশ ভাল চিনি। নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করার ঐ হচ্ছে তাদের এক উপায়।

বাড়িতে আমাদের ছিল চূড়ান্ত স্বাধীনতা, নিষেধের বাধা ছিল খুবই কম। বাড়িতে আসত 'শনিবারের চিঠি' আনন্দবাজার আর নানা পত্রপত্রিকা, বই ছিল অনেক। যখন পড়তে শিখিনি তখন মা দুপুরে নিজের পাশটিতে আমাকে শুইয়ে রেখে পড়ে শোনাত মহুয়া পূরবী বা গীতাঞ্জলির কবিতা। আজও মনে পড়ে 'ঝর্না তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা···' শুনতে শুনতে কল্পনায় চলে গেছি গহীন পাহাড়ের নিবিড় অভ্যন্তরে একাকী ঝর্নার পাশে। ঐভাবে বই পড়ার নেশা জেগেছিল। পড়তে শিখবার কিছুকাল পরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' উপন্যাসটি ধারাবাহিক পড়তে থাকি শনিবারের চিঠিতে। সে কি আশ্চর্য রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা! স্থবির শর্মা নামে ছেলেটির সঙ্গে নিজের

আশ্চর্য মিল পেয়ে যাচ্ছি প্রতি মাসে। কত কেঁদেছি সেই উপন্যাস পড়ে। এক মহাপৃথিবীর ডাকে স্থবির বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। ওরকম পালানোর ইচ্ছে জেগেছিল আমারও। কিন্তু স্থবিরের বাবা মহাদেব শর্মার মতো আমার বাবা তো আর নিষ্ঠুর নয় যে, শাসনের অত্যাচারে অসহ্য হয়ে পালাবো! কিন্তু মহাপৃথিবীর মুক্তি আমাকেও ডাকত। সবাইকেই ডাকে। কেউ কেউ চলে যেতে পারে। বাকিরা যায় না। আমি বরাবরই এই পড়ে থাকাদের দলে।

বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমাদের ভাইবোনদের পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছিল। বার বার ইস্কুল বদল, ঠাঁইনাড়া। অবশেষে আমাদের ময়মনসিংহে ফিরে আসতে হল। মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে এক বছর পড়তে না পড়তেই স্বাধীনতা এল। দেশ ভাগ হয়ে গেল। চলে আসতে হল ব্রহ্মপুত্রের প্রিয় সঙ্গ ছেড়ে চিরকালের মতো। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে আমাকে পাঠানো হল কুচবিহার মিশনারী স্কুলের বোর্ডিংয়ে। সেই থেকে দীর্ঘ আঠারো উনিশ বছর আমার কেটেছে বোর্ডিং হোস্টেল আর মেস-এ। খারাপ লাগত না, অভিভাবকহীন নিজস্ব জীবন যাপন করার মধ্যে একটু বুঝি নিজেকে বহন করার আনন্দ আছে। আর এই জীবনই আমাকে ঠেলে দিল এক একাকিত্ববোধের মধ্যে। এই একাকিত্বকে বড ভয় পেয়েছি বরাবর। একা বসে ভুতুড়ে চিন্তা করতে করতে কখন সেই অবাস্তব অনুভূতি এসে বিদ্যুৎস্পর্শে চমকে দিয়ে অস্তিত্বে বিপদের আর্তনাদ তুলে যায়।

সেই একাভাব কাটানোর জন্য সারাদিন ক্রিকেট খেলতাম, বিকেলে মোষের মতো ফুটবল মাঠে লড়ালড়ি করতাম, তীব্র পিপাসায় বন্ধুদের সঙ্গ চাইতাম সব সময়ে। আবার কখনো বসে একটা মোটা বাঁধানো খাতায় আঁকতাম ছবি, কবিতার লাইন মিলিয়েছি, লিখেছি সব ছেলেমানুষী গল্প। এই সব লেখালেখির মধ্যে অমোঘভাবে থাকত বঙ্কিম-শরৎ-রবির ছায়া, কিংবা অন্য কারো। সে বয়সের পক্ষে যথেষ্ট গল্পের বই পড়া ছিল তখন। পড়ার বই ভাল লাগত না, অঙ্ক ছিল বিষ।

স্কুলের পত্রিকার সম্পাদক সনৎ চট্টোপাধ্যায় আমার সেই গোপন খাতা থেকে একটা গল্প ছিঁড়ে নিয়ে ছেপে দিলেন। ছাপা গল্প আর ছাপা নাম দেখে আমার বিস্ময়াবিষ্ট শিহরণ আর ফুরোয় না। গোপনে কতবার যে স্কুল ম্যাগাজিনে নিজের নামটা দেখি আর গল্পটা পড়ি তার হিসেব নেই। স্বদেশী আমল নিয়ে লেখা দেশপ্রেমের গল্প, ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত, তবু ছাপার অক্ষরে সেই গল্পই আমার

ভিতরে নানা উচ্চাশা সঞ্চার করেছিল। তখন জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত, বুদ্ধদেব পড়ি, তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিক পড়া চলছে, নানা পত্রপত্রিকা যোগাড় করে আনি, পড়ার বইয়ের মধ্যে লুকানো গল্পের বই খুলে ক্লাসে এসে গোপনে পড়ে নিই। সেই স্কুলের বোর্ডিংয়ে দুতিনজন সাহিত্যপাগল জুটেছিলাম আমরা।

পাস করে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে আই এস-সি ক্লাসে ভর্তি হই। বোধ হয় তখন ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক গোছের কিছু হওয়ার ইচ্ছে ছিল। সায়েন্স পড়ার খুব একটা ধুম পড়ে গেছে চারধারে। সেই হাওয়া আমারও লাগল। ঘনিয়ে এল অস্তিত্বের আর এক বিপদ। অণুপরমাণুময় এই জগৎকে ধারণা করতে চেষ্টা করেছিলাম, ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম সীমাবদ্ধ মাথায় অসীমের আকার, সময়ের শুরু ও শেষহীন অনন্ত গতিকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম। ঘুলিয়ে তুললাম নিজেকে। চেপে রাখা অবাস্তব অনুভূতি জো পেয়ে এসে ভালুকের মতো চেপে ধরল আমাকে। ছেলেবেলা থেকেই ঐ রোগ। এখন তা আমার চারধারটাকে কেবলই অনুময় মিথ্যে, ধারণাতীত কালসমুদ্রে এক অলীক বাস্তবতায় পরিণত করে দিল। আমি যত আঁকড়ে ধরি আমার চারধারের বাস্তবতাকে, যত স্বাভাবিক হতে চাই তত সে আমাকে বিজ্ঞানের মূল প্রশ্নগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এই সেদিন 'যাও পাখি' উপন্যাসে অজিতের জীবনে এই ঘটনাটির কথা লিখেছি। সেটা পড়ে একটি ছেলে চিঠি লিখে জানিয়েছে, তারও এরকম হয়। হুবহু ঐ অনুভূতি। যখন আমার ওরকম হত তখন কিন্তু অনুরূপ অনুভূতিতে আক্রান্ত কাউকে খুঁজে পাইনি। বিজ্ঞান ছেড়ে একটা বছর সময় নষ্ট করে ভর্তি হলাম আই-এ ক্লাসে। প্রখ্যাত কবি হরপ্রসাদ মিত্র তখন ভিক্টোরিয়া কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। কাছ থেকে একজন কবিকে সেই প্রথম দেখে ঘোর লেগে যেত। মফস্বলের ছেলে, কত কি দেখিনি!

কি নেশা ছিল টেবিল টেনিসে। হোস্টেলে আর কলেজে দুটো বোর্ড ছিল। ক্লাসের ফাঁকে বা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অবিরল খেলে যেতাম। হোস্টেলে সকাল দুপুর রাত যখন হোক, সময় আর সঙ্গী পেলেই ব্যাট বল নিয়ে মেতে যেতাম খেলায়। খেলে খেলে হাত পেকে গেল, ফার্স্ট ইয়ারেই কলেজের সিংগলস চ্যাম্পিয়ন হই। আসলে কিন্তু টেবিল টেনিস খেলায় কিছু একটা করব সেরকম কোনো উচ্চাশা আমার ছিল না। বোধ হয় শারীরিক ব্যস্ততা নিয়ে মেতে থাকার জন্যই ছিল আমার খেলার নেশা। একাকিত্বের অনুভূতি, ভুতুড়ে চিন্তার ভয়, অবাস্তবতার বিদ্যুৎস্পর্শ এসব ভুলে থাকার জন্যই আমার

ছিল ঐসব বহির্মুখীনতা, তাই পড়ার টেবিলের চেয়ে আমাকে অনেক বেশী দেখা যেত ফুটবল, ক্রিকেট বা ভলিবলের মাঠে, কমনরুমে। আমার অকিঞ্চিৎকর লেখাগুলি কেউ কখনো যদি পড়েন তো দেখা যাবে তাতে বারবার খেলার মাঠের কথা আসে, খেলার অনুষঙ্গ আসে। 'ক্রীড়াভূমি' গল্পে যেমন এসেছিল, তেমনি এসেছে ঘুণপোকা, পারাপার, বৃষ্টির ঘ্রাণ, উজানে। 'দিন যায়' উপন্যাসে টেবিল টেনিসের শব্দ দিয়ে একটি আবহ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম।

চেষ্টা—এই শব্দটাই আমার সম্পর্কে যথার্থ শব্দ।

বি-এ পড়ার জন্য কলকাতায় আসা গেল। এ শহরটা সম্পর্কে কার টান নেই? চুম্বক পাহাড়ের মতো এই শহর অবিরল তার দিকে টেনে আনছে নানা সফলতা-ভিক্ষু মানুষকে। বুঝতে পারতাম, জীবনে কিছু করতে হলে কলকাতায় যাওয়া দরকার। যদিও জীবনের 'কিছু'টা কি। তবু মন বলত—কলকাতা! কলকাতা!

ঠিক এই কলকাতার প্রতি টান নিয়ে 'ফেরীঘাট' উপন্যাসের হাসি চরিত্রটি তৈরি করেছিলাম। সুদূর কাছাড় জেলার শিলচর থেকে হাসিকে বঁড়শিতে বিঁধে টেনে এনেছিল কলকাতা। নিষ্ঠুর হাসি কলকাতা ছাড়া আর কিছুই ভালবাসতে পারল না। কলকাতায় থাকার জন্য সে প্রায় অপ্রেমে বিয়ে করেছিল অমিয়কে। এইরকমভাবে চেষ্টা করেছিলাম আমার নিজের কথা হাসির ভিতর দিয়ে বলতে।

কিন্তু আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত শহরে এসে কলেজে হোস্টেলে দিন কেটে যেত। জীবনের কোনো সম্ভাবনার সিঁড়ি এক ধাপও ওঠা গেল না। বাংলা অনার্স ক্লাসে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পড়াতেন। তখন তাঁর লেখা জনপ্রিয়তার শিখরে উঠে আছে। কিন্তু নিজের মুখচোরা স্বভাবের দরুন কখনো তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারতাম না, লজ্জা সঙ্কোচ ভয় এসে বাধা হত। আমার সহপাঠী ছিল কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, গল্পকার অমলেন্দু চক্রবর্তী আর ছিল বিভূতি রায় যে এখন অভ্র রায় নামে লেখে। কিন্তু এদের সঙ্গ পেয়েও সাহিত্য করার জন্য কেন যেন আর আকুলতা বোধ করি না, শুধু একটু হতাশা একবিন্দু ব্যথা হয়ে পুরোনো কাঁটার মতো মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিত। আমি যে একটু আধটু লিখি তা কাউকে বলতেও লজ্জা করত। একদিন বিভূতিকে পুরোনো লেখার একটা পাতা শুনিয়েছিলাম, ও বলল—কিছু হয়নি, ছেলেমানুষী।

কলকাতা শহরের বিপুল বিস্তার, তার ভিড়, তার কেজো মানুষের তাড়া দেখে মনে হত, এ শহরে টিকে থাকতে হলে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ক্ষমতা দরকার তা আমার নেই। খুবই অসহায় লেগেছিল প্রথম কিছুদিন। বন্ধু কেউ জোটেনি তখনো, হোস্টেলের ছেলেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। কে কাকে পাত্তা দেয়? অসম্ভব একা লাগত। কেবলই মনে হত, আমার কিছু একটা হওয়ার কথা ছিল, হল না।

যেন এই সুযোগটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল আমার পুরোনো বিষাদরোগ। একদিন হঠাৎ আমার চারদিকে থমথম করে ঘনিয়ে এল ঘোর বিষণ্ণতা, এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার পর। কাউকে সে যন্ত্রণার কথা বলতে পারি না, কারই বা শোনার সময় আছে! একা সহ্য করি সেই আমার এক পৃথিবীভরা হতাশা। পারি না। পারি না। অস্তিত্বে বিপদের সঙ্কেত বাজতে থাকে। মনে হয়—'আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা! আমার পথেই শুধু বাধা? আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?'

এই এক অনুভূতি ছিল, ডানামেলা বাদুড়ের মতো উড়ে আসত ভয়াবহ বিষণ্ণতা। হোস্টেলের অর্ধেক দেওয়ালওলা ঘরে বসে শুনি, পাশের ঘরে তাস খেলার হুল্লোড়, কারা যেন ইভিনিং শোয়ে হিট বাংলা ছবি দেখে জুতোর শব্দ তুলে ফিরল এইমাত্র, খুশীর গলায় বলল—উঃ দারুণ! গুডবয়রা সন্ধেবেলা হাত মুখ ধুয়ে নিষ্ঠাভরে বই খুলে বসে আছে টেবিলে, হোস্টেল কম্পাউণ্ডের এক কোণের জিমনাসিয়ামে বিজলী বাতিতে কিছু স্বাস্থ্যপাগল ছেলে মন দিয়ে ব্যায়াম করছে। আমি কেন নই সকলের মতো? 'আমি কেন হতেছি আলাদা?'

শীতের এক দুপুরে পশ্চিমের দরজা দিয়ে এক চৌকো রাঙা রোদ ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছিল, বিছানায় শুয়ে নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখে সেদিকে চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ এক দিন বিষণ্ণতা কেটে গেল। কিন্তু রয়ে গেল তার স্মৃতি। সেই স্মৃতি ছিল ভয় ও উদ্বেগের, সেই স্মৃতি আমাকে চকিত করেছে বারে বারে। তবু সেই সব মনের অভিজ্ঞতাই ছিল আমার পুঁজিপাটা। আমার লেখালেখির চেষ্টার মধ্যে বার বার তার ছায়া এসে পড়ে।

দেশভাগের আগে ও পরে সারা বাংলাদেশ জুড়ে আমার ঘোরাঘুরি বড় কম হয়নি। শৈশব কৈশোর যৌবনকাল জুড়ে বার বার ঠাঁইনাড়া। ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুরের মতো বড় শহরে, আবার জয়দেবপুরে, মেহের কালীবাড়ি, মুক্তাগাছা শহরে, গঞ্জে গ্রামে বার বার চলে গেছি এর ওর তার সঙ্গে। উত্তর বাংলার

পাহাড়ে, জঙ্গলে, চা-বাগানে, আসামের বিস্তীর্ণ এলাকায়, বিহারে, সবশেষে কলকাতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলার ঘাটে ও আঘাটায় থেকে বা ঘুরে আমার অভিজ্ঞতায় শহর, গ্রাম, জঙ্গল, নদী, পাহাড় সবই ঢুকে একাকার হয়ে গেছে। ফুলছড়ি ঘাট ছেড়ে স্টিমার চলেছে বাহাদুরাবাদ ঘাটে, জলের শব্দে স্টিমারের আলোয় রান্নার গন্ধে বিহ্বল হয়ে এক অন্য জগতের রূপাভাষে ভরে যেত মন। কত রূপ ছিল পৃথিবীর। গঞ্জের বাজারে এক ছোট্ট দোকানঘরে ধীর নিস্পৃহ লোকেরা বসে কথা বলছে—এ দৃশ্য ভেবে কেন যে রোমাঞ্চিত হই আজও! 'ফেরীঘাট' উপন্যাসে যেমন হঠাৎ চলে এল এক আজব স্টিমারঘাটের অলীক মায়া, তেমনি 'গঞ্জের মানুষ' গল্পে গাঁয়ের মানুষদের কথা জুড়ে বসল, আবার কখনো 'ঘুণপোকা' 'বাসস্টপে কেউ নেই' কিংবা 'শূন্যের উদ্যান' এই সব উপন্যাসে বলতে চেষ্টা করেছিলাম শহুরে মানুষদের শহুরে জটিলতার কথা। যাও পাখি, নয়নশ্যামা, ফেরা, বৃষ্টির ঘ্রাণ উপন্যাসে শহর গ্রাম পাশাপাশি এসেছে।

এই সব লেখালেখি কি রকম হল তা কিছুই বুঝতে পারি না।

কলেজে পড়ার সময়েই লেখার সঙ্গে সম্পর্ক গেল চুকে। বুঝলাম, লেখাটেখা আমার হওয়ার নয়। বি-এ পড়ার দু বছর তাই মোটামুটি অন্য ছেলেরা যেমন করে তেমনি সিনেমা দেখে বেড়াই, ফাংশন শুনি, আড্ডা মারি, শুধু তারই মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনে পড়ে—আমি তো একটু লিখতাম টিখতাম!

ইউনিভার্সিটিতে বাংলায় এম-এ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পর হঠাৎ পরিচয় ঘটে গেল নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সে তখন ইউনিভার্সিটিতে কেরানী, 'দেশ' পত্রিকায় গল্প লেখে।

আমাদের আমলে 'প্রবাসী' কিংবা 'মাসিক বসুমতী' কিংবা পুরোনো দিনের অন্য সব রমরমা কাগজের দিন আর নেই। সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুতর কাগজ তখন 'দেশ'। আজও দেখি 'দেশ' পত্রিকায় লেখার জন্য কত মুখ চাতকের মতো চেয়ে থাকে। নির্মল সেই 'দেশ' পত্রিকায় লেখে শুনে ভিতরে ছ্যাঁকা লাগল। নির্মল ভরসা দিয়ে বলল—'দেশ'-এ নতুনদের গল্প ছাপা হয়। দিয়ে দেখুন না একটা।

এক যশের ভিক্ষুক তো সব সময়েই বাস করে আমাদের ভিতরে। গুরুত্ব পাওয়ার লোভ নেই কার? সেই লোভ আবার ডাক দিল কোত্থেকে। রাতারাতি গল্প লিখে ফেললাম। লিখেই মনে হল, এটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প।

গল্পটা শুনে নির্মল খুশী হল না, বিভূতিও অনুকূল মন্তব্য করেনি। কিন্তু আমার ধারণা তবু বলবৎ রইল, আমি দারুণ লিখেছি। 'দেশ' পত্রিকার দফতরে সেটা জমা দিতে গেলাম যাঁর হাতে তিনি তখন আমাদের কাছে এক দুরন্ত আকর্ষণ। তাঁকে চোখে দেখার লোভটাও কম ছিল না। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অসামান্য নতুন বাঁধভাঙা গদ্য একটা ভিন্ন খাত রচনা করার চেষ্টা করছে। তিনি বিমল কর। মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে খুব নার্ভাস লাগছিল। তবু চেষ্টাকৃত সাহসের সঙ্গে দিয়ে আসতে পেরেছিলাম। কিছুকাল পরে গল্পটা অমনোনীত হয়ে ফেরত এল হাতে। উৎসাহটা মিইয়ে গেল। তবু আর একটা লিখে ফের দিয়ে এলাম। সেটাও ফেরত এল। বলতে কি তখন আমাকে ঘিরে ফেরত-এর প্রেতনৃত্য। 'পরিচয়' থেকেও সেই দুটো গল্প ফেরত পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা 'একতায়' নতুন লেখা একটা গল্প দিয়ে এলাম ছাত্রসম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে, সেটাও মনোনীত হল না। অর্থাৎ লেখালেখি আমার হওয়ার নয়। বুঝতে পেরে পরাজয়ের বিস্বাদে ভরে গেল ভিতরটা। শুনতে পেলাম 'একতা' পত্রিকায় সেবার রেকর্ডসংখ্যক গল্প ছাপা হচ্ছে চারটে। চারটেই বাংলা ক্লাসের ছেলেদের। সেই চারজনের মধ্যেও ঠাঁই না পেয়ে পিছিয়ে আসা ছাড়া কি করার আছে? সাহিত্য শিল্প তো গায়ের জোরে হয় না।

তবু শেষ একটা চেষ্টা করব বলে জেদবশত একটা গল্প লিখে দীপেন্দ্রনাথকে দিয়ে নির্লজ্জের মতো বললাম—যদি এখনো ছাপার আশা থাকে তো পড়বেন। উনি বললেন—আশা কম। তবু যদি গল্পটা দারুণ কিছু হয়ে থাকে তো যেমন করেই হোক ছাপব।

তিনি ছেপেছিলেন।

বার বার তিনবার। তৃতীয় গল্পটা লিখে দুবার অমনোনীত হওয়ার লজ্জা আর সঙ্কোচ নিয়ে আবার 'দেশ' পত্রিকায় দিয়ে এলাম। রুমালে মুখ ঢেকে রেখেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে এই গল্পটা 'দেশে' বেরিয়েছিল।

এইভাবে শুরু।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেন-এর ইউনিভার্সিটি হোস্টেলের এঁদো অন্ধকার ঘরে বসে তখন কেবলই সাহিত্যের স্বপ্ন দেখা। পড়াশুনো গোল্লায় দিয়ে ভূতের মতো লেখার পিছনে খাটতাম। আর সেই সাহিত্যজ্বরের বিকারে এম-এ পরীক্ষা আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেল। কোনোদিনই সেটা আর দেওয়া হল না, পিতৃদেবের অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও।

হোস্টেল ছেড়ে একটা প্রাইভেট মেস-এ চলে আসি। রোজগার নেই। উদারতা ও পুত্রস্নেহবশে বাবা টাকা পাঠিয়ে যান ছেলে যদি সুবুদ্ধিবশত কোনোদিন পরীক্ষায় বসে, এই আশায়। তাঁর খুব ইচ্ছে আমি পাস করে অধ্যাপক হই। এটা খুব উচ্চাশা নয়। কিন্তু আমি কারই বা মনোমত হতে পেরেছি জীবনে? আমার নানা ব্যর্থতার সমষ্টিই বুঝি আমি।

অনেক কষ্টে কালীঘাট ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমিতে মাসে পঁচাত্তর টাকা বেতন প্লাস পঁচিশ টাকা স্কুল ডি-এ আর সাড়ে সতেরো টাকা সরকারী ডি-এ, এই মোট একশ সাড়ে সতেরো টাকার একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পেরেছিলাম। আমার জাগতিক সার্থকতা তার বেশী এগোয়নি। সেই অকিঞ্চন জীবনে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপও হয়নি, প্রেম-ভালবাসা দূরের কথা। মেস-এর খাবার ছিল কুকুরেরও অস্পৃশ্য অখাদ্য, পরিবেশ ছিল ধূলিধূসর বিবর্ণতায় ভরা। ভবিষ্যৎ ভাবতে ভয় করত। আমার তখনকার জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিল কয়েকজন নিবিড় সুহৃদ আর সাহিত্যের পরিমণ্ডল। ঐটুকুই অমৃতবিন্দুর মতো আমাকে জীইয়ে রেখেছিল। আমার সেই মেস-এর ঘরে আসতেন বিমল কর, তাঁর খড়কুটো আব সোপান, জননী ইত্যাদি গল্প পাণ্ডুলিপি থেকে সেইখানেই আমরা শুনেছিলাম। সেই নিরানন্দ ঘরটিকে প্রাণপ্রচুর উপস্থিতিতে ভরে দিতে আসতেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি রায়, তুলসী সেনগুপ্ত, রতন ভট্টাচার্য, যশোদাদুলাল ভট্টাচার্য, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন মিত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় আরো অনেকে। আর ছিল কফি হাউসের নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা। দেখা হত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই সব নিয়মভাঙা তরুণ কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে। সাহিত্য ছাড়া কথা ছিল না, চিন্তা ছিল না, বোধ ছিল না। এক সাহিত্যনেশার ঘোর সব সময়ে উদ্দীপ্ত রাখত। অভাবের কথা খেয়াল থাকত না, ভবিষ্যৎ চিন্তা পীড়া দিত না, নারী-প্রেমের কথাও খুব ভেবেছি বলে মনে পড়ে না তো!

কি কষ্টে আর যত্নে যে গল্প লিখতাম! 'ঘরের পথ' গল্পটা লিখতে এক কি দেড় মাস সময় লেগেছিল। তখন গড়ে গল্পপিছু ওরকমই সময় ব্যয় করতে হত। কিন্তু 'ঘরের পথ' বেরোনোর পরই হঠাৎ একটা মন্দা সময় পড়ল। নতুন একটা গল্পের খসড়া করেছিলাম, সেটার নাম দিয়েছিলাম 'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু'। একটা লোক কাজ সেরে কিছু দেরিতে অফিস থেকে বেরোলো। তার শরীর ভাল লাগছিল না। সে একটা সিনেমা হলের লবীতে ওয়েটিং মেশিনে ওজন

নিল। ওজনের টিকিটে লেখা ছিল—আপনি শীগগীরই বিপদে পড়বেন। তারপর সেই সে একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকতে গিয়ে দরজার পাল্লা খুলেই চমকে উঠে অনুভব করল, ভিতর থেকে কে যেন এক পলকের আগুন দৃষ্টিতে তাকে দেখে নিল। সে চলে এল দরজা থেকে। রাস্তায় নামল বৃষ্টি। বাড়ি ফিরে গভীর রাতে লোকটা টের পেল, সে মরে যাচ্ছে। এই গল্প। মনে আছে এই লেখাটায় বৃষ্টির উপমা দিতে গিয়ে লিখেছিলাম—হাজারটা থার্মোমিটার ফুটপাথে আছড়ে পড়ে ভাঙছে। বৃষ্টির শব্দের তুলনা দিয়েছিলাম—বৃষ্টির ফোঁটা দূরগামী হরিণের পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। যতবার গল্পটা লিখতে যাই ততবার পৃষ্ঠা বাতিল করি, কিছুতেই মনোমত লেখা হয়ে ওঠে না। এক মাস গেল। দু মাস গেল। এক বছর চলে গেল আয়ু থেকে। শতখানেক পৃষ্ঠা জমে গেল টেবিলে। আরো শতখানেক পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেললাম বুঝি! লিখতে না পারার অস্থিরতায় তখন কেবল ছটফট করি। অনবরত সিনেমা দেখি অবিরল আড্ডা মেরে ভুলে থাকবার চেষ্টা করি যন্ত্রণাকে পাগলের মতো ডস্টয়েভস্কি টলস্টয় পড়ি।

দেশ পত্রিকায় গল্প ছাপা হতে থাকার কিছুদিনের মধ্যেই সাগরময় ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সাহিত্যের তিন পুরুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়তম। কত অখ্যাত অজ্ঞাত প্রতিভাকে তিনি টেনে এনেছেন সাহিত্যের রাজ্যে, বসিয়ে দিয়েছেন খ্যাতির দুর্লভ সিংহাসনে। মিতভাষী ও গম্ভীর সাগরদাকে দূর থেকেই সমীহ করতাম, স্বভাব-সঙ্কোচবশত কখনো কাছে যাইনি বা কথা বলিনি। উপরন্তু তাঁকে ঘিরে থাকত এক কিংবদন্তীর রহস্যময়তা। যখন পরিচয় হল তখন তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়টি কিছু বিস্মিত করেছিল আমাকে। আমি অনাদরেই অভ্যস্ত, আদর, প্রশ্রয় বা স্নেহ পেলে নিতে জানি না, সঙ্কোচ হয়, ভীত বা অতিরিক্ত কৃতজ্ঞ বোধ করতে থাকি। দীর্ঘকাল মা বাবা পরিবার ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে আমি ওরকমই হয়ে গেছি। আজও কেউ সমাদর দেখালে তটস্থ হয়ে পড়ি। উপরন্তু সাগরদার মতো খ্যাত ব্যক্তিত্ব যখন কুশল প্রশ্ন করে লেখা চান তখন আমার অপ্রতিভ আনন্দ কিছুটা বুঝি অস্থির করত আমাকে।

সাগরদা শুনেছিলেন আমি একটা গল্প লিখছি। তিনি গল্পটা 'দেশ'-এর জন্য চেয়ে পাঠালেন। সেই আমন্ত্রণ পেয়ে আমি আরো অস্থির তাড়ায় 'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু' লিখতে চেষ্টা করি। যত চেষ্টা করি তত সেটা আমার হাতের বাইরে চলে যায়। কিছুতেই সেই লাগামছেঁড়া অবাধ্য গল্প বশে আসে না, কাগজের চৌহদ্দিতে তাকে বাঁধতে পারি না। সাগরদা খবর পাঠান—

গল্পের কি হল? আমি 'দেশ' পত্রিকার সিকি মাইলের মধ্যে যাই না আর। পালিয়ে বেড়াই। খবর পাঠাই—লিখছি। শীগগীরই দেবো।

'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু' গল্পটি লিখতে গিয়ে আমার নিজের লেখালেখির জীবনের মৃত্যুলক্ষণ ফুটে উঠছিল। বার বার মনে হয়েছে আর কোনোদিন লিখতে পারব না। ঠিক এই রকম আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকেই সে আমলের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান গল্পকার রতন ভট্টাচার্য লেখা ছেড়ে দিয়েছিল। অথচ কত বড় লেখক হওয়ার কথা ছিল রতনের! হয়তো এরকমই কোনো দুর্বোধ্য কারণে লেখা থেকে সরে গিয়েছিল সোমনাথ ভট্টাচার্য, যশোদাজীবন বা স্মরজিৎও শ্লথ করে দিল গতি।

আগেই বলেছি 'চেষ্টা' কথাটা আমার মনোমত। আমি লেখা ছাড়িনি কিছুতেই। রোজ লিখেছি, পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, একটা গল্পই লেখা চলছে। বার বার। অবশেষে সেই অবিশ্বাস্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে পৌনে দু বছর পর 'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু' লেখা শেষ হল। সাগরদা বিশ্বাস করলেন যে, আমি লেখা ছেড়ে দিইনি। আমি নিজেও সে কথা বিশ্বাস করতে পারলাম।

১৯৬৪-র শেষদিকে শীতকালে আমার এক প্রিয় দূর সম্পর্কের ঠাকুমা মারা গেলেন। ঐ একই বছর আমার প্রতি স্নেহশীলা আমার মেজো পিসিমা হৃদ্‌রোগে মৃত্যুর দ্বারদেশ থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে দেখতে গেলে পরে তিনি আমার হাত জড়িয়ে কেঁদে বলে উঠলেন—কাল রাতে বাড়াবাড়ির সময় যদি আমি মরে যেতাম তবে তোকে আজ তো দেখতে পেতাম না!

শীত-বিকেলে কুয়াশা আর ঝুম অন্ধকার দিয়ে ফিরে আসতে আসতে আমি ভাবছিলাম—মৃত্যু। সব কিছুই মৃত্যুশীল। এই পৃথিবীটা একদিন তার সব উষ্ণতা হারিয়ে মৃত্যুহিম নিথরতায় ঘুমিয়ে পড়বে। সূর্য নিভে অঙ্গার হয়ে যাবে একদিন। মহাজগতের সব জ্যোতি হারিয়ে যাবে। এক মহান্ধকার, এক মহাকাল এগিয়ে আসছে। তবে কেন মানুষ বেঁচে আছে? কেন আমি লিখছি?

অল্প কিছুদিন আগে শোপেনহাওয়ার পড়েছি। সে প্রভাবও কাজ করেছিল হয়তো। হঠাৎ টের পেলাম, বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া সেই বিষাদ রোগ, সেই অবাস্তব অনুভূতি প্রথম সর্দিলাগার মতো সুরসুর করে ওঠে শরীরে মনে। কণ্টকিত হয়ে শুনি, আমার অস্তিত্ব জুড়ে অবিরল বেজে যায় বিপদ-সঙ্কেত। এক হয়ে যাই। বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করি—এই মহাজগৎ কেন. অসীম? কেন মৃত্যু? কেন জীবন? কেন সব কিছু? এই প্রশ্নগুলি ছোবলে ছোবলে

বিষ ঢেলে দিতে লাগল মনে। আমার নিস্তব্ধ আর্তস্বর তার 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' ধ্বনি পাঠাতে লাগল চারপাশে, চেতনার তরঙ্গে তরঙ্গে সে খুঁজে বেড়াতে থাকে আশ্রয়। পাগলের মতো ধর্মগ্রন্থ খুলে বসি, রাতে ঘুম আসে না বলে সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে নানা তর্ক জুড়ে সময় কাটানোর চেষ্টা করি। খুঁজে পাই না কিছু। এক অতল বিষাদের পাতাল কিনারার দিকে আমাকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে। একদিন যায়। দু দিন যায়। আয়ু ফুরোয় বুঝি!

এই যন্ত্রণায় তাড়িত হয়ে হয়ে ১৯৬৫ সালের গোড়ায় আমি দেওঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মনে অবিশ্বাস, সন্দেহ, দ্বিধা। তবু আমার বুকের ভিতরটা শূন্যআশা ভিখারি কাঙালের হাতের মতো অঞ্জলি পেতে আছে—কিছু দেবে? কিছু দিতে পারো আমাকে?

তিনি আমাকে শিখিয়ে দিলেন, কি করে বেঁচে থাকতে হয়। আমি ঠিক সময়ে তাঁর কাছে যেতে পেরেছিলাম, আমার সারা জীবনের সফলতা এইটুকুই আর সেই সফলতাটুকুই শৈশবের নদীর মতো সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। তরঙ্গে তরঙ্গে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মহাসমুদ্রের দিকে, যেখানে তমসার পারে আনন্দ থেকে জন্ম নিচ্ছে জগৎ ও জীবন।

আমার জীবন সম্পর্কে কারো কোনো আগ্রহ না থাকারই কথা। তাই এই সাতকাহন করে বলতে লজ্জা করে। বরাবরই আমি একটু চোখের আড়ালে থাকতে ভালবাসি। সেটা বিনয় নয়, সেটা নিরহঙ্কারতার দরুনও নয়। যথার্থ ই এক সঙ্কোচ, এক ভয় আর স্নায়ুদৌর্বল্য এসে চেপে ধরে আমাকে। প্রায় সতেরো বছর যে নিরবচ্ছিন্ন লেখালেখির চেষ্টায় ব্যাপৃত রেখেছি নিজেকে তার মধ্যে হয়তো রয়েছে যশোলিপ্সা, অর্থলোভ, নিজেকে মাপের চেয়ে বড করে দেখানোর চেষ্টা। এই সব আশা আকাঙ্ক্ষার বৃষ্টি এসে ধুয়ে নিয়ে যায় শিল্প-সাহিত্যের প্রতিমা। তাই মনে হয়, এত দিনের এই সাহিত্যচর্চার প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে আসলে আমার লেখক হতে না পারার কাহিনী। তবু এই চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমার একটুখানি বেঁচে থাকা।

গঞ্জের মানুষ

রাজা ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর দিনটা শেষ হয়ে গেল। একটা একা শিরীষ গাছ সিকি মাইল লম্বা ছায়া ফেলেছিল। সেই ছায়াটাকে গিলে ফেলল আঁধার রাতের বিশাল পাখির ছায়া। ফকিরচাঁদের সাত ঘড়া মোহর আর বিস্তর সোনাদানা, হীরে-জহরৎ সব ঐ ঢিবির ভিতরে পোঁতা আছে। আর আছে ফকিরচাঁদের আস্ত বসতবাড়িটা। ঢিবির ওপাশ দিয়ে রেল লাইন, এপাশ দিয়ে রাস্তা। পাথরকুচি ছড়ানো, গাছ-গাছালির ছায়ায় ভরা। এখন একটু অন্ধকার মতো হয়ে এসেছে, শীতের থম-ধরা বিকেলে একটু ধোঁয়াটে মতো চারধার। রাস্তার পাথরকুচিতে চটি ঘষটানোর শব্দ উঠছে। রবারের হাওয়াই চটি, এপর্যন্ত সাতবার ছিঁড়েছে। তবু ফেলে দেয় নি নদীয়াকুমার।

তো এই সন্ধের ঝোঁকে আলো-আঁধারে নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায় তা ঠাহর করা মুশকিল। ভেলুরামের চোখে ছানি আসছে। নাতি খেলারাম বীরপাড়া গেছে তাগাদায়। সে এখনো ফেরে নি দেখে চৌপথীতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে এল ভেলু। বীরপাড়ার একটা বাস এসে ছেড়ে গেল। এ গাড়িতেও আসে নি। আরো খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে হত। নাতিটার জন্য বড্ড চিন্তা-ভাবনা তার। কিন্তু ভেলুরাম দোকান ছেড়ে বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। তার ছেলে শোভারাম চোর-চোট্টা-বদমাশ হয়ে গেছে। এক নম্বরের হেক্কোড়। নেশাভাঙ আর আউরাৎ নিয়ে কারবার করে। বহুকাল আগে শোভারামের বউ পালিয়ে গেছে। ভেলু কেবল নাতিটাকে রেখে শোভারামকেও ঘরের বার করেছে। কিন্তু ছেলে মহা হেক্কোড়, দুনিয়ায় কাউকে ভয় খায় না। দরকার পড়লেই এসে ভেলুর দোকানে হামলা করে মালকড়ি ঝেঁকে নিয়ে যায়। তাই চৌপথী থেকে পা চালিয়ে ফিরছিল ভেলু। রবারের চটির আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল।

নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায়? মুশকিল হল, নদীয়ার বউ আজকাল মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে, পিরান গায়ে দেয়, চুলও ছেঁটে ফেলেছে। কে বলবে মেয়েমানুষ? হাতে চুড়ি-বালা, সিঁথের সিঁদুর কিছু নেই। রাতবিরেতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা হয়েছে যে, সে পুরুষমানুষ, আর

কালীসাধক। অবশ্য কালীর ভরও হয় তার ওপর। শুধু ভেলু কেন, গঞ্জের সবাই নদীয়ার বউকে ভয় খায়। নদীয়া নিজেও।

ভেলু শেষবেলার আকাশের খয়াটে আলোটুকুও চোখে সহ্য করতে পারে না। চোখে হাত আড়াল দিয়ে দেখে বুঝে ভয়ে ভয়ে বলে—কে, নদীয়া নাকি?

—হয়। নদীয়া উত্তর দিল।

—কোন বাগে যাচ্ছো?

—বাজারের দিকেই।

—চলো, একসঙ্গে যাই।

—চলো।

দুজনে একসঙ্গে হাঁটে। ভেলুরামের নাগরা জুতোর ঠনাঠন্ শব্দ হচ্ছে, ফ্যাসফ্যাস করছে নদীয়ার চটি। ভারী দুঃখী মানুষ এই নদীয়া। বউ যদি পুরুষছেলে হয়ে যায় তো পুরুষমানুষের দুঃখ ঝুড়িভরা। কিন্তু ঐ সাত জায়গায় ডিম-সুতোর বাঁধনঅলা হাওয়াই চটি দেখে যদি কেউ নদীয়ার দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করে তো সে আহাম্মক। নদীয়ার দুঃখ ঐ চটি জুতোয় নয় মোটেই। দু'দুটো মদ্দ হালুইকর নদীয়ার শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে দু'বেলা খাটে। গঞ্জে বলতে গেলে ঐ একটাই মিষ্টির দোকান। আরো কয়েকটা নদীয়ার ভাত মারবার জন্য গজিয়েছে বটে, তবু নদীয়ার বিক্রিবাটাই সবচেয়ে বেশী। দোষের মধ্যে লোকটা কৃপণ। জামাটা জুতোটা কিনবে না, পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোবে না। চটি ছিঁড়লে সেলাই করে পরবে। বউ কি সাধে পুরুষ সাজে!

যে যার নিজের জ্বালায় মরে। নদীয়া যেতে যেতে কাঁদুনি গাইতে লাগল—সামনের অমাবস্যায় আমার বাড়িতে মচ্ছব লাগবে, বুঝেছো? আমার বউ নিজের হাতে পাঁঠা কাটবে। শুনেছো কখনো মেয়েছেলে পাঁঠা কাটে?

দেহাতী ভেলুরামের তিন পুরুষের বাস এই গঞ্জে। সে পুরো বাঙালী হয়ে গেছে, তবু মাঝে মাঝে অভ্যাস রাখার জন্য সে দু' চারটে হিন্দী কথা ভেজাল দিয়ে নির্ভুল বাংলা বলে। যেমন এখন বলল—নদীয়া ভাই, আউরাৎ তোমার কোথায়? ও তো ব্যাটাছেলে হয়ে গেছে। সোচো মৎ।

—তুমি তো বলবেই। আমি মরি স্বখাত সলিলে, তোমরা মাগ্‌নার মজা দেখছো।

ভেলুরাম নাগরার শব্দে যথেষ্ট পৌরুষ ফুটিয়ে বলল—ও মেয়েছেলেকে সোজা রাখতে হলে চার জুতি লাগাতে হয়।

বলে থেমে গিয়ে নিজের একখানা পা তুলে পায়ের নাগরা নদীয়াকুমারকে

দেখিয়ে বলল—এইসন জুতি চাই। কিন্তু তুমি জুতি লাগাবে কি, তোমার তো একজোড়া ভাল জুতিই নেই। ঐরকম কুত্তার কানের মতো লটরপটর হওয়াই চটি দিয়ে কি জুতো মারা যায়!

—রাখো রাখো! নদীয়া ধমকে ওঠে—শোভারামের মা যখন নোড়া তুলে তাড়া করেছিল তখন তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিলে, বুড়ো ভাম কোথাকার!

ভেলুরাম খুব হাসে। শোভারামের মা এখন আর বেঁচে নেই। নোড়া নিয়ে তাডা করার সেই সুখস্মৃতিতে ভারী আহ্লাদ আসে মনে। এত আহ্লাদ যে চোখে জল এসে যায় ভেলুরামের।

আনাচে-কানাচে শোভারাম কুকুর বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করে। এমন অবস্থা ছিল না যখন মা গন্ধেশ্বরী জীবিত ছিল। তখনো বাপটা খডমটা হুড়কোটা দিয়ে পেটাত বটে, কিন্তু তবু সংসারের বার করতে সাহস পেত না। মা গন্ধেশ্বরীকে ভূত-প্রেত পর্যন্ত ভয় পেত, কাবুলিওয়ালা কি দারোগা পুলিসকেও গ্রাহ্য করত না গন্ধেশ্বরী। ভেলুরাম তো সেই তুলনায় ছারপোকা। সেই গন্ধেশ্বরী ছিল শোভারামের সহায়। তখন শোভারামের মনখানা সব সময়ে এই গান গাইত—লুট পড়েছে, লুটের বাহার, লুটে নে রে তোরা। তাই বটে। বাপ ভেলুরামের পাইকারি মসলাপাতি, মনোহারী জিনিস, পাট, তামাকপাতা, তেলের বীজ ইত্যাদির কারবার থেকে সে মনের আনন্দে লুট করত। বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে শিখেছিল ইস্কুলের প্রথম দিকটায়। ক্লাস থ্রীতে উঠলে লেখাপড়া সাঙ্গ হল। মাস্টাররা মারে বলে মা গন্ধেশ্বরী ইস্কুল থেকে ছাড়ান করাল। বাপের সঙ্গে কিছুদিন কারবার বুঝবার চেষ্টায় লেগেছিল। ভাল লাগত না। বাপটা পারেও বটে। দু' পয়সা চার পয়সার হিসেব নিয়ে পর্যন্ত মাথা গরম করত। শোভারামের এ সব পোষায় না। বয়সকালে বউকে গাওনা করে দেহাত থেকে আনাল মা। কিন্তু সে বউয়েরও কি বা ছিল! শোভারাম ইতিমধ্যে বখাটেদের সঙ্গে ভিড়ে বিস্তর মেয়েমানুষের স্বাদ সংগ্রহ করেছে। দেহাতী মেয়ে বড্ড নোনতা। ভারী ঝাঁঝ তাদের হাবেভাবে। সেটা অপছন্দ ছিল না শোভারামের। কিন্তু বউয়েরও তো পছন্দ বলে কিছু আছে! শোভারাম নেশার ঘোরে পড়ে গেছে, গাঁজা ভাঙ তো আছেই, বোতলের নেশাও ধরে ফেলেছে কবে। মেয়েমানুষটা টিকটিক করত। খেলারাম হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে দাঙ্গাহাঙ্গামার উপক্রম। মা গন্ধেশ্বরী তখনো সহায়। ছেলের বউয়ের তেজ দেখে উদুখলের কোঁৎকাটা দিয়ে আচ্ছাসে ঝেড়ে দিল। সেই পেটা না

দেখে শোভারাম মুগ্ধ। মায়ের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়েছিল সেদিন। বছর-খানেকের খেলারামকে ফেলে বউ ভেগে গেল ছ'মাস পর। বাপ ভেলু অবশ্য বরাবরই শোভার বিপক্ষে। তক্কে তক্কে ছিল, কবে গন্ধেশ্বরী মরে। সেই ইচ্ছা পূরণ করে শোভারামকে জগৎসংসারে একেবারে দিগদারির দরিয়ায় ছেড়ে, গেল বছর মা গন্ধেশ্বরী সধবা মরল। গন্ধেশ্বরীর শ্রাদ্ধের দিন পার হতে না হতেই ভেলুরাম মহা হাঙ্গামা বাধায়। শোভারাম কিছু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু বাপ ভেলুরাম মহকুমায় গিয়ে এস. ডি. ও সাহেবের কাছে পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে দরবার করে। লজ্জায় ঘেন্নায় শোভারাম গৃহত্যাগ করে।

কিন্তু ঘর ছাড়লেই কি! তিরপাইয়ের বস্তিতে জগনের ঘরে একরকম আদরেই আছে শোভারাম। কিন্তু সে আদরে তো মালকড়ি আসে না। নেশাভাঙ আর কাঁহাতক ভিক্ষেসিক্ষে করে চলে! কাজবাজ বলতে কিছু নেই, রোজগারপাতি ঢুঢু, চুরি-চামারিও বড় সহজ নয়। মহকুমার সদরে গিয়ে অনেক ঘুর ঘুর করেছে সে, কেউ কাজ দেয় না। তিন চার বাড়িতে চাকর খেটেছিল, চুরি করে মারধর খেয়ে পালিয়ে এসেছে, পুলিসেও খোঁজখবর করছে। বড অব্যবস্থা চারদিকে। চুরির লাইনে পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু নেশা-ভাঙ করে শরীরে আর রস নেই, হাতটাত কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা গুলিয়ে যায়। মদনা চোরকে দেখে বুঝেছে যে চুরিও বড় সহজ কাজ নয়। সংযম চাই, ত্যাগ চাই, আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধি চাই। মদনা রোজ সকালে ব্যায়াম করে, ঘোড়ার মতো ছোলা খায়, নেশাটেশাও বুঝেসমঝে করে। তা ছাড়া সে নানান মন্ত্র জানে। ভূতপ্রেত তাড়ানোর মন্ত্র, কুকুরের মুখবন্ধন, ঘুমপাড়ানী মন্ত্র। মদনা যে আজ বড় চোর হয়েছে সেও মাগনা নয়। যে দিকেই বড় হতে চাও কিছু গুণ থাকাই লাগবে। শোভারামের কিছু নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত ফের ভেলুরামের গদিতেই তাকে মাঝে মাঝে চড়াও হতে হয়। কাকুতি মিনতিতে আজকাল কাজ হয় না, চোখ রাঙালেও না। ভেলুরাম তার ধাত বুঝে গেছে। খেলারামও বাপকে দুর-দুর করে। একটা বিলিতি কুত্তা রেখেছে, সেইটেকে লেলিয়ে দেয়। তবু দু' পাঁচ টাকা ঐ বাপ কি ছেলেই ছুঁড়ে দেয় শোভারামকে আজও। সেই অপমানের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আসে শোভারাম। চোখে জল আসে। তারই বাপ, তারই ছেলে, পয়সাও হক্কের, তবু ভিক্ষে করে আনতে হয়।

আজও গদির চারধারে ঘুরঘুর করে বাতাস শুঁকছিল শোভারাম। মসলা-পাতির একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এখানে। বাজারের পিছন সারির দোকান আর

গুদামের জায়গাটা খুব নির্জন। খেলারামের কুকুরটা কাঠের দোতলার বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছে। শোভারাম মুখ তুলে কুকুরটাকে দেখল। ভীষণ কুকুর। বলল—কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!

গদিতে খেলা বা ভেলু কেউ নেই। শুধু বুড়ো কর্মচারী বসে হিসেবের লাল খাতা খুলে শক্ত যোগ অঙ্ক কষছে। দু' চারজন খদ্দের মশা তাড়াচ্ছে। আর খেলারামের মাস্টার শ্রীপতি কর্মকার বসে আছে উদাসভাবে। শ্রীপতি মাস্টার লোকটি বড ভাল। সারাদিন বসে কি যেন ভাবে। লোকে বলে, গঞ্জে শ্রীপতির মতো এত লেখাপডা জানা লোক আর নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যে জীবনে কিছু হয় না, ঐ শ্রীপতি মাস্টারই তার প্রমাণ। মাইনর স্কুলে সামান্য বেতনের মাস্টারী করে, আর গোমুখ্যু ভেলুরামের নাতি, গজমুখ্যু শোভারামের ছেলে আকাটমুখ্যু খেলারামকে রোজ সন্ধেবেলা দু' ঘণ্টা পডিয়ে মাসকাবারে বুঝি পঞ্চাশ টাকা পায়। আর ঐ দু' ঘণ্টায় ভেলুরাম গদিতে বসে না হোক শতখানেক টাকা নাফা রোজ ঘরে তুলছে।

—রাম রাম মাস্টারজী। বলে শোভারাম গদির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবখানা এমন যে তারই গদি, রোজই সে এখানে যাতায়াত করে। কর্মচারীটা একবার মুখ গম্ভীর করে তাকাল। হাতের কাছেই ক্যাশবাক্স, কিন্তু ওতে কিছু নেই, শোভা জানে। থাকলেও ক্যাশবাক্স তালা-দেওয়া, আসল মালকড়ি লম্বা গেঁজের মধ্যে ভেলুরামের কোমরে প্যাঁচানো থাকে।

শ্রীপতি মাস্টার চিনতে পারল না, অন্যমনস্ক মানুষ। চুলগুলো সব উলোঝুলো, গায়ে ইস্তিরি ছাড়া জামা, ময়লা ধুতি। উদাস চোখে চেয়ে বলল—কোন হ্যায় আপ্?

শ্রীপতি দারুণ হিন্দি বলে। প্রথম দিন খেলারামকে পডাতে এসে সে বড বিপদে ফেলেছিল ভেলুরামকে। খটাখট উর্দু মেশানো চোস্ত্ হিন্দিতে কথা বলে যাচ্ছে, ভেলু হাঁ করে চেয়ে আছে, কিছু বুঝতে পারছে না। তিন পুরুষ বাংলা-দেশে থেকে আর বাঙালীর সঙ্গে কারবার করে করে হিন্দি-মিন্দি ভুলে গেছে কবে! উত্তরপ্রদেশে সেই কবে দেশ ছিল। মা গন্ধেশ্বরী কিছু কিছু বলতে পারত। খেলারাম এখন ইস্কুলে হিন্দি শেখে।

শ্রীপতির হিন্দি শুনে ভয় খেয়ে শোভারাম বলে—আমি খেলারামের বাপ মাস্টারজী। আমার কথা ভুলে গেলেন আপনি?

—ও। বলে বিরস মুখে বসে থাকে শ্রীপতি। গঞ্জে থেকে তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এমন কি সে যে এত ভাল হিন্দি জানে সেটুকু পর্যন্ত

অভ্যাস রাখতে পারছে না, এমন লোকই নেই যার সঙ্গে দুটো হিন্দি বলবে। আর যা সব জ্ঞান আছে তার, সেগুলো তো গেলই চর্চার অভাবে। গবেট খেলারাম এমনই ছাত্র যে বাঁ বলতে ডান বোঝে। পড়তে বসে দশবার উঠে গিয়ে দোকানদারী করে আসছে। প্রতি ক্লাসে একবার দু'বার ঠেক্ খেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এর পরের চড়াই ঠেলে পার করা খুবই মুশকিল। তবু তার দাদু ভেলুরামের বড় ইচ্ছে যে খেলারাম বি-কম পাস করে হিসেবের ব্যাপারটায় পাকা হয়ে আসুক। তাই শ্রীপতি মাঝে মাঝে ঠেস দিয়ে বলে, বুদ্ধি কম হলে কি আর বি-কম হওয়া যায়?

শোভারাম খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করে—একা বসে আছেন, খেলাটা গেল কোথায়?

শ্রীপতি মুখটাকে খাট্টা করে বলে—কোথায় আর যাবে, বাকী বকেয়ার তাগাদায় বীরপাড়া না কোথায় গেছে শুনছি। আমার আটটা পর্যন্ত টাইম ততক্ষণ বসে উঠে যাবো।

—সে তো ঠিক কথা। বলে শোভারাম একটু বাপগিরি ফলিয়ে বলে—খেলারামটা লেখাপড়ায় কেমন মাস্টারজী?

শ্রীপতি বলে—কিছু হবে না।

শোভারাম শুনে খুশীই হয়। বলে—আমিও তাই বলি। ঝুটমুট ওর পিছনে পয়সা গচ্চা যাচ্ছে।

বলতে বলতে শোভারাম চারদিকে নজর করছে। হাতের কাছে সরাবার মতো কিছু নেই। শোভা তাই হাতের কাছে ক্যাশ বাক্সটায় একটু তেরে কেটে তাক বাজায় অন্যমনে। বয়স কম হল না তার। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। খেলারামেরও না হোক বাইশ চব্বিশ হবে। এত বয়স পর্যন্ত এই গদিতেই কেটেছে তার। কাঠের দোতলার ওপর সে জন্মেছিল বিন্দি ধাইয়ের হাতে। এই বাজারের ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছে। ভিতরবাগে একটা উঠোন আছে, সেখানে মা গন্ধেশ্বরী আচার রোদে দিত, পাঁপর শুকিয়ে নিত। কিন্তু এখন সে এই গদিতে বাইরের লোক। বাপ যে এত অনাত্মীয় হতে পারে কে জানত!

সন্ধে পার হয়ে গেল। ইটখোলার দিক থেকে পশ্চিমা গানের আওয়াজ আসছে। সাঁঝবাজারে কিছু লোক নদীর মাছ কিনতে এসে বকবক করছে। তাছাড়া বাজারটা এখন বেশ চুপচাপ। শীতটা সন্ধ এসেছে, এবার জোর শীত পড়বে মনে হয়। গায়ের মোটা সুতীর চাদরটা খুলে আবার ভাল করে জড়ায় শোভারাম। এইসব গায়ের বস্ত্র দিয়ে শীত আটকানোয় সে বিশ্বাসী নয়। শীত

ঝেড়ে ফেলতে এক নম্বরীর চাপানের মতো আর কি আছে! না হয় একটা ছিলিম বোমভোলানাথ বলে টেনে বসে থাকো, মা গন্ধেশ্বরীর হাতে ঠেঙা খেয়ে চোর বেড়াল যেমন লাফিয়ে পালাত, শীতও তেমনি পালাবে।

বাপ ভেলুরামের নাগরা জুতোর শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। সেটা শুনতে পেয়েই উঠে পড়ল শোভারাম। টালুমালু অসহায় চোখে চারদিকে আর একবার তাকায়। কিছুই হাতাবার নেই। পাথরপোতার এক ব্যাপারী বাংলা সাবান কিনতে এসে বসে ঢুলছিল। জুতো জোড়া ছেড়ে রেখেছে বেঞ্চির সামনে। বেশ জুতো—ঝা চকচকে নতুন, না হোক ত্রিশ টাকা জোড়া হবে।

শোভারাম নিজের টায়ারের চটি আর পায়ে দিল না। দেখিনা-দেখিনা ভাব করে ব্যাপারীর জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাঠের বড় মুখ খোলা বাক্সে বিস্তর নোনতা বিস্কুটভরা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট। যাওয়ার সময়ে হাতছিপ্প্ু করে দু' প্যাকেট তুলে চাদরের তলায় ভরে ফেলল। সেই সঙ্গে এক মুঠো তেজপাতা আর এক গোলা বাংলা সাবানও। যা পাওয়া যায়।

বাপ ভেলুরামের সঙ্গে মুখোমুখিই পড়ে যেত শোভা। কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল। ভেলু এখন সব্জীবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে নদীয়ার সঙ্গে কথা বলছে। জবুথবু কয়েকজন সব্জীওয়ালা টেমি জেলে নিঝুম বসে আছে আলু কপি বেগুন সাজিয়ে। ব্যবসা মানেই হচ্ছে বসে থাকা। তাই শোভারাম মানুষের ব্যবসা করা দু' চোক্ষে দেখতে পারে না। নতুন জুতো জোড়া বেশ টাইট মারছে। কয়েক কদম হাঁটলেই ফোসকা পড়ে যাবে। শোভারাম খুঁড়িয়ে মেছোবাজারের দিকে অন্ধকারে সরে যায়।

চটিজোড়া এই নিয়ে আটবার ছিঁড়ল। বাজারের ও-প্রান্তে দোকান, এখনো বেশ খানিকটা দূর। নদীয়া ডানপায়ের চটিটা তুলে সব্জীওয়ালার টেমীর আলোয় দেখল। নতুন করে ছেঁড়ে নি, রবারের নলী দুটো যেখানে ডিমসুতোয় বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটাই ছিঁড়েছে। সুতোওয়ালারা আজকাল চোরের হদ্দ, এমন সব পচা সুতো ছেড়েছে বাজারে যে বাতাসের ভর সয় না। চটিটা আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নদীয়া। নাঃ, গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে আদ্দেক। আর এক জোড়া না কিনলেই নয়। জুতো চটির যা দাম হয়েছে আজকাল। চটিটা ছেঁড়ায় ফের নিজেকে ভারী দুঃখী মানুষ বলে মনে হয় নদীয়ার। এ গঞ্জে তার মতো দুঃখী আর কে?

চামার সীতারামের দোকানটা সব্জী বাজারের শেষে। দোকান না বলে সেটাকে গর্ত বলাই ভাল। একধারে লোহার আড়ৎ, অন্য ধারে ভুষি মালের দোকান। তার মাঝখানে বারান্দার নিচের দিকে একটা গর্ত মতো জায়গায় সীতারাম মুচীর দোকান ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো। ছোট চৌখুপীটার মধ্যে চারধারে কেবল জুতো আর জুতো। সবই পুরোনো জুতো। সামনের দিকে বাহার করার জন্য আবার জুতোর সারি ঝুলিয়ে রেখেছে সীতুয়া। তার বউ নেই, বালবাচ্চার কথাও ওঠে না। আছে কেবল পুরোনো জুতো। সেই জুতোর মধ্যেই সে দিনরাত শোয় বসে, সেখানেই রান্না করে খায়। পেল্লায় বুড়ো হয়ে গেছে সীতুয়া, তবু এখনো গর্তের ভিতর থেকে শকুনের মতো তাকিয়ে খদ্দেরদের দেখে নেয়।

ছেঁড়া চটিটা নিয়ে দোকানের মধ্যে কুঁজো হয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে কপালে ঝুলন্ত কার-না-কার পুরোনো জুতোর একটা ধাক্কা খেল নদীয়া। এমন কপালে জুতোই মারতে হয়। ইচ্ছে করেই নদীয়া কপাল দিয়ে আর একবার ধাক্কা মারে ঝুলন্ত জুতোয়।

সীতুয়া ছেনির মতো যন্ত্র দিয়ে চামড়া কাটছে। কাঠের একটা ক্ষয়া টুকরোয় খস্‌খস্ করে দু' চারবার ঘষে নিচ্ছে ছেনিটা। মুখ তুলতেই নদীয়া বলে—ত্যাখ বাবা, চটিটার একটা বন্দোবস্ত করতে পারিস কিনা।

নদীয়াকুমার ভাল খদ্দের নয়, সীতারাম জানে। তাই গম্ভীরভাবে হাতের কাজ শেষ করে একবার খইনির থুক্‌ ফেলে হাওয়াইটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে—এতো ভিখমাঙ্গাদের চটি, আপনি কোথায় পেলেন এটা?

নদীয়া রেগে গিয়ে বলে—বড্ড বকিস বলেই চিরকাল এমন রয়ে গেলি সীতুয়া। দে দুটো সুতোর টান মেরে।

সীতারাম মাথা নেড়ে বলে—ফুটো হবে কোথায়? বিলকুল পচে গেছে রবার। ফিকে ফেলে দেন। নতুন কিনে নেন একজোড়া।

নদীয়া পকেটে হাত দিয়ে দেখল। জানা কথা পয়সা নেই। পকেটে থাকেও না কোনোদিন। খরচের ভয়ে নদীয়া পয়সা নিয়ে বেরোয় না। মিনতি করে বলল—দে বাবা সারিয়ে, দোকানে গিয়ে পাঁচটা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সীতুয়া তার যন্ত্র দিয়ে চটির রবার ফুঁড়ে সুতোয় টান দিয়ে বলল—দেখবেন নদীয়াবাবু, জুতো মাথায় মুখে লেগে যাবে। অত ঝুঁকবেন না।

—লাগবে কি, লেগেছে। নদীয়া বিরস মুখে বলে।

সীতুয়া মোষের শিঙের ফুটোয় যন্ত্রটা ঢুকিয়ে বের করে এনে ভুস্‌ভুসে রবারে

ফুটো করতে করতে বলে—বাবুলোকেরা মাথা নিচু করতে জানে না তো, তাই ঐ সব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।

—এঃ, ব্যাটা ফিলজফার। বলে নদীয়া।

তারপর চটি পরে ফটাফট কাপ্তানের মতো হাঁটে।

দিনটাই খারাপ। খড-কাটাই কলের সামনে নদীয়ার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা আগে সহ্য হত না। আজকাল সয়ে গেছে। বউয়ের চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। মাথায় টেরিকাটা পুরুষমানুষের চুল, পরনে পাঞ্জাবি-ধুতি, পায়ে চপ্পল, বাঁ হাতে ঘড়ি। দাড়িগোঁফ নেই বলে খুবই ডেঁপো ছোকরার মতো দেখতে লাগে। চেহারাটা মন্দ ছিল না মেয়েমানুষ থাকার কালে। বুকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চেপে বেঁধে রাখে, তাই এখন আর মেয়েমানুষীর চিহ্ন কিছু বোঝা যায় না।

বউকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নদীয়া। মুখটা অন্য ধারে ঘুরিয়ে নেয়। সেই ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। একদিন মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নদীয়া। সময় খারাপ পডলে মানুষ স্বপ্নটাও ভাল দেখে না। তো সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একটা লাথি খেয়ে জেগে উঠে বসে হাঁ করে রইল। তার বউ মন্দাকিনী তার নাম ধরে ডাকছে—ওঠ, ওঠ রে নদীয়া! নদীয়ার মুখের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পিনপিন করছিল, সেটাকে গিলে ফেলে নদীয়া ফের হাঁ করে থাকে। দেখে, বউ মন্দাকিনী মস্ত কাঁচি দিয়ে চুল সব মুড়িয়ে কেটে ফেলেছে, ঘরের মেঝেময় মস্ত মস্ত লম্বা সাপের মতো চুলের গুছি পড়ে আছে। নদীয়ার ধুতি পরেছে মালকোঁচা মেরে, গায়ে গেঞ্জী। তাকে জেগে উঠতে দেখে হাতের কাঁচিটা নেড়ে বলল—খবরদার আজ থেকে আর আমাকে মেয়েমানুষ ভাববি না। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছে, আজ থেকে আমি তাঁর সাধক। নদীয়া তেড়ে উঠে বউয়ের চুলের মুঠি ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর ধরা হল না। চুল পাবে কোথায় ধরার মতো? তা ছাড়া বড় কাঁচিটা এমনধারা ঘোরাচ্ছিল যে খুব কাছে যেতে নদীয়ার সাহস হয় নি। সেই থেকে তার বউ মন্দাকিনী পুরুষমানুষ মেরে গেল। বাড়িতে থাকে, নদীয়ার পয়সাতেই খায় পরে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। পডশীরা ডাক্তার কবিরাজ করতে বলেছিল। সে অনেক খরচের ব্যাপার, তবু নদীয়া শশধর হোমিওপ্যাথকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ওষুধ খাবে কে? সেই বড় কাঁচিটা অস্ত্র হিসেবে সবসময়ে কাছে কাছে রাখে মন্দাকিনী। কাছে যেতে গেলেই সেইটে তুলে তাড়া করে। এখন ঐ যে খড়-কাটাই কলটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখনো ওর কোমরে পাঞ্জাবির আড়ালে কাঁচিটা গোঁজা আছে, নদীয়া জানে।

ব্যাটাছেলে মন্দাকিনীর দিকে যতদূর সম্ভব না তাকিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল নদীয়া। সময়টা খারাপ পড়েছে। সাঁতুয়া চামার পাঁচটা পয়সার খয়রাতিতে ফেলে দিল। এখন এই হাওয়াইটা যদি ফেলে দিতেই হয়, আর নতুন একজোড়া কিনতেই হয়, তো এ পাঁচটা পয়সা না হক খরচা হল।

—এই নদীয়া! বউ ডাকল।

নদীয়া এক পলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল তবু। মন্দাকিনী ফের হেঁকে বলল —শুনে যা বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়! ঝগড়ার ভয় দেখাচ্ছে। তবু নদীয়া কান পাততে উৎসাহ পায় না। ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর নাকি মায়ের মন্দির তুলে দিতে হবে, মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে। প্রায়ই হয়। এসব কথা কানে তোলে কোন আহাম্মক!

মন্দাকিনী পিছন থেকে এসে পিরান টেনে ধরল, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে বলল— তোরটা খাবে কে শুনি! ছেলে নেই, পুলে নেই, নিব্বংশ হারামজাদা, কবে থেকে মায়ের মন্দিরের জন্য দশ হাজার টাকা চেয়ে রেখেছি! রক্ত বমি হয়ে মরবি যে।

ফস্ করে নদীয়ার মাথায় বুদ্ধি আসে। বাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে—ছেলেপুলে নেই তো কি! হবে।

—হবে? ভারী অবাক হয় মন্দাকিনী। কাঁচির জন্যই বুঝি কোমরে হাত চালিয়ে দেয়।

—আলবাৎ হবে। সদরে মেয়ে দেখে এসেছি। বৈশাখে বিয়ে করব। দেখিস তখন হয় কি না হয়! তোর মতো বাঁজা কিনা সবাই!

এত অবাক হয় মন্দাকিনী যে আর বলার নয়। কাঁচিটা টেনে বার করতে পর্যন্ত পারে না। তার মুঠি আলগা হয়ে নদীয়ার পিরানের কোণটা খসে যায়। আর নদীয়া চটি ফটফটিয়ে হাঁটে।

না, নদীয়ার মতো দুঃখী আর নেই। দোকানে এসে দেখে ভেলুর অপদার্থ ছেলে শোভারাম চায়ের ভাঁড় হাতে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখেই নিজের দুঃখের ব্যাপকতা বুঝতে পারে নদীয়া। ঐ যে চায়ের ভাঁড় ওর দাম কখনো উসুল হবে না। গঞ্জের একনম্বর হেক্কোড় হল ঐ শোভারাম। খাবে, খাতায়ও লেখাবে, কিন্তু কোনোদিন দাম শুধবে না। বেশী কিছু বলাও যায় না, কবে রাত-বিরেতে এসে দলবল নিয়ে চড়াও হয়।

বাবাকেলে পুরোনো তুষের চাদরটা গা থেকে খুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখল

নদীয়া। পা ধুয়ে এসে ছোট্ট চৌকির ওপর বিছানায় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। টিকে ধরিয়ে পেতলের ধূপদানিতে ধোঁয়া করে অনেকক্ষণ গণেশবাবাকে প্রণাম ঠুকল। দুনিয়ার সব মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি হোক বাবা।

শীতে খদ্দের বেশী ভেড়ে না। দোকান ফাঁকাই।

নদীয়া ভারী দুঃখী মানুষ। ঠাকুর পেন্নাম ভাল করে শেষও হয় নি, শোভারামটা চটির খোঁটা দিল—ই কি গো, নদীয়াদা! তোমার চটির হালটা এরকম হল কবে? এ পরে বেড়াও নাকি? খবর্দার রবারের চটি পরো না, চোখ খারাপ হয়। আর ঐ কুকুরে-খাওয়া চটি ভদ্রলোকে পরে?

শোভারামের পায়ে নতুন জুতো। নদীয়া আড়চোখে দেখে। বেশ বাহারী জুতো। চামড়ার ওপরে মাছের আঁশের মতো নকশা তোলা। রংটাও ভাল। নদীয়ারই সময় খারাপ পড়ে গেছে। শ্বাস ফেলে বলে—নতুন কিনলি বুঝি জুতো জোড়া?

শোভারাম বিস্তর রংঢং দেখিয়ে বলে—ঠিক কেনা নয় বটে! শোভারাম ভেবে-চিন্তেই বলে। কারণ, সে নিজের পয়সায় জুতো কিনেছে এটা নদীয়া বিশ্বাস নাও করতে পারে।

নদীয়া রসিকতা করে বলে—কিনিস নি! তবে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পেলি? না কি শেষ অবধি জুতো চুরি পর্যন্ত শুরু করেছিস।

অপমানটা হজম করে শোভারাম। কিন্তু লোক চরিয়েই সে খায়, খামোখা চটে লাভ কি! ভালমানুষের মতো বলে—না গো নদীয়াদা, সে সব নয়। গেল হপ্তায় বৈরাগী মণ্ডলের হয়ে সদরে একটা সাক্ষী দিয়ে এলাম। টায়ারের চটিটা ফেঁসে গিয়েছিল হোঁচট খেয়ে। তো বৈরাগী মণ্ডল জুতো জোড়া কিনে দিল। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল করি নি, মনে হচ্ছে এক সাইজ ছোটো কিনে ফেলেছি। বেদম টাইট হচ্ছে। দেখ তো, তোমার পায়ে লাগে কিনা—

বলে শোভা জুতো খুলে এগিয়ে দেয়। নদীয়া উদাস হয়ে বলে—লাগলেই কি! ওসব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়!

শোভারাম অভিমানভরে বলে—তুমি চিরকালটা একরকম রয়ে গেলে নদীয়াদা! তাই তো তোমার বউ ওরকম ধারা ব্যাটাছেলে হয়ে গেল। নাও তো, পরে দেখ! পায়ে লাগলে এমনিই দিয়ে দেবো। ত্রিশ টাকায় কেনা, তা সে কত টাকা জলে যায়। পরে দেখ।

নদীয়া এবার একটু নড়ে। বলে—কত টাকা বললি?

শোভারাম হাসে, বলে—ত্রিশ টাকা। মূর্ছা যেওনা শুনে। ওর কমে আজকাল জুতো হয় না।

নদীয়া উঠে এসে জুতো জোড়া পায়ে দিল। পাম্প-শুর মতোই। কিন্তু ঠিক পাম্পশু নয়। বেশ নরম চামড়া। দু-চার পা হেঁটে দেখল নদীয়া। আরে বা! দিব্যি ফিট করেছে তো! এই শীতে পায়ে বড কষ্ট। চামডা ফেটে হাঁ করে থাকে, ভিতরে ঘা, তাতে ধুলোময়লা ঢুকে কষ্ট হয়। তা ছাড়া পাথরকুচির রাস্তায়, অসমান জমিতে পা পডলে হাওয়াই চটিতে কিছু আটকায় না, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। এই জুতোজোডা পরেই নদীয়া টের পেল আরাম কাকে বলে। পায়ে গলিয়ে নিলেই পা দু'খানা ঘরবন্দী হয়ে গেল। ধুলোময়লা, পাথরকুচি কিংবা শীত কিছুই করতে পারবে না।

শোভারাম খুশী হয়ে বলে—বাঃ গো নদীয়াদা, জুতোজোডা যেন তোমার জন্যই জন্মেছিল। আমাদের ছোটোলোকী পায়ে কি আর ওসব পোষায়! তুমিই রেখে দাও! আমি না হয় একজোড়া টায়ারের চটি কিনে নেবো। বাজারের ওদিকে মহিন্দির টায়ারের চটির পাহাড় নিয়ে বসে আছে।

নদীয়া একটু দ্বিধা করে বললে—টায়ারের চটি কি সস্তা নাকি রে? হলে বরং আমিও একজোড়া—

—আরে না না! শোভারাম মাথা নেড়ে বলে—সে বড শক্তজিনিস। তোমরা পায়ে দিলে ফোস্কা পড়ে কেলেঙ্কারী হবে। কড়া আর জীবনে সারবে না। ওসব কুলিমজুরের জিনিস। তুমি এটাই রেখে দাও। যা হোক, দশ বিশ টাকা দিয়ে দিও, তোমার ধর্মে যা সয়।

সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া জুতোজোড়া খুলে ফেলে বলে—ও বাবা, বলিস কি সব্বোনেশে কথা, ডাকাত কোথাকার! দশ বিশ টাকা পায়ের পিছনে খরচ! আমি আট টাকার ধুতি পরি।

শোভারাম অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে নদীয়ার দিকে। তারপর খুব ধীরে বলে—তোমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে নদীয়াদা। ফৌত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আত্মাটাকে একটু ঠাণ্ডা করো। খাও না, পরো না, ও কিরকম ধারা রুগী তুমি? দুনিয়ার কত কি আরামের জিনিস চমকাচ্ছে,—তুমিই কেবল নিভে যাচ্ছো।

নদীয়া না-না করে। আবার জুতোটা তার বড্ড ভালও লেগে গেছে। ফের ছাড়া জুতো পায়ে পরে দেখে। বড় বাহার। আরামও কম কি! সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা জুতো কিনে দিত, তখন পরেছে। নিজে রোজগার করতে

নেমে আর বাবুগিরি হয় নি। বলল—দশ টাকা যে বড্ড বেজায় দাম চাইছিস রে !

—দশ কি বলছ ? বিশ টাকা না হয় পনেরোই দিও। সেও মাগনাই হল প্রায়। নেহাত জুতোজোড়া আমার ছোটো হয়, আর তোমারও ফিট করে গেল। নইলে এখনো বাজার ঘুরলে বিশ পঁচিশ টাকায় বেচতে পারি।

—বারো টাকা দেব। ঐ শেষ কথা। যা, ও মাসে নিবি।

হ্যা-হ্যা করে হাসে শোভারাম। বলে—বারো ? তার চেয়ে এমনিই নাও না। ভেলুরামের ব্যাটা অনেক টাকা দেখেছে, বুঝলে নদীয়াদা !

সবশেষে তেরো টাকায় রফা হল। তাতে অবশ্য শোভারামের এক তিলও ক্ষতি নেই। যত তাড়াতাড়ি মাল পাচার করা যায়। নইলে বাংলা সাবান কিনতে আসা দোকানদারটা বাজারময় হাল্লাচিল্লা ফেলে দেবে। নগদ তেরো টাকা নিয়ে শোভারাম অন্ধকারে সাঁত করে মিলিয়ে গেল।

নদীয়া জুতোজোড়া লুকিয়ে ফেলল চৌকির পাশের ছায়ায়। বলা যায় না, শোভারাম শালা চোরাই মাল যদি গছিয়ে দিয়ে থাকে তো ফ্যাসাদ হতে পারে। থাক একটু লুকোনো, নদীয়ার পায়ে দেখলে কেউ আর পরে সন্দেহ করতে পারবে না। দোকানের কর্মচারীটা ওদিকে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, সব শুনেছে কিনা কে জানে। নদীয়ার কোনো কাজই তো সহজপথে হয় না। সবই যেন কেমন রাহুগ্রস্ত। তার মতো দুঃখী, নদীয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে একবার জুতোজোড়া দেখে নেয়। মিটমিটিয়ে একটু হাসে। খুব দাঁও মারা গেছে। তবু তেরোটা টাকা···ভাবা যায় না। কর্মচারীটা আবার জুতো কেনার সাক্ষী থাকল না তো !

দুটো গেঁয়ো লোক এই সময়ে উত্তেজিতভাবে এসে দোকানে ঢুকল। রাজভোগ সিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে খুব গরম স্বরে কথা বলতে লাগল। দুজনের একজনের জুতো চুরি গেছে ভেলুরামের গদি থেকে। তাই নিয়ে আলোচনা। যার জুতো চুরি গেছে তার পায়ে শোভারামের নোংরা টায়ারের চটিটা। কান খাড়া করে শুনছিল নদীয়া। যা ভেবেছিল তাই।

নদীয়ার মতো দুঃখী কমই আছে দুনিয়ায়। সে একটা শ্বাস ফেলে আড়-চোখে জুতোজোড়া দেখে নিল। আছে।

শ্রীপতি সাড়ে সাতটায় উঠতে যাচ্ছিল, এ সময়ে দেখে, অন্ধকার ফুঁড়ে গরিলাটা গদিতে উঠে আসছে। বাইশ তেইশ বছরের আই জোয়ান চেহারা, যেমন মাথায় উঁচু তেমনি পেল্লায় শরীর। এই হল তার ছাত্র খেলারাম।

চেহারা পেল্লায় হলে কি হবে, ইঁদুর যেমন বেড়ালকে ডরায়। তেমনি মাস্টারজীকে ভয় খায় খেলা। মাস্টারজী সটাং ফটাং ইংরিজি বোলি ছাড়ে, কষাকষ হিন্দি বলে, খেলা তার কিছু বোঝে না।

গরিলাটাকে দেখে ভারী বিরক্ত হয় শ্রীপতি। ঘড়ি দেখে বলে—মাই টাইম ইজ আপ খেলারাম। গুড নাইট।

গরিলাটা ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলে—আজ্ঞে।

শ্রীপতি সন্দেহবশত বলে—কি বললাম বল তো।

খেলারাম গলার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলে অসহায়ভাবে দাদুর দিকে তাকায়। ভেলুরাম গদির ওপর বসে ছানিপড়া চোখে নাতির দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলে—বল।

খেলারাম ঘামতে থাকে।

শ্রীপতি আনমনে বলে—কিছু হবে না।

গরিলাটার বাবা একটু আগে চোখের সামনে দিয়ে একজোড়া জুতো চুরি করে পালিয়ে গেল। একই তো রক্ত। মাথা নেড়ে শ্রীপতি বাজারের মধ্যে শীতের কুয়াশায় নেমে গেল। তার ভিতরে কত বিদ্যে গিজগিজ করছে, কাউকে দেওয়ার নেই।

আসতে আসতেই শুনল, দাদু ভেলুরাম নাতি খেলারামকে খুব ডাঁটছে—কোথায় সারাটা দিন লেগেছিলি চুহা কোথাকার! বীরপাড়া থেকে আসতে এত দেরি হয়! পঞ্চাশ টাকার মাস্টার বসে বসে থেকে চলে গেল! জুতোচোরের ব্যাটা!

বাজারটা এখন নিঝুম কুয়াশায় মাখা একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে। বাতাসে একটু আঁশটে গন্ধ পায় শ্রীপতি মেছো-বাজার পেরোবার সময়ে। তখনো কিছু লোক নদীর টাটকা মাছ নিয়ে বেচবার জন্য বসে আছে কুপী জ্বালিয়ে। এইসব লোকেরা শেলীকীটস পড়ে নি, শেক্‌সপীয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কি বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য, তবু বেশ বেঁচে-বর্তে আছে। তবে কি ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে? সত্য বটে একবার একজন অধ্যাপক শ্রীপতিকে বলেছিলেন—ইনফর্মেশন মানেই কিন্তু জ্ঞান নয়। যে লোকটা টকাটক নানা ইনফর্মেশন দিতে পারে তাকেই জ্ঞানী মনে কোরো না, যার উপলব্ধি নেই, দর্শন নেই, সে বিদ্যের বোঝা বয় বলদের মতো।

উপলব্ধির ব্যাপারটায় একটু কোথায় খাঁকতি আছে শ্রীপতির, এটা সে নিজেও

টের পায়। এই যে গল্পের পরিবেশ, ঐ ম্লান একটু কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্না, কিংবা ফটিকচাঁদের টিবিতে একা শিরীষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনো মানসাঙ্ক কষতে পারে না। বাইরের জগৎটা থেকে সে রস আহরণ করতে পারে না বটে মৌমাছির মতো, তবে সে বইয়ের জগতের তালেবর লোক। বিস্তর পড়াশোনা তার। তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ জন্মায় নি এখানে। লোকে তাকে ভয়ও খায়। তবু কি একটা খাঁকতি থেকেই যাচ্ছে। সে কি ঐ উপলব্ধি বা দর্শনের ?

বাজার পার হয়ে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, একটু উপলব্ধির ব্যায়াম করা দরকার। সে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো চারধারের জ্যোৎস্নামাখা শীতার্ত প্রকৃতি থেকে সেই উপলব্ধির গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল।

হচ্ছে না। মনের পর্দায় কিছুই ভেসে ওঠে না যে !

পাঁচ-সাতটা লোক হাল্লা-চিল্লা করতে করতে কাছে এসে পড়ল। সব কটা মাতাল। শ্রীপতি কিছু বুঝবার আগেই দলটা থেকে খেলারামের বাপ দৌড়ে এসে পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলতে লাগল—রাম রাম মাস্টারজী, আমার খেলারামকে জুতো চুরির ব্যাপারটা বলবেন না। বাপকে তাহলে নিচু-নজরে দেখবে খেলারাম। অনেক পড়িলিখিওলা ব্যাটা আমার, আমি মুখ্যুর টিবি—

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো ! বলে শ্রীপতি পা টেনে পিছিয়ে আসে।

বাতাস দূষিত করে মদের গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে শোভারাম বলে—এভাবে বাঁচা যায় মাস্টারজী ? আমার বাপকে আর খেলারামকে একটু বলবেন, আমি সাফ-স্থতেরো হয়ে গেছি। ভাল লোকের মতো থাকব, যদি আমাকে ফিরিয়ে নেয়।

নাকে রুমাল চেপে শ্রীপতি ঘাড় নাড়ল। পৃথিবীটা বড়ই পচা। দুর্গন্ধময়। এই পৃথিবী থেকে উপলব্ধি বা দর্শনের কিছু ছেঁকে নেওয়ার নেই। পুঁথিপত্রের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য স্থন্দর জগৎ।

লোকগুলো কোদাল গাঁইতি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে শোভারাম হাতজোড় করে বলল—আশীর্বাদ করবেন মাস্টারজী। ফটিকচাঁদের টিবি খুঁড়তে যাচ্ছি আমরা, যেন কিছু পাই।

গম্ভীরভাবে শ্রীপতি বলে—হুঁ।

আজ পর্যন্ত বিস্তর হাঘরে ফটিকচাঁদের টিবিতে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। সকলেরই আশা, সাতঘড়া মোহর আর বিস্তর হীরে জহরৎ একদিন ওখান থেকে বেরোবেই। পেল্লায় টিবি, খুঁড়ে শেষ হয় না। আজ পর্যন্ত সাপ ব্যাঙ আর

ইট পাথর ছাড়া কিছুই বেরোয় নি। তবু অভাব পড়লেই কিছু লোক গিয়ে ঢিবিটা খুঁড়তে লেগে যায়।

নদীয়াকুমার তার দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ফিরছিল নতুন জুতোজোড়া পুরোনো খবরের কাগজে জড়িয়ে র‍্যাপারের তলায় বগলসাই করে নিয়েছে। পায়ের পুরোনো হাওয়াই চটাস-পটাস শব্দ করে বোধ হয় নদীয়াকেই গালমন্দ করছিল। করবেই। সময় খারাপ পড়লে সবাই করে ওরকম।

খুব একটা সাদাটে ভাব চারদিকে। কুয়াশায় জ্যোৎস্নায় যেন দুধে মুড়িতে মাথামাখি হয়ে আছে। পাকা মর্তমানের মতো চাঁদ ঝুলছে আকাশে। পায়ের ফাটা জায়গাগুলোয় শীত সেঁধোচ্ছে। বাবাকেলে তুষের চাদরটায় মাথামুখে ঢেকে হাঁটছিল নদীয়াকুমার। চৌপথীর কাছে বাড়ি, মাঝপথে ফটিকচাঁদের ঢিপিতে কারা যেন গোপনে কি সব করছে। দুচারটে ছায়া ছায়া লোকজন দেখা গেল। নদীয়া কদমের জোর বাড়ায়। কোমরের গেঁজেতে বিক্রিবাটার টাকা রয়েছে। দিনকাল ভাল নয়। কপালটাও খারাপ যাচ্ছে। কেবল মাঝে মাঝে নতুন জুতো জোড়ার কথা ভেবে এত দুঃখেও ফুক ফাক করে সুখের হাসি হেসে ফেলছে নদীয়া। বেশ হয়েছে জুতোজোড়া। দিন দশ বাদ দিয়ে পরবে। চোরাই জুতো এর মধ্যে যদি খোঁজখবর হয় তো গেল তেরটা টাকা। দামটা বেশীই পড়ে গেল। তবু জুতো একজোড়া দরকার। ভেলুরাম বলছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো লাগে। ছেঁড়া হাওয়াই চটি দিয়ে কি আর জুতোনো যায়?

বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভয়ে আঁতকে ওঠে নদীয়াকুমার। কে একটা মেয়েছেলে ঘোমটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের জবা গাছটার তলায়। মেয়েছেলে, নাকি ভূত-প্রেত? তার বাড়িতে আবার মেয়েছেলে কে আসবে?

নদীয়া বলল—রাম রাম, কে?

—আমি।

নদীয়া ফের আঁতকে উঠে বলে—কে আমি?

—আহা। বলে মেয়েছেলেটা এগিয়ে আসে তার কাছে। মুখে জ্যোৎস্না পড়েছে, উর্ধ্বমুখে তার পানে তাকাতেই ঘোমটা খসে গেল। পুরুষমানুষের মতো চুলওলা মাথাটা বেরিয়ে পড়ল।

'আঁ, আঁ' করে ওঠে নদীয়াকুমার। এ যে মন্দাকিনী!

—তোমার এই সাজ ? ভারী অবাক হয় নদীয়া।

মন্দাকিনী জ্যোৎস্নায় চোখের বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে—কেন, আমি মেয়েমানুষ সাজলে তোমার খুব অসুবিধে হয় বুঝি! সদরের কোন ডাইনীকে পছন্দ করে এসেছো, তাকে বৈশাখে ঘরে এনে ঘটস্থাপনা করবে—তাতে বুঝি ছাই দিলাম। ঝ্যাঁটা মারি—

এই সব বলতে বলতে মন্দাকিনী প্রায় নদীয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আর কি টেনে হিঁচড়ে। কিন্তু তাতে নদীয়া কিছু মনে করে না। কপালটা কি তবে ফিরল! নতুন জুতো! বউ!

গহীন রাতে মন্দাকিনী শান্ত হয়ে কাঁদতে বসল। তার আগে পর্যন্ত বিস্তর বাসন আছড়ে, বিছানা ছুঁড়ে, জামাকাপড় ফেলে রাগ দেখিয়েছে। নদীয়া খুব আহ্লাদের সঙ্গে দেখেছে। বছরটাক আগে তো এরকমই ছিল মন্দাকিনী। এই রকমই অশান্তি করত।

মন্দাকিনী কাঁদছে দেখে নদীয়া বলে—কাঁদো কেন? ঝাল তো অনেক ঝাড়লে। আমি বড় দুঃখী লোক, কেঁদো না।

মন্দাকিনী জলভরা চোখে কটাক্ষ হেনে বলে—আমি এখন চুল পাবো কোথায়! কত লম্বা চুল ছিল আমার! তুমি কি এখন আর আমাকে ভালবাসবে চুল ছাড়া!

—দূর মাগী! নদীয়া আদর করে বলে—চুলে কি যায় আসে!

ভোর রাত পর্যন্ত সাত মাতালে ঢিবি খুঁড়ে পেল্লায় হাঁ বের করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কার কোদাল যেন ঠং করে লাগল পেতলের কলসী বা ঘড়ার গায়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে সবাই খুঁড়তে লাগে আরো। হ্যাঁ, সকলের কোদালেই ঠনাঠন ধাতুখণ্ডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। জয় মা কালী। জয় মা দুর্গা। জয় দুর্গতিনাশিনী!

সাত মাতালের বুকের ভিতরে জ্যোৎস্নার ভাসাভাসি। সাত মাতাল এলোপাতাড়ি কোদাল, গাঁইতি আর শাবল চালিয়ে যেতে লাগল। ভোর হতে আর দেরি নেই। শোভারাম আর তার স্যাঙাতদের রাতও বুঝি কেটে গেল।

বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে। অল্প অল্প মাটি সরে, আর বস্তুটা বেরোয়। কি এটা? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তবে কড়া বা কলসী নয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় জিনিস। ফটিকচাঁদের বসত বাড়িটা নাকি?

খোঁড়াখুঁড়ি চলতেই থাকে। হাতে ফোসকা, গায়ে এই শীতেও সপসপে ঘাম। কেউ জিরোতে চাইছে না। নেশা কেটে গিয়ে অন্যরকম নেশা ধরে গেছে।

ভোরের আবছা আলোয় অবশেষে বস্তুটা দেখা গেল স্পষ্ট। সাত মাতাল চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে—একটা কবেকার পুরোনো রেলের মালগাড়ির পাঁজর আধখানা জেগে আছে মাটির ওপর ; কবে বুঝি ডিরেইলড হয়ে পড়ে ছিল এইখানে। জংধরা লোহা হলদে রং ধরেছে।

কেউ কোনো কথা বলল না। হেদিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে খেলারামকে তুলে পড়তে বসিয়েছে ভেলুরাম।

খেলা দুলে দুলে ইংরিজি পড়ছে।

গদির পাশ দিয়ে হা-ক্লান্ত, মাটিমাখা সাত মাতাল ফিরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন শোভারাম, একটু দাঁড়িয়ে খেলারামের ইংরিজি পড়া শুনল। খুব জোর পড়ছে খেলা! ব্যাটা বোধ হয় ভদ্রলোক হবে একটা!

ভেবে এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে একটু হেসে ফেলল শোভারাম।

উকিলের চিঠি

ও মিছরি, তোর নামে একটা উকিলের চিঠি এসেছে দেখগে যা। এই বলে মিছরির দাদা ঋতীশ টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল।

গোসাবা থেকে দুই নৌকো বোঝাই লোক এসেছে অসময়ে। লাট এলাকার ভিতর বাগে কোন বিষয়কর্মে যাবে সব। এই অবেলায় তাদের জন্য খিচুড়ি চাপাতে বড় কাঠের উনুনটা ধরাতে বসেছিল মিছরি। কেঁপে উঠল। তার ভরন্ত যৌবনবয়স। মনটা সব সময়ে অন্যধারে থাকে, শরীরটা এই এখানে। আজকাল শরীরটা ভার লাগে তার। মনে হয়, ডানা নেই মানুষের।

উকিলের চিঠি শুনে যে উনুন ফেলে দৌড়োবে তার জো নেই। বাবা গুলিপাকানো চোখে দেখছে উঠোনের মাঝখানে চাটাইতে বসে। বড় অতিথি-পরায়ণ লোক। মানুষজন এলে তার হাঁকডাকের সীমা থাকে না। তাছাড়া দাদু, ঠাকুমা, মা, কাকা-জ্যাঠারা সব রয়েছে চারধারে। তাদের চোখ ভিতর বার সব দেখতে পায়। উটকো লোকেদের মধ্যে কিছু বিপ্রবর্ণের লোক রয়েছে, তারা অন্যদের হাতে খাবে না। সে একটা বাঁচোয়া, রান্নাটা করতে হবে না তাদের। চাল ডাল ওরাই ধুয়ে নিচ্ছে পুকুরে। বাঁকে করে দু বালতি জল নিয়ে গেছে কামলারা। উনুনটা ধাঁধিয়ে উঠতেই মিছরি সরে গিয়ে আমগাছ-তলায় দাঁড়াল।

কালও বড্ড ঝড়জল গেছে। ঐ দক্ষিণধার থেকে ফৌজের মতো ঘোড়-সওয়ার ঝড় আসে মাঠ কাঁপিয়ে। মেঘ দৌড়োয়, ডিমের মতো বড় বড় ফোঁটা চটাসফটাস ফাটে চারধারে। আজ সকালে দশ ঝুড়ি পাকা জাম, গুটিদশেক কচি তাল কুড়িয়ে আনা হয়েছে ক্ষেত থেকে। ঘরের চালের খড় জায়গায় জায়গায় ওলট-পালট। মাটির দেয়াল জল টেনে ডোস হয়ে আছে, এখন চড়া রোদে শুকোচ্ছে সব। আমতলায় দাঁড়িয়ে মিছরি দেখে, ঋতীশ দাদা টিয়ার ঝাঁক উড়িয়ে দিল। ট্যাঁ ট্যাঁ ডাক ছেড়ে সবুজ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হয়, মানুষের ডানা নেই।

যারা এসেছে তারা সব কেমনধারা লোক যেন! রোগা-ভোগা ভীতু-ভীতু চেহারা, পেটে সব খোঁদল-খোঁদল উপোসী ভাব। জুল-জুল করে চারধারে চায়

আর লজ্জায় আপনা থেকেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক এসে উনুনটায় দুটো মোটা কাঠ ঢুকিয়ে দিল, ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়ল আগুনের ফুলকি। একটা কাঠ টেনে আধপোড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল লোকটা। এই গরমেও গায়ের ময়লা ঘেমো তেলচিটে গেঞ্জীটা খুলছে না, বুকের পাঁজর দেখা যাবে বলে বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে। তাকে দেখে হাসি পেল মিছরির।

সেই লোকটা চারধারে চেয়ে মিছরিকে দেখে কয়েক কদম বোকা পায়ে হেঁটে এসে বলল—আনাজপাতি কিছু পাওয়া যায় না?

ক্ষেত ভর্তি আনাজ। অভাব কিসের? মিছরি বলল—এক্ষুনি এসে পড়বে। ক্ষেতে লোক নেমে গেছে আনাজ আনতে।

—একটু হলুদ লাগবে, আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। যদি হয় তো ফোড়নের জন্য একটু জিরে আর মেথি।

যদি হয়! যদি আবার হবে কি! খিচুড়ি রাঁধতে এসব তো লাগেই সে কি আর গেরস্তরা জানে না! মা সব কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে।

লোকটার দিকে চেয়ে মিছরি বলল—সব দেওয়া হচ্ছে। ডাল চালটা ধুয়ে আসুক।

লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সংকোচের গলায় বলল—বেলা হয়েছে।

সে কথার মধ্যে একটা খিদের গন্ধ লুকিয়ে আছে। শত চেষ্টা করেও লোকটা খিদের ভাবটা লুকোতে পারছে না। গেঞ্জীতে ঢাকা হলেও ওর পাঁজরা দেখা যায়। কারা এরা? কোত্থেকে এল, কোথাই বা যাচ্ছে? ছোটো বোন চিনি যদিও মিছরির পিঠোপিঠি নয় তবু বোনে বোনে ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক। ফ্রকপরা চিনি তিনটে ব্যাঙ লাফ দিয়ে মসলার বারকোশ নিয়ে এসে ঠক করে উনুনের সামনে উঠোনে রেখে ঝুপসি চুল কপাল থেকে সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এই যে মসলা দিয়ে গেলাম কিন্তু। দেখ সব, নইলে চড়াই খেয়ে যাবে।

রোগা লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বারকোশটা নিচু হয়ে দেখল।

বলল—উরে ব্বাস, গরমমসলা ইস্তক। বাঃ বাঃ, এ নাহলে গেরস্ত!

চিনি দুটো নাচুনী পাক খেয়ে মিছরির ধারে এসে জিভ ভ্যাঙাল, বলল—যা দিদি, তোর নামে উকিলের চিঠি এসেছে। বড্ড মোকদ্দমায় পড়ে গেছিস ভাই। চিঠিটা ভিজিয়ে একটু জল খাস শোওয়ার সময়, মিষ্টি লাগবে।

বলে নিচু ডালের একটা পাকা আম দুবার লাফ দিয়ে পেড়ে ফেলল চিনি। শিঙে দিয়ে চুষতে চুষতে যেদিকে মন চায় চলে গেল।

উকিলের চিঠি বলে সবাই খ্যাপায়। আর মোকদ্দমাও বটে। এমন মোকদ্দমায় কেউ কখনো পড়ে নি বুঝি।

ধীর পায়ে লাজুক মুখে মিছরি ঘরে আসে। এমনিতে কোনো লাজলজ্জার বালাই নেই। বাপের বাড়িতে হেসে খেলে সময় যায়। কিন্তু ঐ চিঠি যেদিন আসে সেদিন যত লজ্জা। বরের চিঠিই যেন বর হয়ে আসে।

মিছরির বর উকিল।

ছোটো কাকা প্রায় সমানবয়সী। দাদা ঋতীশের চেয়েও ছ' মাসের ছোটো। আগে তাকে নাম ধরেই 'শ্যামা' বলে ডাকত মিছরি, নিজের বিয়ের সময় থেকে 'ছোটো কাকা' বলে ডাকে।

ছোটো কাকা মিছরির নাকের ডগায় দুবার নীলচে খামখানা নাচিয়ে ফের সরিয়ে নিয়ে বলল—রোজ যে আমার কাপড় কাচতে খিটখিট করিস, আর করবি ?

অন্য সময় হলে মিছরি বলত—করব, যাও যা খুশী করোগে।

এখন তা বলল না। একটু হেসে বলল—কাপড় কাচতে খিটখিট করব কেন, তোমার নস্যির রুমাল বাবু ও কাচতে বড় ঘেন্না হয়।

—ইঃ ঘেন্না ! যা তাহলে, চিঠি খুলে পড়ে সবাইকে শোনাবো।

—আচ্ছা, আচ্ছা, কাচবো।

—আর কি কি করবি সব বল এই বেলা। বৌদি রান্না করে মরে, তুই একেবারে এগোস না, পাড়া বেড়াস। আর হবে সেরকম ?

—না।

—দুপুরে আমার নাক ডাকলে আর চিমটি কাটবি ?

—মাইরি না।

—মনে থাকে যেন ! বলে ছোটোকাকা চিঠিটা শুঁকে বলল—এঃ, আবার সুগন্ধী মাখিয়েছে !

বলে কাকা চিঠিটা ফেলে দিল সামনে। পাখির মতো উড়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে মিছরি এক দৌড়ে বাগানে।

কত কষ্ট করে এতদূর মানুষ আসে, চিঠি আসে। রেলগাড়িতে ক্যানিং, তারপর লঞ্চে গোসাবা, তারপর নৌকোয় বিজয়নগরের ঘাট, তারপর হাঁটাপথ। কত দূর যে ! কত যে ভীষণ দূর !

খামের ওপর একধারে বেগনে কালিতে রবার স্ট্যাম্প মারা। কালি জেবড়ে গেছে, তবু পড়া যায়—ফ্রম বসন্ত মিদ্দার, বি. এ. এল. এল-বি. অ্যাডভোকেট। আর বাংলায় মিছরির নাম ঠিকানা লেখা অন্যধারে। রবার স্ট্যাম্পের জায়গায়

বুঝি এক ফোঁটা গোলাপগন্ধী আতর ফেলেছিল, সুবাস বুক ভরে নিয়ে বড় যত্নে, যেন ব্যথা না লাগে এমনভাবে খামের মুখ ছিঁড়ল মিছরি। এ সময়টায় তাড়াতাড়ি করতে নেই। অনেক সময় নিয়ে, নরম হাতে, নরম চোখে সব করতে হয়। মা ডাকছে—ও মিছরি, আনাজ তুলতে বেলা গেল। লোকগুলোকে তাড়া দে, বিপিনটা কি আবার গ্যাঁজা টানতে বসে নাকি গ্যাখ।

বড় বিরক্তি। লোকগুলোর সত্যি খিদে পেয়েছে। আকাশমুখো চেয়ে উঠোনে হাভাতের মতো বসে আছে সব। তাদের মধ্যে যারা একটু মাতব্বর তারা বাবুর সঙ্গে এক চাটাইতে বসে কথাবার্তা বলছে। রান্নার লোকটা বিশাল কড়া চাপিয়ে আধসেরটাক তেল ঢেলে দিল।

মিছরি ক্ষেতে নেমে গিয়ে কুহুস্বরে ডাক দিল—বিপিনদা, তোমার হল ? রান্না যে চেপে গেছে। অড়হর গাছের একটা সারির ওপাশ থেকে বিপিন বলে—বিশটা মদ্দ খাবে, কম তো লাগবে না। হুট বলতে হয়ে যায় নাকি ! যাচ্ছি, বলো গে হয়ে এল।

মিছরি চিঠিটা খোলে। নীল, রুলটানা প্যাডের কাগজ। কাগজের ওপরে আবার বসন্ত মিদ্দার এবং তার ওকালতীর কথা ছাপানো আছে। নিজের নাম ছাপা দেখতে লোকটা বড ভালবাসে।

হুট করে চিঠি পড়তে নেই। একটু থামো, চারদিক দেখ, খানিক অন্যমনে ভাবো, তারপর একটু একটু করে পড়ো, গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট ছোট্ট কামড়ে।

চিঠি হাতে তাই মিছরি একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের মাঠে একটা ছোট্ট ডোবায় কে একজন কাদামাখা পা ধুতে নেমেছিল। জলে নাড়া পড়তেই কিল-বিলিয়ে একশো জোঁক বেরিয়ে আসে। মিছরি দেখতে পায়, লোকটা মাঠে বসে পায়ের জোঁক ছাড়াচ্ছে। ক্ষেতের উঁচু মাটির দেয়ালের ওপর কোন কায়দায় একটা গরু উঠে পড়েছে কে জানে। এইবার বাগানের মধ্যে হুড়াস করে নেমে আসবে।

নামুকগে। কত খাবে। বাগান ভর্তি সব্জী আর সব্জী। অঢেল, অফুরন্ত। বিশ বিঘের ক্ষেত। খাক।

উকিল লিখেছে—হৃদয়াভ্যন্তরস্থিতেষু প্রাণপ্রতিমা আমার……। মাইরি, পারেও লোকটা শক্ত কথা লিখতে। লিখবে না ! কত লেখাপড়া করেছে।

হু-হু করে বুক চুপসে একটা শ্বাস বেরিয়ে যায় মিছরির। লোকটা কত লেখা-পড়া করেছে তবু রোজগার নেই কপালে ! এ কেমন লক্ষ্মীছাড়া কপাল তাদের।

উকিল লিখেছে—ঘুমিয়া জাগিয়া কত যে তোমাকে খুঁজি ! একটু থমকে

যায় মিছরি। কথাটা কি! ঘুমিয়া? ঘুমিয়া মানে তো কিছু হয় না। বোধ হয় তাড়া-হুড়োয় ঘুমাইয়া লিখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে। হোকগে, ওসব তো কত হয় ভুল মানুষের। ধরতে আছে?

ছ্যাঁক করে ফোড়ন পড়ল তেলে। হিং ভাজার গন্ধ। রান্নার লোকটা বুঝি কাকে বলল—এর মধ্যে একটু ঘি হলে আর কথা ছিল না।

জ্যাঠা বোধ হয় সান্ত্বনা দিয়ে বলল—হবে হবে। তা মিছরি, পাথরবাটিতে একটু ঘি দিয়ে যা দিকিনি!

মিছরি আর মিছরি! ও ছাড়া বুঝি কারো মুখে কথা নেই! মিছরি নড়ল না। চিঠি থেকে চোখ তুলে উদাসভাবে আকাশ দেখল। আবার একটা টিয়ার ঝাঁক আসছে গাঙ পেরিয়ে। আসুক।

ছোটোকাকার এক বন্ধু ছিল, ত্র্যম্বক। মিছরির বিয়ের আগে খুব আসত এ বাড়িতে। বিয়ের পর আর আসে না। কেন বলো তো! মিছরি উদাস চেয়ে থাকে। কোনোদিন মনের কথা কিছু বলে নি তাকে ত্র্যম্বক। কিন্তু খুব ঘন ঘন তার নাম ধরে ডাকত। সিগারেট ধরাতে দশবার আগুন চাইত।

কেন যে মনে পড়ল!

উকিল লিখেছে—ত্রিশ টাকার মধ্যে কলিকাতায় ঘর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবি, বনগাঁ চলিয়া যাইব। সেখানে প্র্যাকটিসের সুবিধা হইতে পারে। বাসাও সস্তা।

তাই যদি যেতে হয় তো যাও। আমি আর পারি না। বিয়ের পর এক বছর চার মাস হল ঠিক ঠিক। আর কি পারা যায়, বলো উকিলবাবু। তোমার পাষাণ হৃদয়, তার ওপর পুরুষমানুষ, লাফঝাঁপ করে তোমাদের সময় কেটে যায়। আর আমি মেয়েমানুষ, লঙ্কাগাছে জল ঢেলে কি বেলা কাটে আমার, বলো? চোখের নোনা জলে নোনাগাঙে জোয়ার ফেলে দিই রোজ। উকিলবাবু, পায়ে পড়ি······

খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে, পটল সব ঢেলে দিয়ে রোগা বামুনটা আম গাছের তলায় জিরেন নিচ্ছে। গলার ময়লা মোটা পৈতেটা বেরিয়ে গেঞ্জীর ওপর ঝুলে আছে। বড্ড রোগা, ঘামে ভিজে গেছে তবু গেঞ্জী খোলে নি পাঁজর দেখা যাওয়ার লজ্জায়। বিড়ি ধরিয়ে ছোটোকাকাকে বলল—বৌ আর ছেলেপিলেদের সোনারপুর ইস্টিশানে বসিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তারা সব কদিন ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাবে। ঠিক করেছি বাদার যেখানে পাব জমি দখল করে ঘর' তুলে ফেলব আর চাষ ফেলে দেবো। মশাই, কোনোখানে একটু ঠাঁই পেলাম না আমরা। বাঁচতে তো হবে নাকি!

ছোটোকাকা বলে, কতদূর যাবেন? ওদিকে তো সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট আর নোনা জমি। বাঘেরও ভয় খুব। লোকটা বিড়ি টেনে হতাশ গলায় বলে, আসতে আসতে এতদূর এসে পড়েছি আর একটু যেতেই হবে। বাঘেরও খিদে, আমাদেরও খিদে, দুজনাকেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

উকিলবাবু আর কি লেখে? লেখে—সোনামণি, আমার তিনকুলে কেহ নাই, নইলে তোমাকে বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিতে হইত না। যাহা হউক, লিখি যে আর কয়দিন ধৈর্য ধর। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু হইবেই। ওকালতীতে পসার জমিতে সময় লাগে।

বুঝি তো উকিলবাবু, বুঝি। তোমার যেদিন পসার হবে ততদিন আমি থাকব তো বেঁচে! যদি মরে যাই, তবে তোমার লক্ষ্মীমন্ত ঘরে আর কোন না কোন পেত্নী এসে আমার জায়গায় ডেঁডেমুশে সংসার করবে। বালা বাজিয়ে হাওয়া খাবে, মাছের মুড়ো চিবোবে, গাল ভরতি পান খেয়ে রুপোর বাটায় পিক ফেলবে। ততদিন কি বাঁচবো উকিলবাবু?

বিপিন কলাপাতা কেটে উঠোনে ফেলছে। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে দলটার মধ্যে। ঝপাঝপ পাতা টেনে বসে পড়ল সব। বাঁ হাতে সকলের পাঁচ ছটা করে কাঁচা লঙ্কা, পাতে একথাবা নুন। খিচুড়ি এখনো নামে নি। সবাই কাঁচা লঙ্কা কামড়াচ্ছে নুন মেখে। ঝালে শিস দিচ্ছে।

উকিলবাবু কি লেখে আর? লেখে—বন্ধুর বাসায় আর কতদিন থাকা যায়? ভাল দেখায় না। ধারও অনেক হইয়া গেল। লজ্জার মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো……

গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে জিভের যন্ত্রণায়। একজন বুড়ো বলে—আস্তে খা। ফুঁইয়ে ফুঁইয়ে ঠাণ্ডা করে নে।

—উঃ, যা রেঁধেছো না হরিচরণ, লাট বাড়ির বাস ছেড়েছে।

মিছরি আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা হেলে গেছে। গাছতলায় আর ছায়া নেই। রোদের বড় তেজ।

দলের মাতব্বর জিজ্ঞেস করে মিছরির বাবাকে—ওদিকে কি কোনো আশা নেই মশাই? অ্যাঁ! এত কষ্ট করে এতদূর এলাম।

মিছরি ঘরে চলে আসে। চোখ জ্বালা করছে। বুকটায় বড় কষ্ট।

পড়ন্ত বেলায় মিছরি তার উকিলকে চিঠি লিখতে বসে—আশা হারাইও না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে…।

ঘণ্টাধ্বনি

সাঁঝবেলাতে গোয়ালঘরে ধুনো দিতে গিয়ে কালিদাসী শুনতে পেল, রামমন্দিরে খুব তেজালো কাঁসি বাজছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

গুণ্টু দুপুর থেকে বাড়ি নেই। আলায় বালায় সারাদিন ঘোরে। মাথা-গরম ছেলে। যখন তখন হাফ-পেন্টুল খুলে পুকুরে ঝাঁপায়। চৌপর দিন জলে দাপাদাপি করে। কবে জলের ঠাকুর টেনে নেয় ছেলেটাকে! তবে ভরসা এই, গুণ্টুর প্রাণে ভক্তি আছে। সন্ধে হলেই রামমন্দিরে গিয়ে বুড়ো বাজনদার আফিংখোর গোবিন্দর হাত থেকে কাঁসি কেড়ে নিয়ে নেচে নেচে বাজায়। ঐ বাজাচ্ছে এখন। কাঁইনানা কাঁইনানা।

কেলে গরুটার নাম শান্তি। ভারী নেই-আঁকড়া। কালিদাসীকে পেয়ে গলা এগিয়ে দিল। ভাবখানা—একটু চুলকে দাও। তা দেয় কালিদাসী। খানিকক্ষণ তুলতুলে কম্বলের মতো গলায় আঙুলের কাতুকুতু দিতে থাকে। অন্য গরু শিপ্রা ফোঁসফাঁস করতে থাকে। শিং নাড়া দেয়; কালিদাসী বলে—রোসো মা তোমাকেও দিচ্ছি। এ মুখপুড়ীর আর কিছুতেই আরাম ফুরোয় না।

মন্দিরে আরতি হচ্ছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের এই সময়ে প্রায়দিনই ভাব হত। ভাব হলে হাত-পা টানা দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে মুখে গাঁজলা তুলে নানা কথা বলত। সে সব কথা স্বয়ং ভগবানের। একবার কালিদাসীকে বলেছিল—ও কালী, ভুরের পায়েস খাব, এনে দিবি?

তা ভুরে গুড় দিয়েছিল কালিদাসী। একটু আধটু নয়, আধ মণেরও বেশী হবে। তাই দিয়ে সেবার বিরাট পায়েস ভোগ লাগানো হল মন্দিরে।

চক্কোত্তিমশাই এখন বয়সে পঙ্গু হয়ে টিনের চারচালায় দাওয়ায় চৌকি পেতে বসে থাকে দিন রাত। তামাক খায়। সেজো ছেলে মনোরঞ্জন এখন মন্দিরের সেবাইত। কালিদাসীর এখন আর যাওয়ার সময় হয় না। প্রায়ই ভাবে একদিন গিয়ে বসে আরতি দেখবে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার গোয়ালঘরে কালিদাসীর ভাল করে ঠাহর হয় না কিছু। টেমি হাতে এগিয়ে গিয়ে খড়ের গাদা গোছ করতে হাত বাড়িয়েই মধ্যের আঙুলে কাঁকড়াবিছের হুল খেয়ে উঃহুঃ করে ওঠে।

ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম কাঁকড়াবিছের হুল খেয়েছিল কালিদাসী তখন যন্ত্রণার চোটে সে কি দাপাদাপি! হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল! পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সে বিষ ব্যথা থানা গেড়ে ছিল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে।

তারপর মাসটাক যেতে না যেতে ফের একদিন হুল দিল। আবার দাপাদাপি। আবার হাসপাতাল। কিন্তু কাঁকড়াবিছেরা কালিদাসীকে সেই থেকে কেমন যে পেয়ে বসল। কাছে পেলেই হুল দেয়। এই ত্রিশ বছর ধরে মাসকে দু তিনবার দিচ্ছে। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন, তেমন লাগে না।

কালিদাসী টেমি রেখে খানিক কাঁচা গোবর বাঁ হাতের মাঝের আঙুলটায় বসাল ঠিক যেমন গোলাপগাছের কলমচারার ডগায় লোকে গোবরের ঢিবলি দেয়।

কালিদাসীর শরীরটা কাঁকড়াবিছের বিষে ভরে গেছে। এখন বিষে বিষক্ষয় হয়ে যায়।

আশ্চর্য এই বাচ্চা দেওয়ার সময়ে মেনী বিড়ালটা গোয়ালঘরে এসে ঐ খড়ের গাদায় বাসা বাঁধে। ফুলি কুকুরটা তো ফি-বছর খড়ের মাচার নিচে গর্ত করে চার পাঁচটা ছানা বিয়োয়। গরু দুটো সম্বচ্ছর এই ঘরে রাত কাটায়। এগুলোকে কোনো দিন হুল দেয় নি পোড়ারমুখোরা। মানুষের ওপর যত ওদের রাগ। আর মানুষের মধ্যে আবার সবচেয়ে ঘেন্নার হল ওদের কালিদাসী হতভাগী।

আঙুলে-গোবরে করে টেমি হাতে কালিদাসী গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঠের কপাটটা টেনে দিতে দিতে আপনমনে বকবক করছিল—ঝ্যাঁটাখেকো, কেলেঘেন্না, খালভরাগুলো কোথাকার! কালিদাসীর কাছে বড় জো পেয়েছিস।

নিচের তলার নতুন ভাড়াটে হেম ঘোষ, নতুন বিয়ে করেই মা-বাপ-ভাই ছেড়ে আলাদা বাসা করে উঠে এসেছে। তার বউ রেবা নাকি বড়ঘরের মেয়ে, কাজকর্ম করতে পারবে না। শ্বশুরবাড়িতে শুয়ে বসে থাকত বলে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া বেধে পড়ল। হেম ঘোষ বউয়ের পক্ষে। বাড়ি ছেড়ে উঠে এল। চাকরি তার তেমন কিছু নয়। দাশনগরে এক তালা তৈরির কারখানায় চাবির খাঁজ কাটে। ত্রিশ টাকার ঘর ভাড়াও দু মাস বাকি ফেলেছে। তবু বউয়ের সুবিধের জন্য সব সময়ে কাজ করার বাচ্চা ঝি বহাল করেছে, তার ওপর ঠিকে কাজের লোক তো আছেই।

দাওয়ায় বসে লুঙ্গি পরে হেম বিড়ি খাচ্ছিল। কালিদাসীর বকবকানি শুনে বলল—কি হল দিদিমা? কাঁকড়াবিছে কামড়াল বুঝি?

কালিদাসী বলল—তা কামড়াবে না কেন বাবা? কালিদাসী যে ভাল-মানুষের মেয়ে হয়ে শতেক পাপ করেছে।

হেম ঘোষ বিড়িটা ফেলে একটু তটস্থ হয়ে বলে—এ তো বড় মুশকিলের কথা হল দিদিমা! এ বাড়িতে বড্ড দেখছি কাঁকড়াবিছের উৎপাত! রেবাকে যদি কামড়ায় তো রক্ষে নেই।

কালিদাসী মনে মনে বলে—বউকে তাজমহলে নিয়ে গিয়ে রাখো গে যাও। দেখালে বটে তোমরা বাপ! আজকালকার রত্তি মেয়েরা কি করে যে গোটাগুটি পুরুষ মানুষগুলোকে হজম করে বসে থাকে!

ওপরের বারান্দায় উঠে আসতে আসতে কালিদাসী ফের মন্দিরের শব্দ শোনে। গুণ্টু কাঁসি বাজাচ্ছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

টেমি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় কালিদাসী। বুড়ো বয়সের ভুল। মন্দার মা বারান্দায় বসে উনুন সাজাচ্ছে, এক্ষুনি দেশলাই চাইবে। টেমিটা না নেবালে, দেশলাইয়ের কাঠি বাঁচত। ছাদে গিয়ে উনুন ধরাতে মন্দার মা না হোক চার পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবে।

এ সবই কালিদাসীর জ্বালা। সংসারে আছে এক উড়নচণ্ডী ছেলে, আর মেয়ের ঘরের নাতি ঐ গুণ্টু। তবু সংসারের হাজার চিন্তায় কালিদাসীর ডুবজল।

॥ দুই ॥

কানাই মাস্টারের আজ সারা দিন বড় হতভম্ব লাগছে।

এমনিতে কানাই বড় নিরীহ লোক। তিন বছর হল তার দশ বছর বয়সী ছেলেটা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী প্রায়। শরীরের সব কটা হাড়ের জোড়ে বিষযন্ত্রণা। হাঁটু, কনুই, কব্জি সব ফুলে আছে। শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঠারেঠোরে বলেছে, ভাল হওয়ার রোগ নয়।

কানাই মাস্টারের একটাই ছেলে, আর মেয়ে দুটো। তার নিজের বয়স বেশী নয়, চল্লিশ-টল্লিশ হবে। কিন্তু এ বয়সেই বড় বুড়োটে মেরে গেছে কানাই। ছেলের চিন্তা উদয়াস্ত ভিতরটা কুরে খায়। তার ওপর কটা টিউশনি করে রসকষ আরো মরে যাচ্ছে ক্রমে।

আজ হল কি, ইস্কুলের আট ক্লাসে থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস নিচ্ছে। মদন নামে

ধেড়ে ছেলে আছে একটা। তার গলায় আবার কালো তাগায় বাঁধা রুপোর তক্তি। রাঙামুলো চেহারা। কোনোকালে পড়াশুনোর ধার মাড়ায় না। পড়া জিজ্ঞেস করলে শুভদৃষ্টির সময়ে নববধূ যেমন চোখ নামায় তেমনি নতচোখে চেয়ে থাকে মেঝের দিকে। তার বাপ বড় কারবারি, তাই মাসকাবারে ইস্কুলের বেতন কখনো বাকি পড়ে না। সেই কারণে কেউ বড একটা ঘাঁটায়ও না মদনকে। আছো মদন, থাকো মদন গোছের ভাব করে সবাই তাকে এড়িয়ে যায়। প্রতি ক্লাসে তিন চার বছর করে থাকলে মদনের বাবদ ইস্কুলের একটা স্থায়ী আয় তো বহাল রইল। এমনিতে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ষাট সত্তরজনই ডিফলটার। কারো সাত আট মাসের বেতন বাকি পড়ে আছে। ধমক চমক করলে গারজিয়ানরা এসে হেডস্যারের হাতে পায়ে ধরে। সেই সব গারজিয়ানরাও 'দিন আনি, দিন খাই' গোছের। কেউ বিড়ি বাঁধে, কারো তেলেভাজার দোকান, একজন গামছা ফিরি করে ময়দানে। এই রকম সব। তাদের মধ্যে মদনের বাবা হচ্ছে নৈবেদ্যর কলা।

মদনা ক্লাস এইটে পড়লেও তো আর ছেলেমানুষ নয়। বয়সের ডাক দিয়েছে। শরীর জাম্বুবানের মত বড়সড।

বয়সের দোষই হবে। রোজই ইস্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে বীণাপাণি ইস্কুলের মেয়েরা যায়। ইস্কুলের বড ক্লাসের ধেড়ে ছেলেরা এই সময়টুকুতে রাস্তার মোড়ে, সামনের বারান্দায়, পাশের মাঠে জমে থাকে। কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট টানে, কেউ সাইকেলে করে বোঁ চক্কর মারে। যার যা আছে সব দেখায় মেয়েদের। হাসি-টাসি তো আছেই। ছেলেদের এইসব বোকামি দেখে মেয়েদের কেউ কেউ হাসিতে ঢলাঢলি করে যায়, কেউ গম্ভীর মুখে দৌড়-হেঁটে পালায়, দু-একজন 'জুতো মারব, লাথি মারব' গোছের কথা বলে শাসিয়েও গেছে। নিত্যিকার ঘটনা, কারো গায়ে লাগে না। আজ হল কি, থার্ড পিরিয়ডে যখন কানাই ক্লাস নিচ্ছে তখন টুকটুক করে একটা ফুটফুটে বছর দশেকের মেয়ে সোজা সরল পায়ে ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পাখির কণ্ঠে বলল, মাস্টারমশাই!

কানাই অবাক। মেয়েটার পরনে ইস্কুলের সাদা ইউনিফর্ম, হাঁটু পর্যন্ত বাহারী মোজা। মুখচোখে ভারী তিরতিরে সুন্দর।

কানাই মাস্টার মুগ্ধ হয়ে বলল, এসো মা। কি হয়েছে বলো তো?

মেয়েটা ক্লাসে ঢুকে একটা ভাঁজকরা কাগজ কানাইয়ের সামনের টেবিলে রেখে বলল, মাস্টারমশাই একটা দুষ্টু ছেলে আমি ইস্কুলে যাওয়ার সময় আমার হাতে এটা দিয়ে বলল, এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পোড়ো। কি সব বাজে কথা

লেখা আছে দেখুন। ঐ ছেলেটা। বলে মেয়েটি মদনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—

কানাই চিঠিটা খুলে দেখে তাতে লেখা—প্রীয়তম রোজী আমি তোমাকে ভালবাসে আমার মোনের কথা তুমি কী বুঝিতে পারো না? কিস জানিবে। তোমার প্রীয় মদন।

চিঠির ওপর শ্রীকালী লিখতেও ভুল হয় নি।

কানাই দুটো কারণে চটে গিয়েছিল। এক তো মেয়েদের চিঠি দেওয়া সাজ্ঘাতিক বেয়াদবি। তার ওপর এইটুকু একটা চিঠিতে এতগুলো বানান ভুল!

—তুমি এসো মা, আমি দেখছি। এই বলে কানাইমাস্টার রোজিকে বিদায় করে মদনকে ডাকল। যখন ডাকল তখনই একটা বেসামাল রাগ পেটের ভিতর থেকে উঠে আসছিল তার। সেই রাগে হাত থরথর করে কাঁপে, মাথাটা ঘোলা লাগে, দাঁতে দাঁতে বাতাস পেষাই হয়।

মদন কাছে আসতেই বিনা প্রশ্নে প্রথমে চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ঠক করে টেবিলে ঠুকে দিল কানাই। সেই সঙ্গে পিঠে যত জোরে সম্ভব এক কিল। বোঝা গেল মদনের চেহারাটা বড়সড় হলেও গাটা নরম। কিলটা নরম চর্বির থাকে এমন পড়ল যেন জলে কিল মারবার মতো মনে হল।

মদন এমনিতে ঠাণ্ডা ছেলে, সাত চড়ে রা কাড়ে না। আজও কাড়ল না। তাইতেই কানাইয়ের মাথাটা আরো বিগড়ে গেল। হারামজাদা, গিদ্ধড, পাজি, বদমাশ, নরাধম ঠিক নামতার মতো মুখে বলে যাচ্ছে কানাই আর মারছে। সে কি মার! মারের চোটে একবার গিয়ে দেয়ালে পড়ল, একবার ব্ল্যাকবোর্ডে, ফার্স্ট বেঞ্চের ডেস্কের কোণায় লেগে কপালটা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সমস্ত ক্লাস পাথরের মতো নিশ্চল। শুধু সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বেধড়ক ঠ্যাঙানি চলেছে তো চলেইছে। ডাস্টারটা দিয়েও কানাই মাস্টার মদনের চোয়াল, মাথা কান ফাটিয়ে দিয়েছিল আজ।

এরকম মার বড় একটা দেখা যায় নি স্মরণকালে। আর কানাই মাস্টার নিজের ছেলের অসুখ হওয়ার পর থেকেই মারধর করা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের খ্যাপা মার দেখে আশপাশের ক্লাস ফেলে মাস্টার মশাইরা ছুটে এসে দরজার কাছে ভিড় করে ফেললেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে বা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হেডস্যার এসে মাঝখানে পড়ে সেই আসুরিক ব্যাপার থামালেন। মদন তখন রক্ত মাখা মুখে, ফাটা ঠোঁটে, ফোলা গাল, ছেঁড়া চুল আর তোবড়ানো জামাকাপড়ে পাগলের মত চেঁচাচ্ছে—স্যার, আমাকে মেরো

ফেলুন স্থার! আমাকে মেরে ফেলুন স্থার! জুতো মারুন স্থার, আমি আজই সুইসাইড করব স্থার।

মদন এতো কথা কখনো বলে না। মার খেয়ে আজ তার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। মার খাবার পরও তার চেঁচানি আর থামে না। কেবল কাঁদে আর আরো মারতে বলে, সুইসাইড করবে বলে চেঁচায়। নিজের ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে সে সারা ইস্কুলময় দৌড়োদৌড়ি করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

কানাই মাস্টারের কুপিত বায়ু যখন ঠাণ্ডা হল তখন সে মদনের আচরণ দেখে ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। ছেলেটার হল কি?

টিচার্স রুমে কানাই মাস্টারকে সবাই ধরে এনে পাখার তলায় বসিয়েছে। ইস্কুলের সামনে পাবলিকের ভিড জমে গেছে। এই অবস্থায় মদন দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে মাস্টার মশাইদের পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে বলছে, লাথি মারুন স্থার জুতো মারুন স্থার। আবার উঠে গিয়ে আর একজনের পায়ে পড়ে ওরকম বলে।

হেডমাস্টারমশাই এসে কানাই মাস্টারের কানে কানে বললেন—ছেলেটার ব্রেনটা বোধ হয় ড্যামেজ হয়েছে। আপনি আর স্পটে থাকবেন না, বাড়ি চলে যান।

শুনে কানাইয়ের শরীর হিম হয়ে এল। আর বুকের কি ধড়ফড়ানি! শশী বেয়ারা রিকশা ডেকে দিল। কানাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই শয্যা নিয়ে রইল। সারাদিন ভাবছে—এ আমার আজ কী হয়েছিল? এ আমি করলাম কি?

বিকেলের দিকে একবার উঠে এসে নিজের ছেলের বিছানায় বসল কানাই। কৃশ করুণ মুখ তুলে ছেলেটা চাইল বাবার দিকে। একটু হাসল। সে হাসি কান্নার ওপরকার সরের মতো। বড সহ্যশক্তি ছেলেটার। কত সহ্য করছে! কানাই ভাবে, ওর ব্যথাগুলো কেন আমার হয় না?

ভাবতে ভাবতে বিছের হুলের মতো মদনের কথা মনে পড়ে। বড় যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে। এত পাপ কি ভগবান সইবেন। মদনের যদি ভালমন্দ কিছু হয় তো তার কর্মফল কানাইকেও অর্শাবে। যদি সেই পাপ ছেলেটার ওপর এসে পড়ে?

বাইরে কে ডাকছে। কানাইয়ের বউ দিনরাত কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে আজকাল বড় রোগা হয়ে গেছে। চেনা যায় না! সে এসে বলল, ইস্কুলের ছেলেরা এসেছে।

বুক কেঁপে গেল। তবু নিজেকে শক্ত করে উঠে এল কানাই।

বড় ক্লাসের কয়েকটা ছেলে গম্ভীরমুখে বাইরে দাঁড়িয়ে। একজন মাতব্বর গোছের ছেলে বলল—স্যার মদনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—হাসপাতাল! বলে কানাই হাঁ।

অন্য একটা ফচকে ছেলে বলল—আপনি ঘাবড়াবেন না স্যার। কয়েকটা স্টিচ পড়েছে মাত্র। আর কিছু নয়।

ছেলেরা চলে গেলেও হতভম্ব ভাবটা যায় নি কানাই মাস্টারের। ঘর থেকে কয়েকদিন না বেরোনাই ভাল। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই ক্ষেপে আছে। কে কোথা থেকে আধলা ছুঁড়বে হয়তো। নাহলে ধরে ঠ্যাঙালেই বা কি করার আছে! সবচেয়ে চিন্তির হয় যদি মদনের বাবা পুলিসের কাছে যায়। যায় নি কি আর! গেছে। পুলিসও বোধ হয় এতক্ষণে রওনা হওয়ার জন্য কোমরের কষি বাঁধতে লেগেছে। রক্তপাতে ফৌজদারি হয় সবাই জানে।

ছেলের মা এসে বলল, বাজারে যাও। তেল মসলা কিছু নেই।

শ্বাস ছেড়ে কানাই ওঠে। সন্ধের মুখে রামমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। সঙ্গে ঠনঠন কাঁসির আওয়াজ রোজ ভাল লাগে না। আজ লাগল। ঘণ্টা ডাকছে।

কানাই বেরিয়ে পড়ে। চোখে জল আসছে। বুকটা কেমন করে। কোনোকালে মন্দিরে যায় না কানাই মাস্টার। আজ ভাবল একবার যাবে। বুড়ো চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। সবাই বলে লোকটা খুব বড় মানুষ। এককালে তাঁর ভর হত। জিজ্ঞেস করবে—আমার পাপ কি ছেলেতে অর্সাবে ঠাকুর?

॥ তিন ॥

রেবার গানের মাস্টারমশাই এসেছে। লোকটা ছোকরা, তার উপর গান শেখায়। এসব লোক বড় বিপজ্জনক হয়।

তাই প্রথম প্রথম গানের মাস্টার এলেই হেম গিয়ে ঘরে মোড়া পেতে বসে সব লক্ষ্য করত। গানের আড়ালে আবডালে দুজনের কোনো হেলন দোলন নজরে পড়ে কিনা।

একদিন রেবা ধমক দিল মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর। বলল—সুরের কিছু বোঝ না, তবু সামনে গিয়ে অমন হাঁ করে বসে থাকো কেন বলো তো?

তুমি সামনে থাকলে আমার গাইতে বড় লজ্জা করে। আর কখনো ওরকম করবে না বলে দিচ্ছি।

কপাল এমনই যে হেমের বউ রেবা বেশ সুন্দরীই। সাদাটে রঙ, লম্বাটে গড়ন, মুখখানা মন্দ নয়, তার ওপর চোখ দুখানা ভারী মিঠে। এমন করে তাকায় যেন সব সময় বড অবাক হয়ে আছে। এইরকম বউ যার থাকে তার বড় জ্বালা।

হেমের আজকাল বার বার ডাইসে হাত পরে যায়। গরম লোহার ছেঁকাও বিয়ের পর থেকে বড্ড বেশী খাচ্ছে হেম। কারখানায় কাজের সময়ে অন্যমনস্ক থাকলে আরো কত বিপদ হতে পারে। রেবার মতো সুন্দরী বউ জুটবে এমন ভরসা তার ছিল না কখনো, তবু কোন পুরুষ না বিয়ের আগে সুন্দরী বউয়ের কথা ভাবে। হেমও ভাবত। কিন্তু এ জ্বালা জানলে বিয়েতে বসবার আগে আর একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখত সে।

বিয়ের পর একদিন হাওড়ার থুরুট রোডের কাছে সিনেমা দেখতে গেছে। টিকিট কাটবার পর শো শুরু হতে দেরি আছে দেখে হেম রেবাকে নিয়ে লেমোনেড খেতে গেল। রেবা লেমোনেড দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি খেল। রেবার বড়ি খাওয়ার দৃশ্যটা হাঁ করে দেখছিল হেম। দেখতে গিয়ে এত মজে গিয়েছিল যে সে নিজেও রেবার মতো ঘাড উঁচু করে হাঁ করে বড়ি গেলার মতো ভাব করে ফেলেছিল নিজের অজান্তে। তারপর যখন রেবা লেমোনেডের ঝাঁঝে মুখচোখ কোঁচকালো তখন তাই দেখে হেমেরও কোঁচকালো। আর এইসব হওয়ার সময়ে দোকানের চওডা আয়নায় হেম হঠাৎ দেখতে পায় তিন চারটে বখা ছেলে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রেবার দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি বলাবলি করছে।

ভ্রূ কুঁচকে খানিক চেয়ে থাকে সে। মাথা বিগড়ে গেল। সে গুণ্ডা নয়, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, হলে ভাল হত। তার বৌয়ের দিকে নাহক লোকে তাকাবে—এ কেমন কথা?

হলে ঢুকবার পর গণ্ডগোলটা পাকাল। সেই তিনটে ছোঁড়া একেবারে পিছনের সীটে। হেম ছবি দেখবে কি, বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখছে। নিউজরীল শেষ হয়ে ইণ্টারভ্যালের আলো জ্বলবার সময়ে দেখল এক ছোকরা রেবার সীটের পিছনে হাত রেখেছে। আর যাবে কোথায়!

—কিরকম ভদ্রলোক হে তুমি? ভদ্রমহিলার একেবারে ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছো? এই বলে খেঁকিয়ে উঠেছিল সে।

ছেলেগুলো আচমকা ধমক খেয়ে প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপরই

তেড়ে ফুঁড়ে উঠে তারাও তড়পাতে থাকে—কে মেয়েছেলের ঘাড়ে হাত রেখেছে? আপনি তুমি-তুমি করে বলছেন কেন? অত ছুঁচিবাই থাকলে মেয়েছেলে সিন্দুকে ভরে রেখে আসবেন। লেডীজ সীটে গিয়ে বসবেন এবার থেকে।

হেম হাতফাত চালিয়ে দিত ঠিক। রেবাই তাকে সামলায়। পরে বাড়ি ফেরার সময় বলেছিল—ওরা কিছু তো করে নি, তুমি রেগে গেলে কেন?

রাগ যে কেন হয় হেমের, তা কারো বোঝার নয়। এই জীবনটা এই রকম জ্বলে পুড়ে যাবে।

ছোকরা গানের মাস্টার ঘরে সন্ধের আলো জ্বালবার মুখটাতেই এসে হাজির। রেবা প্রায় দুপুর-দুপুর বেলা থেকে খুব সেজে বসে আছে। কোলে খোলা গানের খাতা নিয়ে বিছানায় আসন পিঁড়ি হয়ে বসে তখন থেকে 'তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায় কেউ বা সিরাজি মাগে' লাইনটায় সুর লাগাচ্ছে। হেমকে দেখেও দেখছে না।

হেম ঘোষের গলায় এক সময়ে সুর ছিল। না ঠিক গানের গলা নয়! তবে সিনেমা বা রেডিওর গান গুনগুন গুন করতে করতে প্রায় সুরটা এনে ফেলত।

আচ্ছা, এমন হতে পারে না কি যে, হেম খুব গোপনে কোনো বড় ওস্তাদের কাছে গিয়ে গান শিখে খুব বড গাইয়ে হয়ে গেল একদিন। রেবা টেরও পেল না এত কাণ্ড। তারপর কোনোদিন হয়তো রেবার মাস্টার গান শেখাতে এসে সুর তুলতে গলদঘর্ম হচ্ছে, এমন সময়ে সাদামাটা চাবির কারিগর হেম ঘোষ হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত সুরে গানটা গেয়ে দিল! রেবা তখন যা অবাক হয়ে তাকাবে না! সেই দিনই মাস্টারকে অহঙ্কারের সঙ্গে বলে দেবে—আর আপনাকে দরকার হবে না প্রভাসদা। তারপর হেমের সঙ্গে যখন একা হবে রেবা তখন দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে হেমের কালো মোটা ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলবে—তোমার ভিতর কত জাদু আছে বলো তো! তখন হেম খুব হাসবে। খুব হাসবে। একেবারে হেঃ হেঃ করে পেট ভরে হেসে নেবে একচোট।

দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ এইসব ভাবল সে। ঘর থেকে গান আসছে, গোয়াল থেকে মশা। আর শুকনো গোবরের গন্ধ। কাঁকড়াবিছের চিন্তাটাও বড্ড পেয়ে বসেছে হেমকে। চক্কোত্তিমশাই অনেক ওষুধ জানেন। দিনেকালে কত শক্ত রোগ ভালো করেছেন বলে শোনা যায়। একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে গিয়ে কাঁকড়াবিছে কামড়ালে কি ওষুধ দিলে আরাম হয় তা ফাঁকমতো জেনে আসবে হেম। রেবার যা সুখের শরীর, একবার বিষবিচ্ছুর কামড় খেলে ফুলের মতো শরীরটা নীলবর্ণ হয়ে নেতিয়ে পড়বে না? ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

'…কেউ বা সিরাজি মাগে—এ-এ' গানের মাস্টারের ভরাট গলার সঙ্গে ডুয়েটে রেবার কোকিলস্বর জড়ামড়ি করছে। সইতে পারে না হেম ঘোষ। বিড়িটা নিবে গিয়েছিল, আর ধরাতে ইচ্ছে হল না। ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরোবে।

হেমের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর জামাটা চড়িয়ে নিলে হত। কিন্তু এ সময়টায় ঘরে ঢুকতে সাহস হয় না। রেবা রেগে যাবে ঘরে ঢুকলে।

উঠোন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচলের গায়ে বেরোনোর দরজা। ঠিক দরজার চৌকাঠে মুখোমুখি কালিদাসীর ছেলে অভয়পদর সঙ্গে দেখা। অভয়পদর হাতে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি। ঝালের চোটে শিস টানছিল। হেম ঘোষকে দেখে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরল। হেম হাত পাতলে ঠোঙা উপুড় করে দেয় অভয়। তলানি মুড়িতে যত কুঁড়ো মিশে আছে। তাই মুখে ফেলে হেম ঘোষ বলে—খবর কি?

—আর খবর! অভয়পদ বলে—আজও মোহনবাগানের একটা পয়েন্ট গেল।

হেম ঘোষ খেলার মাঠের খবর রাখে না। তবু অভয়পদকে তোয়াজ করবার জন্য বলল—এঃ হেঃ! একটা পয়েন্ট চলে গেল?

অভয়পদর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাওড়ার বিখ্যাত মাতব্বর জ্ঞান সরকারের শাগরেদ। জ্ঞানদা ওর মাথাটা খেয়ে রেখেছে। ঘুমে জাগরণে সবসময়ে ওর মুখে জ্ঞানদা আর মোহনবাগানের কথা। কবে জ্ঞানদা ডেকে অভয়পদর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেছে, কবে যেন বলেছে—অভয়, আমার বাড়িতে একটা বাচ্চা চাকর ঠিক করে দিস তো, কবে হয়তো জ্ঞানদার গাড়িতে উঠে বড়বাজারের লোহাপট্টিতে গেছে এ সবই অভয়পদর বলবার মতো কথা। আজকাল অভয়পদকে দেখলেই লোকে সটকাবার তাল করে। কাঁহাতক জ্ঞানদার বৃত্তান্ত শোনা যায়!

হেম ঘোষের সেই ভয়। তবে কিনা অভয়পদর আর কোনো দোষ নেই। বরং জ্ঞানদার শাগরেদি করে সে চিরকুমার রয়ে গেছে, মেয়েমানুষকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে, লোকের বেবীফুড যোগাড় করে দেয়, ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসে পাঁচজনের। মড়া পোড়াতে যায়। বাড়ি ভাড়ার টাকা তুলে, দুধ আর ঘুঁটে বেচে মা কালিদাসী সংসারটাকে কষ্টেসৃষ্টে টেনে নেয়। নিষ্কর্মা অভয়পদ তাই বড় সুখে আছে।

অভয়পদ বলল—আজ একটা মিটিং আছে জ্ঞানদার বাড়িতে, বুঝলে? চা-টা খেয়েই বেরোবো।

—খুব ভাল। বলে হেম বেরিয়ে আসছিল।

মানুষ যে কেন খ্যামোকা মিটিং করে মরে আজও হেম বোঝে না। যত সব ফালতু কারবার। দশটা মাথা এক হয়ে যত সব গুজুর গজুর, ফুসর ফস্থুর।

সিঁড়ির মুখ থেকে অভয়পদ ফিরে এসে বলল—ও হেম, শোনো।

হেম ভয়ে সিটিয়ে যায়। মিটিং-এর কথা না ফেঁদে বসে। ওসব কথায় বড্ড মাথা বিগড়ে যায় তার।

অভয়পদ গলার স্বর নামিয়ে বলে—তোমার বউ কি সিগারেট-টিগারেট টানে নাকি! রাতে ওপরের বারান্দা থেকে যেন দেখলুম উঠোনে রেবা সিগারেটে টান মারতে মারতে পায়চারি করছে।

কী কেলেঙ্কারী! হেমের ভিতরটা যেন লজ্জায় গর্তের মতো হয়ে যায়। কাল তখন অনেক রাতে তারা স্বামী-স্ত্রী জ্যোছনা দেখতে উঠোনের দিকে দাওয়ায় এসে বসেছিল একটু। এমনিতে হেম ঘোষ সিগারেট খায় না, রেবার চাপাচাপিতে ইদানীং খেতে হচ্ছে। কাল রাতেও খাচ্ছিল। সদ্য ধরানো সিগারেটটায় দু টান দিতে না দিতেই রেবা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল—আমি খাবো।

হেম অবাক। দেখে, রেবা দিব্যি ফসফস টান মারছে। কাশিটাশি নেই, চোখে জলও এল না ধোঁয়ার। বলল—আগে খেতেটেতে নাকি?

—কত! বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে অনেক খেয়েছি। বেশ লাগে।

বলে রেবা সিগারেট টানতে টানতে উঠোনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে সময়ে বাড়ির কারো জেগে থাকবার কথা নয়। তারাও কিছু টের পায় নি। রামচন্দ্র হে! অভয়পদ দেখে ফেলেছে তবে!

হেম ঘোষ হেসে আমতা আমতা করে বলে—ঐ শখ করে দুটো টান দিয়েছিল আর কি! তারপর কেশে-টেশে ফেলে দেয়।

অভয়পদ আদর্শবাদী লোক। মুখটা কেমনধারা করে বলল—দেশটা যে একেবারে সাহেব হয়ে গেল হে হেম! ভারতবর্ষের কত সম্পদ ছিল!

কথাটা ভাল বুঝল না হেম। অভয়পদও বুঝিয়ে বলল না। চলে গেল।

রেবাকে সিগারেট খেতে অভয় দেখেছে, লজ্জা শুধু সে জন্যই নয়। হেম ঘোষ আর একটা কথা ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে জিভ কাটল। কী কেলেঙ্কারী! কাল জ্যোছনায় তাদের দুজনেরই বড় রস উস্কেছিল। নিরিবিলি, নিশুতি জ্যোছনায় পরীর মতো বৌটাকে দেখে খুব দুচারটে দেহতত্ত্বের কথা হেসে হেসে বলে ফেলেছিল হেম। রেবাও দুচারটে ভাল টিপ্পনী ঝেড়েছিল। দোষের কথা নয়। স্বামী-স্ত্রী একা হলে এরকম কত কথা হয়! কিন্তু সেসবই যে শুনে ফেলেছে অভয়পদ! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

এই জিভ কাটা অবস্থায় হেম ঘোষ যখন দাঁড়িয়ে ঠিক তখনই এক জোড়া মাঝ-বয়সী স্বামী-স্ত্রী ভুঁইফোঁড়ের মতো তার সামনে কোত্থেকে হাজির হয়ে আচমকা বলল—আচ্ছা মশাই, গুণ্টু কি বাড়িতে আছে?

আর এক দফা লজ্জা পেয়ে হেম বলে—না, সে মন্দিরে কাঁসি বাজাতে গেছে।

॥ চার ॥

গুণ্টু যখন কাঁসি বাজায় তখন সে নিজেই শব্দ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কিরকম হয়, কাঁসি বাজাতে বাজাতে শব্দটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। কাঁইনানা কাঁইনানা হয়ে বাজতে বাজতে কানে তালা ধরে আসে, শরীর ঝিমঝিম করে। তারপর শব্দটা যেন তার চারধারে লাফাতে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে বহুদূর চলে যায়। আবার ফিরে আসে। তারপরই সে পরিষ্কার টের পায় শব্দটা আকাশ বাতাস সব হাঁ করে গিলে ফেলল। প্রকাণ্ড হয়ে গেল। দুনিয়াভর হয়ে গেল। আকাশভর হয়ে গেল। তারপর আর গুণ্টু নিজেকে টের পায় না। বড় মজা হয় তখন। গুণ্টু শব্দ হয়ে যায়।

মাস দুই আগে গুণ্টু চৌধুরাদের প্রকাণ্ড বাগানে পেয়ারা চুরি করতে ঢুকেছিল। দুপুরবেলা। কোথাও কিছু না, হঠাৎ একটা শিরীষগাছে এক হনুমানকে দেখতে পেল সে, বুকে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে।

যে কোনো কিছুকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়া গুণ্টুর স্বভাব। বে-খেয়ালে কত সময় কত মারাত্মক জায়গায় ঢিল ছুঁড়েছে সে। চলন্ত গাড়ির হেডলাইট ফাটিয়েছে একবার, রাস্তার আলো ভেঙেছে কতবার, জ্ঞান সরকারের বাইরের ঘরের দেয়ালঘড়িটা রাস্তা থেকে ঢিল ছুঁড়ে ভেঙেছিল।

সেই স্বভাববশে হনুমানটার দিকেও খামোকা একটা মুঠোভর ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল। হনুমানটার তেমন লাগে নি তাতে। কিন্তু হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেটা হড়হড় করে গাছ থেকে নেমে এসে তাড়া করল গুণ্টুকে। গুণ্টু দৌড় দৌড়। জংলা বাগানটার মাঝ বরাবর পুরোনো পুকুর, তাতে সবুজ শ্যাওলা থিকথিক করছে, বড় বড় মাছ। অন্যদিকে পথ না পেয়ে গুণ্টু সেই পুকুরে ঝাঁপ খায়।

গুণ্টু সাঁতরায় ভালই। কিন্তু ত্যাঁদড় হনুমানটার জ্বালায় কিছুতেই আর জল ছেড়ে উঠতে পারে না। যেদিক দিয়ে উঠতে যায় সেদিকেই সেটা গিয়ে হুপ

হুপ করে হাঁক ছাড়ে। সেই হাঁক-ডাকে আরো কয়েকটা হনুমান কোত্থেকে এসে জুটল। অথৈ জলের মধ্যে গুণ্টুকে সারাক্ষণ হাত পা নেড়ে ভেসে থাকতে হয়েছিল। ফলে পচা আঁষটে গন্ধ, শ্যাওলার লতা বারবার পায়ে হাতে জড়াচ্ছে, বড় বড় জাহাজের মতো মাছ মাঝে মাঝে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘষটে যাচ্ছে। কয়েক-বার লেজের ঝাপটা খেল। এক হাত তফাত দিয়ে সাঁতরে চলে গেল একটা জলঢোঁড়া। পায়ের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ডুব দিয়ে বহুবার থৈ খুঁজে পেল না গুণ্টু। তার কচি বুকে দম বেশী ছিল না তো। তাই এক সময়ে হঠাৎ চোখের সামনে সূর্য নিবু নিবু হয়ে গেল, বুকে বাতাসের টান, হাতে পায়ে খিল। সে তখন বিড়বিড় করে বলেছিল—আমি যে রোজ সন্ধেয় তোমার মন্দিরে আরতির সময়ে কাঁসি বাজাই!

তারপরই হঠাৎ যেন এক পাতালপুরীর হাত এসে গুণ্টুকে টেনে নিল জলের তলায়।

সেইখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। মরলে তো সবাই তাঁর দেখা পায়। গুণ্টু গিয়ে দেখে আরেব্বাস। সেখানে পেল্লায় চৌকি পেতে বুড়ো চক্কোত্তিমশাই বসে তামাক খাচ্ছেন। তাকে দেখে বলে উঠলেন—গুণ্টু রাজার গালে হাত! গুণ্টু রাজার গালে হাত! গুণ্টু রাজার গালে হাত।

তা গালে হাত দেওয়ারই দাখিল। যা অবাক হয়েছিল। তবু গুণ্টু চক্কোত্তি-মশাইকে অচিন জায়গায় পেয়ে ভারী খুশী। প্রণাম করে ফের ভাল করে তামাক সেজে দিল। চক্কোত্তিমশাই বললেন—তা শব্দ হওয়া ভাল। দুনিয়াটা হলই তো শব্দ থেকে। যেখানে সেখানে ভাল করে যদি শুনিস তো দেখবি, দুনিয়ায় সব শব্দ। তুইও শব্দ, আমিও শব্দ। মনে করিয়ে দিস, তোকে ভাল দিন দেখে একটা শব্দ দেবো'খন। সে এমন শব্দ যে কাঁসির শব্দ তার কাছে কোথায় লাগে। এখন যা।

ডোবার আধঘণ্টা পর গুণ্টু ফের ভেসে উঠেছিল। পেটে জল, মুখে গাঁজলা, চোখের মণি ওল্টানো, জ্ঞান নেই, মৃত্যুক্ষীণ নাড়ী চলছে না। তাই দেখে হনুমানগুলো এমন হাল্লাচিল্লা ফেলে দিয়েছিল যে চৌধুরী বাগানের বুড়ো মালী এসে পড়েছিল দুপুরের ঘুম ভেঙে। সেই তোলে গুণ্টুকে। পেটের জল বার করে সেক তাপ দেয়। ডাক্তার-বদ্যি করতে হয় নি, হাসপাতালেও যেতে হয় নি। কেউ তেমন টেরও পায় নি ঘটনা।

বেঁচে গিয়ে তেমন অবাক হয় নি গুণ্টু। কেমন করে যেন মনে হয়—মরলেই হল আর কি! চক্কোত্তিমশাই সব জায়গায় পাহারা দিচ্ছে না! যেখানেই যাও

গিয়ে দেখবে ঠিক বুড়ো মানুষ আপদবিপদের দোর আগলে চৌকি পেতে বসে তামাক খাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

রাম মন্দিরে আরতির সময় এখনো বেজায় ভিড় হয়। নতুন ঠাকুরমশাই আরতিও করেন ভাল, তবে কিনা চক্কোত্তিমশাইয়ের আরতি যারা দেখেছে তাদের চোখে অন্য কিছু আর লাগে না। তবু অভ্যাসবশে মানুষ এসে দাঁড়ায় খানিক।

এখান থেকে চারচালাটা বেশী দূর নয়। নাটমন্দিরের পর একটা মাঠ তারপর একটা কাঁচা রাস্তা, সেটা পেরিয়েই বাগানের বাঁশের বেড়ার গায়ে কাঠের ফটক। কয়েকটা ফুল গাছের ঝোপ, জোনাকি পোকার আলো, একটু অন্ধকার। খোলা দাওয়ায় একটা চৌকি পাতা, সাদা বিছানা, মেঝেয় চটি জোড়া নিখুঁতভাবে রাখা, একপাশে গড়গড়া। বিছানায় চক্কোত্তিমশাই দুটো বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে থাকেন। গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ হয়।

আউন্তি যাউন্তি মানুষজন দু দণ্ড দাঁড়ায় এসে সামনে। বলে—চক্কোত্তিমশাই, মন্দিরের পুজোয় আর যে যান না!

বুড়ো মানুষটি একগাল হেসে বলেন—রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মেয়েরা ততদিন এই পুতুল খেলে যতদিন বে না হয়। বিয়ে করে আসল ঘরসংসার পেলে আর পুতুল খেলে কে রে?

লোকে একটু আধটু বোঝে না যে তা নয়।

গুণ্টু বোঝে। আরতির পর গুণ্টুর অনেকক্ষণ সাড় থাকে না। মগজে তখন কেবল ঘণ্টার শব্দ, কেবল কাঁসির আওয়াজ।

একদিন বলে ফেলেছিল গুণ্টু—আরতির পর আমি এক অন্যরকম ঘণ্টার শব্দ শুনি। সে আওয়াজ মন্দিরের নয়, অন্য জায়গা থেকে আসে।

চক্কোত্তিমশাই সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—খুব মনপ্রাণ দিয়ে শুনবি। কাউকে বলিস না।

গুণ্টুর মায়ের কথা মনে নেই। সে মায়ের পেট থেকে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মারা যায়। সেই থেকে সে দিদিমার কাছে। তার বাবা আবার বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে ঝাড়গ্রাম থেকে বাবা তাকে দেখতে আসে। ভারী নিরীহ, ভীতু মানুষ, দ্বিতীয় পক্ষের দাপটে অস্থির। দ্বিতীয় পক্ষ আসতেও দেয় না বড় একটা। কিন্তু বাবা এলে গুণ্টুকে দেখে ভারী খুশী হয়। এক গাল হাসে, বড় চোখে হাঁ করে এমনভাবে দেখে যেমন লোভী লোক খাবারের দোকানের দিকে চায়।

বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—বলো তো বাবা, তোমার কে কে আছে?

গুণ্টু ভেবেচিন্তে বলেছিল—দিদিমা, মামা আর চক্কোত্তিমশাই।

বাবা অবাক হয়ে বলে—চক্কোত্তি আবার কে?

—সে আছে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—আর আমি?

গুণ্টু তখন লজ্জা পেয়ে বলে—হাঁ বাবা, তুমিও। আর সৎমা।

—ছিঃ বাবা, সৎমা বলতে নেই। লোকে খারাপ ভাববে। শুধু মা। আরো বলি বাবা, তোমার কিন্তু আর দুটি বোন আছে। তারা তোমাকে ভারী দেখতে চায়। তোমার মাও বলে, এবার গুণ্টুকে নিয়ে এসো।

গুণ্টুর যে যেতে অনিচ্ছে তা নয়। কিন্তু দিদিমা ছাড়তে চায় না। কথা উঠলে বলে, আঁতুড় থেকে মানুষ করছি ওর নাড়ী আমি ছাড়া আর তো কেউ চিনবে না। অন্যের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মুশকিল হল, গুণ্টু শুনেছে, তার সৎমায়ের দুটি মাত্র মেয়ে, আর নাকি ছেলেপুলে হবে না। কিন্তু সৎমায়ের খুব ছেলের শখ। তাই এখন প্রায়ই গুণ্টুর বাবাকে বলে, সতীনপোকে নিয়ে এসো, তাকে নিজের ছেলে করে নেবো।

তাই বাবা আজকাল খুব ঘন ঘন আসে। গুণ্টুও জানে, একদিন তাকে হয়তো ঝাড়গ্রামে চলে যেতে হবে। সৎমাকে সে দেখেনি। তবে 'মা' বলে কাউকে ডাকতে খুব ইচ্ছে করে তার। আবার এ জায়গা ছেড়ে, দিদিমা মামা আর চক্কোত্তিমশাইকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছেও করে না। গুণ্টুর আজকাল তাই মনটা দুভাগ হয়ে গেছে।

মামা প্রায়ই গুণ্টুকে বলে—তোকে যা একটা লীডার তৈরি করব না গুণ্টু, দেখে নিস। একটু বড হ, তখন জ্ঞানদার কাছে নিয়ে গিয়ে এমন ট্রেনিং দেওয়াবো। জ্ঞানদার হাতে কত লীডার তৈরি হয়েছে।

গুণ্টুর লীডার হতে খুব ইচ্ছে।

আরতির শেষে আজ বড় একা একা লাগছিল গুণ্টুর। কাঁসি বাজানোর সময় আজ তিনধা নাচন নেচেছে। এখন তাম্রপাত্র নিয়ে নাটমণ্ডপের ধারে বসে হাজারটা হাতের পাতায় তামার কুশি দিয়ে চরণামৃত দিচ্ছে। কত হাত! হাত-গুলোতে ভয় লোভ হিংসে মাখানো। এক আধটা হাত ভারী ঠাণ্ডা। দেখে দেখে আজকাল বুঝতে পারে সে।

একটা সাদা কাঁপা-কাঁপা হাত থেকে খানিক চরণামৃত চলকে পড়ে গেল। মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই গুণ্টুর। কিন্তু সে ঠিক টের পায় এ হাতটা হল কানাই মাস্টারের। কানাই স্যারের প্রাণে আজ বড় কষ্ট।

একটা ছ্যাঁকা খাওয়া, কড়া পড়া বিদঘুটে হাত দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল গুণ্টু, এ হল হেম ঘোষ। হেম ঘোষের হাতটা কাকে যেন খুন করতে চায়।

একবার চক্কোত্তিমশাই একটা কচি বেলগাছ দেখিয়ে গুণ্টুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বলতো কত পাতা আছে গাছটার।

ভেবেচিন্তে গুণ্টু বলে—হাজার দুই হবে।

—দেখ তো গুণে।

সে বড় কষ্ট গেছে। এক মানুষ সমান উঁচু গাছটার নিচে টুল পেতে তার ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাতা গুণতে হল। দাঁড়াল চার হাজারের ওপর। তবু একটা আন্দাজ হল।

সেই থেকে চক্কোত্তিমশাই এরকম হরেক জিনিস আন্দাজ করতে শেখান গুণ্টুকে। করতে করতে গুণ্টুর আন্দাজ ভারী চমৎকার হয়েছে। খুব ঝুপসি গাছ হলেও তা দেখে টকাস করে বলে দিতে পারে তাতে পাতা কত। জানে, গুণে দেখলে ঠিক মিলে যাবে।

চক্কোত্তিমশাই শিখিয়েছেন, রোজ রাতে শোওয়ার আগে বিছানায় বসে সারা দিনের কথা ভাববে। সকাল থেকে কী করলি, কী খেলি, সব হুবহু মনে করা চাই। এ না করে ঘুমোবি না।

তাই করত রোজ গুণ্টু। ছ মাস পর তার বেশ তড়তড়ে মন হল। টক করে সব মনে পড়ে যেতে থাকে। তখন চক্কোত্তিমশাই শেখালেন, এবার রোজকার কথা, আর তার সঙ্গে আগের দিন, আগের আগের দিন এইভাবে মনে করবি। করতে করতে দেখবি একদিন তোর আর জন্মের কথা মনে পড়ে যাবে।

—তাতে কী হয় চক্কোত্তিমশাই ?

—তাহলে আর মানুষ মরে না। দেহ ছাড়ে, কিন্তু মরে না।

গুণ্টুর দিকে আর একটা হাত এগিয়ে আসে। হাতে শাঁখা, তাতে সিঁদুরের দাগ। গুণ্টু যেন এ হাত চেনে। কুশি তুলেও গুণ্টু থেমে থাকে। এ হাত কি চরণামৃত চায় ? না। এ হাত একটা ছেলে চায়। এ হাতের বড আকুলি বিকুলি।

হাতটা ঐ অত হাতের ভিড়ের ভিতর থেকে একটু ওপরে উঠে এসে গুণ্টুর থুতনি ধরে মুখখানা ওপরে তুলল। আর তখন নাটমন্দিরের জোর আলোয় একজোড়া জল টলটলে চোখ দেখতে পায় গুণ্টু। ঘোমটার নিচে ফর্সা মুখ। ঠোঁটে একটা কান্নায় ভেজা হাসি। পিছনেই বাবা দাঁড়িয়ে। ভারী তটস্থভাবে বাবা মহিলাটির কাঁধে হাত দিয়ে বলল—এখন না। ও এখন ব্যস্ত। বাড়িতে যাক, ভাল করে দেখো।

চোখ বুজে মহিলাটি বলে—এ যে দেবতার মতো ছেলে। আমার সতীন বড় ভাগ্যবতী ছিল।

গুণ্টু ভারী লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হাতে হাতে চরণামৃত ঢেলে দিতে থাকে সে। মাথা নিচু। কারো মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই।

॥ পাঁচ ॥

রেবা ঝুঁকে গানের খাতা দেখছিল। গানের মাস্টার প্রভাস খানিকক্ষণ তবলায় আড়া চৌতাল তুলবার চেষ্টা করে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। নতমুখী রেবার দিকে চেয়ে রইল খানিক। বেশ দেখতে মেয়েটা। মাঝে মাঝে এমন করে তাকায় যে ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

প্রভাস অনেকদিন ধরেই বুঝবার চেষ্টা করছে, রেবার হাবভাবে কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা। মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, আছে। আবার কখনো মনে হয়, না, নেই।

আছে কি নেই সেটা বুঝবার জন্যও একটা কিছু করা দরকার। ধসা কানা হয়ে বসে থেকে কোনোদিনই তা বোঝা যাবে না।

ভাবতে ভাবতে প্রভাস একবার বাঁয়ায় একটা টুম শব্দ তুলল। রেবা তাকাল না। বাঁ হাতখানা হারমোনিয়মের ওপর দিয়ে এসে ঝুলছে। কী চমৎকার আঙুল! এই মেয়ের বর কিনা হেম ঘোষ! কাকের মুখে কমলালেবু।

প্রভাস আন্দাজ করে, হেম ঘোষের বৌ হয়ে রেবা নিশ্চয়ই খুব সুখী নয়। তাহলে রেবা প্রভাসকে একেবারে হাটা করবে না।

ভেবেচিন্তে প্রভাস আজ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। একটা কিছু হোক। হয়ে যাক।

গানের সময়ে আজকাল ঘরের লোকজন তাড়িয়ে দরজা দিয়ে জানলার পর্দা টেনে-টুনে দিয়ে বসে রেবা। সেটাও কি একটা ইঙ্গিত নয়? কোন বোকা এসব ইঙ্গিত ধরতে না পারে?

খুব সাহস হল প্রভাসের। আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল।

একটু ঝুঁকে প্রভাস হঠাৎ রেবার ঝুলন্ত হাতখানা খপাৎ করে চেপে ধরে ডেকে উঠল—রেবা!

জানলার পর্দার ওপাশে অভয়পদ একটা অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা শ্বাস

ছেড়ে বেশ জোরে বলে উঠল—আগেই বলেছি কিনা মা, যে মেয়ে সিগারেট খায়, তার চরিত্র ভাল হতে পারে না! এসে দেখে যাও এখন স্বচক্ষে।

ঘরের ভিতরে প্রভাস তখন ছিটকে নেমে পড়েছে চৌকি থেকে। টর্চ জেলে তাড়াহুড়ো করে চটি খুঁজছে। মনের ভুল। ঘাবড়ে গিয়ে ভুলে গেছে যে, চটি দরজার বাইরে ছেড়ে আসে রোজ।

রেবা সাদা মুখে প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল—কী করলেন বলুন তো প্রভাসদা! এখন এ বাড়িতে কি আর থাকা যাবে! কত কষ্টে বাপের বাড়ির কাছে এই বাসা খুঁজে বের করেছি। এখন যদি ছাড়তে হয় তবে ও ঠিক আবার ওদের সংসারে নিয়ে গিয়ে তুলবে।

প্রভাস দরজার কপাট হাতড়ে ছিটকিনি খুঁজছে তাড়াতাড়ি।

রেবা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—এ বাসায় কত সস্তায় ছিলাম জানেন! এ অঞ্চলে পঁচিশ টাকায় ঘর আর পাওয়া যাবে? বাড়িউলি মানুষটা কত ভাল ছিল। ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কি করলেন বলুন তো!

প্রভাস ছিটকনি খুলে চটি খোঁজার জন্য আর ঝামেলা করল না। দুই লাফে উঠোন পেরিয়ে খালি পায়ে রাস্তায় নেমেই একটা রিকশায় উঠে পড়ল। বলল—জোরে চালাও ভাই।

রেবা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে সজল চোখে তাকিয়ে থাকল একটু। তারপর কেঁদে ফেলল। ইস্, অভয়দা দেখে ফেলেছে। এখন ঠিক বাড়ি-ছাড়া করবে তাদের।

উঠোনের ওপাশের অন্ধকার থেকে কালিদাসীর গলা আসছিল—তোরই বা উঁকি মারতে যাওয়ার কি দরকার! ওসব লোক ওরকমই হয় বাবু। তুই নিজের কাজে যা।

—যাচ্ছি।

—গুণ্টুটাকে ডেকে দিস তো। দুপুর থেকে ছেলের টিকি নেই।

রেবার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল—মাসীমা, আমাদের বাসা ছাড়তে বলবেন না। আমি গানের মাস্টারকে ছাড়িয়ে দেবো।

কিন্তু তা আর বলা হল না। সিঁড়িতে শব্দ করে কালিদাসী উঠে গেল।

গুম হয়ে বসে রইল রেবা। এ বাড়িতে যে কত সুবিধে! খুব সস্তায় কালিদাসীর কাছ থেকে ঘুঁটে কেনে রেবা। আড়াইটাকা সের দরে খাঁটি গরুর দুধ কেনে।

প্রভাসের জন্য সব গেল।

॥ ছয় ॥

নাটমন্দিরের নিচে নেমে এসে কানাই মাস্টার হাজার জোড়া জুতোর মধ্যে নিজের জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। জায়গাটা একটু অন্ধকার মতোও বটে।

হেম ঘোষ নেমে এসে বলল—কী খুঁজছেন মাস্টারমশাই, জুতো? বলে ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ধরল।

কানাই জুতো খুঁজে পেয়ে হেম ঘোষকে বলল—যাবেন নাকি বাজারের দিকে?

একা চলাফেরা করতে আজ কানাইয়ের ঠিক সাহস হচ্ছে না। মারাটা বড় খারাপ হয়েছে মদনকে। একবার যাবে চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে, ফাঁকমতো।

হেম ঘোষ উদাস গলায় বলে—সকালেই বাজার করেছি। তা আমার আর কাজ কি, চলুন বরং বাজার থেকে ঘুরেই আসি একটু। বাজার জায়গাটা ভাল।

হেমের মনে একটা পোকা কামড়াচ্ছে তখন থেকে। একা ঘরে রেবা আর গানের মাস্টার। চোখে চোখে কথা হচ্ছে না তো! কিংবা হারমোনিয়ামের রীডে একজনের আঙুলে অন্যজনের আঙুলে ছোঁয়া লাগে যদি! এর চেয়ে নিজেদের সংসারে বেশ ছিল। দশ জোড়া পাহারা দেওয়ার চোখ ছিল সেখানে। কাঁকড়াবিছের কথাও ভাবে হেম ঘোষ। ওষুধটা চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

মনের কথা মনে রেখে দুজনে অন্য সব কথা বলতে বলতে বাজারপানে যেতে থাকে।

॥ সাত ॥

কালিদাসী ডাক শুনে বারান্দায় এসে দেখে উঠোনে জামাই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে বৌ আর দুটো মেয়ে।

কালিদাসী শ্বাস ছাড়ে। জামাই আসবে জানাই ছিল। গুণ্টুকে বুঝি এবার নিয়ে যায়।

—এসো। বলে নীরস গলায় ডাকে কালিদাসী।

ওরা উঠে আসে।

জামাই প্রণাম করতে করতেই বলে—গুণ্টুকে নিয়ে যেতে এলাম মা। অনেকদিন হয়ে গেল। আপনারও কষ্ট বুড়োবয়সে।

কালিদাসী মন্দার মাকে মিষ্টি আনতে পাঠায়। তারপর গম্ভীরমুখে এসে সামনে বসে। বলে—যার ধন সে তো নেবেই। ঠেকাবো কোন আইনে। এই বুঝি মেয়ে দুটি? বেশ মিষ্টি হয়েছে দেখতে। আর এ আমার নতুন মেয়েটিও বেশ।

এ সবই মুখের ভদ্রতা। বুকটা ভিতরে ভিতরে জ্বলে যায়। কাঁকড়াবিছে কোন ফাঁকে পাঁজর কেটে বুকের ভিতর সেঁধিয়েছে। এ হুলের বড় জ্বালা।

খানিকক্ষণ বসে গল্পগাছা করে ওরা চলে গেল। কাল সকালে গুণ্টুকে নিতে আসবে।

কালিদাসী একটা চাদর গায়ে নিচে নেমে এসে ডাকল—রেবা। ও রেবা!

রেবা শুয়ে ছিল বিছানায়। ডাক শুনে হুডমুড় করে উঠে পড়ল। এই বুঝি বাড়ি ছাড়বার কথা বলতে এসেছে!

কিন্তু না। কালিদাসী বলল—আমাকে একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে যেতে হবে। মন্দার মা বাড়ি গেল, তা তুমি যদি একটু সঙ্গে চলো মা। আমার তো চোখে ভাল ঠাহর হয় না রাতবিরেতে।

—যাচ্ছি মাসীমা। বলে রেবা তক্ষুনি চটি পায়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে অবশ্য জিভ কাটল রেবা। চটিজোড়া তার নয়, প্রভাসের। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় বুঝতে পারে নি। এখন আর কিছু করার নেই।

রেবা বলল—মাসীমা, আমার কি দোষ বলুন। লোকটা যে ওরকম তা কি জানতাম!

কালিদাসীর বুকভরা তখন গুণ্টুর চিন্তা। বলল—সে জানি বাছা। আজকালকার লোক বড় ভাল নয়। সাবধানে থাকবে।

রেবা কালিদাসীকে ধরে খুব যত্নে কাঁচা ড্রেনটা পার করাল। মনে মনে বলল—চক্কোত্তিমশাই, দেখো বুড়ি যেন আমাদের না তাড়ায়।

॥ আট ॥

গুণ্টুকে নিয়ে রেলগাড়ি হাওড়া ছেড়েছে অনেকক্ষণ। জানলার ধারে বসে সে এখন বাইরে গ্রাম আর ক্ষেত দেখছে। গা ঘেঁষে ছোটো বোন দুটি বসে। মা

একটু তফাত থেকে মাঝে মাঝে মুগ্ধচোখে তার মুখের দিকে চাইছে। আর বার বার জিজ্ঞেস করছে, খিদে পেয়েছে বাবা তোমার? কিছু দিই? সন্দেশ আছে, রসগোল্লা, লুচি। কত এনেছি ত্যাখো! বাবা একবার কানে কানে জিজ্ঞেস করেছিল—মাকে তোর পছন্দ হয়েছে তো গুণ্টু?

গুণ্টু ঘাড় নাড়ল। বেশ মা। বোন তুটিও বড ভাল। এ রকম মা বোন তার ছিল না তো এতদিন! দিদিমা বড কেঁদেছে ভুঁয়ে পড়ে। মামা স্টেশন পর্যন্ত শুকনো মুখে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসে নি। মনটা বড় খারাপ লাগে। আবার ভাবে, নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে না জানি কত ফুর্তি হবে! কত খেলা!

॥ নয় ॥

দিন ফুরোয়। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। কানাই মাস্টার টিউশনিতে বেরোলো। হেম আজ গেল রেবাকে নিয়ে সিনেমায়। অভয়পদ পরোটা খেয়ে পুজো কমিটির মিটিং-এ যাওয়ার সময় বলে গেল—মা, যাই। কালিদাসী শুনতে পেল না, সে তখন গোয়ালঘরে গরু তুটোর সঙ্গে রাজ্যের কথা ফেঁদে বসেছে।

দিনটা গেল, যেমন যায়।

হারানো জিনিস

নস্যির কৌটোটা কোথায় যে রাখলেন সুধন্য, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। নাক দিয়ে জল আসছে, সুড়সুড় করছে, ভারী অস্বস্তি। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গাতেই খুঁজেছেন। দু-একবার মিনমিন করে বৌ হেমন্তবালাকেও জিজ্ঞেস করেছেন, জবাব পাওয়া যায় নি। হেমন্তবালা রেগে আছেন, ছোট মেয়ে বুঁচি পুরনো তেঁতুলের শেষ একটা ডেলাও চুরি করে নিয়ে গেছে। পুরনো তেঁতুলের একটা মাখা করতে গিয়ে হেমন্তবালা ডেলাটুকু বের করে ধনেপাতা, গুড়, লঙ্কা সব গুছিয়ে রেখেছিলেন। পুরনো তেঁতুলের এই মাখাটা তাঁর বড় প্রিয়। সবই পড়ে আছে। ধনেপাতা, লঙ্কা, গুড, কেবল তেঁতুলটুকুই নেই। একটু আগে ফ্রকের কোঁচড় ভরে মুড়ি নিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে ঐ হতচ্ছাড়া মেয়েটা। ওরই কাজ। সেই থেকে হেমন্তবালা কারও কথার উত্তর দিচ্ছেন না।

সুধন্যও তেমন সাহস পাচ্ছেন না বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করতে। যৌবনকালটা এই নস্যি নিয়ে বড অশান্তি গেছে।

ফুলশয্যার রাতে বৌয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের প্রাক্কালে সুধন্য একটিপ প্রচণ্ড নস্যি নিয়ে স্নায়ু ঠিক রাখার চেষ্টা করেছিলেন। নতুন বৌ হেমন্তবালা প্রথম কাছে এসে খুব অবাক হয়ে বলল, তুমি নস্যি নাও?

লজ্জিত সুধন্য বললেন, নিই মাঝে মাঝে।

—এ মা গো। নোংরা জিনিস। সিগারেট খেতে পার না?

সুধন্য নিভে গিয়েছিলেন। নতুন বৌ নস্যি ঘেন্না পায়, কিন্তু তিনি করেন কি! ইস্কুলের নিচু ক্লাস থেকে নেশা—ছাড়ানোও যায় না।

তবু নতুন বৌয়ের ঘেন্না দেখে বিয়ের পর পর নস্যি ছেড়ে সিগারেট ধরেন। কিন্তু তাতে চোখে জল আসে, গলা খুসখুস্ করে। নেশা আসে না। উপরন্তু নস্যির অভাবে সারাদিন নাকে জল আসে, হাঁচি আসে, মাথাটা ঘোলাটে লাগে। এক টিপ নস্যির জন্য প্রাণ আনচান করে।

হেমন্তবালা বলতেন, নস্যি নেওয়া পুরুষ বড় বিশ্রী।

সুধন্যর বিশ্রী হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তবু পুরুষকার দিয়ে নস্যির ওপর জয়ী হওয়া যায় নি। তাঁর অবস্থা দেখে অবশেষে তাঁর মা তাকে ডেকে বলেন, বাবা,

নস্যি না নিলে তুই কি বাঁচবি ? সারাদিন তোর মুখচোখ কেমনধারা জলেডোবা মানুষের মতো দেখায় যে ! নতুন বৌ রাগ করে তো করুক, মেয়েরা বড় ট্যাটন হয়। ওসব মন বুঝে অত চলতে নেই। পেয়ে বসবে। তুই পুরুষ, পুরুষের মতো হ। নস্যি ধর্ আবার, নইলে শরীর পাত হয়ে যাবে। নেশা কি সহজে ছাড়া যায় ?

মায়ের আদেশে সুধন্য আবার নস্যি ধরেন। নস্যি ধরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বটে, কিন্তু হেমন্তবালা এক সপ্তাহ কথা বললেন না। তারপর যখন কথা বললেন সেই কথাও আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা লাভা ছাড়া কিছু নয়। তবু সুধন্য যেমন নস্যি ছাড়তে পারলেন না, তেমনি হেমন্তবালাও স্বামীকে ছাড়তে পারলেন না। তবে নস্যি তাদের বিবাহিত জীবনের একটা স্থায়ী অশান্তির কারণ হয়ে রইল। পরে হেমন্তবালা সুধন্যর নস্যির ন্যাকড়াও কেচে দিয়েছেন, তবু এই বুড়ো বয়সেও সুধন্যকে নস্যির জন্য কথা শুনতে হয়। রাগ হলে হেমন্তবালা এখনও সুধন্যর নস্যির কৌটো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। কতবার নতুন ডিবে কিনতে হয়েছে।

আজ সকালেও নস্যি নিয়েছেন বেশ কয়েকবার। আজকাল কিছু বেশী নেন। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর পেয়েছেন, হাতে কাজ নেই, ফালতু দিন, ফালতু সব সময়। এত ছুটি কাটাবেন কি করে তাই ভাবতে ভাবতে টিপের পর টিপ নস্যি নিয়ে নেন। হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলে—কপালে নস্যি জমে নাকি মানুষ মরে যায় !

সুধন্য ভাবেন—তা হবে। সিগারেট, তামাকপাতায় ক্যানসার হয়। মদে লিভার সিউরোসিস হয়। আফিং খেলেও কিছু না কিছু হয়। নেশা করলে ওসব তো আছেই।

নস্যির কৌটোটা খুঁজে না পেয়ে খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। বিছানার তোশক উল্টে দেখলেন, খাটের তলা খুঁজলেন, তাকটাকগুলো সবই খুঁজলেন। কোথাও নেই। একটা জীবন ধরে নিজের একটু বাড়ি করতে পেরেছেন তিনি। মফঃস্বল শহর বলে জমির দাম বেশী লাগে নি, চুন সুরকির গাঁথুনি দেওয়ার খরচ কমই হয়েছে। দু'খানা মাত্র ঘর, মাঝখানে একটু উঠোন ওধারে রান্না আর স্নান ইত্যাদির ঘর। কিছুই না। তবু খুব কষ্ট গেছে এটুকু করতেই। দেওয়াল ওঠে তো ছাদ হয় না, ছাদ হল তো পলেস্তারা বাকি থাকল, সেটা করলেন তো বারান্দা সিমেণ্ট করা বাকি থাকল। সে একটা লড়াই গেছে। লড়াই যখন শেষ হয়েছে তখন বয়সও শেষ। বাড়ি ভোগ করার বাকি আর অল্প দিনই। তবু

একটু তৃপ্তি, শেষ তো হল। সারা জীবনে 'নিজের বাড়ি' বলে বলার মত কিছু তো হল।

অন্যমনস্কভাবে ডিবেটা খুঁজতে খুঁজতে বাইরের দিককার ঘরটায় এলেন। জোড়া বিছানায় বুঁচি আর তার দিদি শেফালী শোয়। দুটোই মেয়ে সুধন্যর। বেশী বয়সে বেশ পর পর দুটো মেয়ে হল। বিয়ে দেওয়ার সময় পাওয়া যাবে কি? বড মেয়ে শেফালীর বিশ বছর বয়স চলছে, বুঁচির মোটে বারো। শেফালীর জন্য তোডজোড করতে হয়। হাত খালি বলে তেমন উৎসাহ পান না। মেয়ে তেমন সুন্দর নয়, যদিও খুবই আদরের।

এ ঘরটায় পড়ার টেবিল রয়েছে কেরোসিন কাঠের। সস্তা আলনা, বইয়ের র‍্যাক। এসো-জন বোসো-জনের জন্য কয়েকখানা টিনের চেয়ার। তাতে শেফালী আর হেমন্তবালার নিজেদের হাতের কাজ করা সব ঢাকনা। দেয়ালে রবি ঠাকুর আর বালগোপালের ছবি। পড়ার টেবিলের ওপর একটা সস্তা ট্র্যানজিস্টার রেডিও, নেভানো হারিকেন, ছড়ানো বইপত্র। সবই হাতড়ে দেখেছেন সুধন্য, তবু আর একবার দেখলেন। হারিকেনের তলায় নস্যির ডিবে থাকার কথা নয়। তবু সন্দেহ থাকে কেন ভেবে সুধন্য হারিকেনের তলাও দেখলেন।

নাকটা সুড়সুড় করছে, জল আসছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশী কালের নেশা। নস্যি না হলে পাগল-পাগল লাগে।

দেয়ালের পেরেকে একটা লাল ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলছে। শেফালীর। আজকাল গরীবের মেয়েদেরও এ সব থাকে—ভ্যানিটি ব্যাগ, লিপস্টিক, ঘড়ি। তাঁর মেয়েরও আছে। একটা জীবন ধরে ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট অফিসের কেরানী ছিলেন, বুড়ো বয়সে রিটায়ারমেণ্টের আগে কিছুদিনের জন্য বড়বাবু হয়েছিলেন। কিন্তু নিজেরই পুরনো অফিসের বড়বাবু হওয়ায় পুরনো সহকর্মীরা তেমন মান-সম্মান করত না, মানতও না খুব একটা। তবু বড়বাবু হয়েছিলেন। কিন্তু গা থেকে গরীব-গরীব গন্ধটা আর গেল না। নস্যির গুঁড়োর মত লেগে রইল গায়ে। কিন্তু মেয়ে-বৌকে কষ্ট দেন নি তেমন। যথাসাধ্য অভাব মিটিয়ে গেছেন। যতদিন মা বেঁচেছিলেন ততদিন মাকেও সুখেই রেখেছেন। ধকল যা কিছু নিজের ওপর দিয়ে গেছে।

সেটেলমেণ্ট অফিসের লোকদের কিছু উপরি আয় থাকে। সে তেমন কিছু নয়। সুধন্যরও ছিল। এ বাড়ির গাঁথুনিতে সবই গাঁথা হয়ে গেছে। হাতে তেমন কিছু নেই।

ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ডিবেটার যাওয়ার কথা নয়। তবু তিনি শেফালীর ব্যাগটা পেরেক থেকে নামিয়ে আনলেন। কিন্তু খুলতে পারছিলেন না। এ সময়-টায় শেফালী তার কোন বান্ধবীর বাড়িতে পড়া বুঝতে যায়। পার্ট টু পরীক্ষা দিচ্ছে এবার। ধারে কাছে কেউ নেই। ব্যাগটার মুখ এমন হাঁসকল দিয়ে লাগানো যে নানা রকম টিপ আর চাপ দিয়েও অনেকক্ষণ খুলতে পারলেন না।

তারপর হড়াক করে টান দিতেই সহজে খুলে গেল। ভিতরে বেশী কিছু নেই। কয়েকটা খুচরো পয়সা, লিপস্টিক আর ক্ষুদে গোল আয়না, কলেজের মাইনের রসিদ বই, পেন, ভুরু আঁকার পেনসিল, একজোড়া গগলস। ডিবেটা নেই। কলেজের মাইনের রসিদ-বইটার ভিতর থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বেরিয়ে আছে।

আজকাল সময় কাটে না। তাই চিঠিটা দেখে খুশী হলেন সুধন্য। মেয়ে চিঠিপত্র পাচ্ছে তাহলে! দেখতে ভাল নয় মেয়েটা, চিঠি পাওয়াটা সুলক্ষণ। ছেলেটা যদি জাতের হয় তো বরং উৎসাহই দেবেন।

চিঠিটা খুলে চশমা এঁটে দেখে একটু হতাশ হলেন। প্রেমপত্র নয়। আবার নয়ও বলা যায় না। অমল নামে একটা ছেলের চিঠি। সে পলাশী ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছে। সেখান থেকে পলাশীর জন্য মন-কেমন-করা চিঠিতে নানা জনের খবর জানতে চেয়েছে। কেষ্টনগর কলেজে একসঙ্গে পড়ত বোধ হয় একসময়ে। চিঠির শেষে 'ভালবাসা'র বদলে 'প্রীতি ও শুভেচ্ছা' জানিয়েছে। নীরস চিঠি। বানান ভুলও অনেক চোখে পড়ে। বাঙাল ছেলে বোধ হয়। 'বাড়ি' বানান 'বারি' লিখেছে।

যথাস্থানে চিঠিটা রেখে দিলেন। ডিবেটা পাওয়া গেল না। কোথায় যে নিজেই রাখলেন, বা হেমন্তবালা ফেলে দিলেন—তা বোঝা যাচ্ছে না। আবার নতুন ডিবে আর নস্যি কিনতে বাজার পর্যন্ত ধাওয়া করা বড় ঝামেলার ব্যাপার।

পলাশীতে বাড়ি করাটাই কি ভুল হয়েছিল? এ অঞ্চলটা আসল পলাশী নয়, এর নাম মীরাবাজার, আসল পলাশী অনেকটা দূর, সেখানে চিনিকল হয়েছে, আশেপাশে আখের চাষ হয়। সিরাজদ্দৌল্লার যুদ্ধক্ষেত্র এখন মাঠ জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। সে আমবাগানও নেই। তবু পলাশী নামটা বড় বেশী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কিন্তু স্টেশনের কাছে এই মীরাবাজারও সেই আদ্যিকালে পড়ে আছে। কলকাতা চার ঘণ্টার পথ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে। কেষ্টনগর না গেলে ভাল জিনিস পাওয়া মুশকিল। কলেজও কেষ্টনগরে। সেখানেই চাকরি করতেন সুধন্য। ত্রিশ টাকায় ঘর ভাড়া করে থাকতেন। তারপর বন্ধু সুধীর বাঁড়ুজ্যের

পাল্লায় পড়ে মীরাবাজারে বাড়ির জন্য জমি কিনলেন। কোনো মানে হয় না। কতগুলো টাকা বাড়িটায় আটকে রইল। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিল আরও কখানা ঘর তুলে ভাড়া দিতে। সেটা করেন নি ভালই করেছেন। কারণ ভাড়া নেওয়ার লোক জুটত না। মীরাবাজারে কে আর থাকতে আসবে? তাই ভাবেন বাড়িটা করাই ভুল হয়েছিল। ত্রিশ টাকা করে বছরে তিনশ ষাট টাকা টেনে গেলেও হাতের পাতের কিছু থাকত, শেফালীর বিয়েটা দিতে পারতেন; বুঁচিরও একটা গতি হত।

বুঁচি কোথায় খেলতে গিয়েছিল। সারাদিনই পাড়া বেড়ায়, ঘেমো শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে দৌড়ে ঘরে এল। বিছানার তোশক থেকে একটা ন্যাকড়ার পুতুল বের করে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, হেমন্তবালা তক্কে ছিলেন, উঠে এসে ডাকলেন—বুঁচি?

বুঁচি দৌড়।

হেমন্তবালার হাতে একটা বেলনা। সেইটে বাগিয়ে নিয়ে তিনিও দৌড়ে বেরোলেন।

—বুঁচি-ই!

সুধন্যর সময় কাটে না।

তিনিও দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। খুবই চমৎকার দৌড় হচ্ছে। বুঁচি হরিণের মত দৌড়োয় বটে, কিন্তু হেমন্তবালাও যে এ বয়সে এত জোর ছুটতে পারেন তা সুধন্যর জানা ছিল না।

সামনেই একটু মাঠ মত, তারপর রাস্তা। বুঁচি রাস্তায় উঠে গিয়েও রেহাই পায় নি। হেমন্তবালা শাড়ি সামলে চমৎকার দ্রুতবেগে বুঁচির চার হাতের মধ্যে চলে গেছেন।

বুঁচি একবার পিছু ফিরে চেয়ে এত অবাক যে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি? একেবারে এক চুলের জন্য বেঁচে গেল। 'উ মা গো!' বলে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে বুঁচি দৌড়ে নাগালের বাইরে চলে গেল।

হেমন্তবালা কদমগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছেন।

কষ্ট হয় সুধন্যর।

হেমন্তবালা করুণ স্বরে চেঁচিয়ে বললেন, বুঁচি!

বুঁচি দূরে দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাসে।

হেমন্তবালা প্রায় কান্নার মত স্বরে বলেন, বুঁচি রে, তোর ধর্ম কি এই বলে? অ্যাঁ? তোর ধর্ম তোকে এই বলে?

কি করুণ আবেদন ! শুনে সুধন্যরও মায়া হয়।

কিন্তু হেমন্তবালার গলার স্বর হঠাৎ বদলে গেল। হাতের বেলনাটা তুলে পুলিসের মত আস্ফালন করে চিৎকারে পাড়া মাৎ করে কর্কশ স্বরে বলতে থাকেন, আসিস আজকে। ভাতের পাতে ছাই বেছে দেব। খাবি না বুঁচি, আঁ্যা ? খেতে আসবি না ? তখন দেখিস।

এই বলে হেমন্তবালা ফিরে আসছিলেন।

এ সময়টায় মুখোমুখি হওয়া ভাল নয়। অভিজ্ঞতাবলে সুধন্য জানেন, মেয়েদের ওপর রাগ করলে হেমন্তবালা বরাবর আবার সুধন্যর ওপরেও অকারণে চটে যান।

সুধন্য ঘরের পিছনদিকে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন একটু।

হেমন্তবালা যখন উঠোন পার হয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছেন, তখনই সুধন্য দেখলেন চোর একটা বেড়াল দুটো খয়রা মাছ মুখে নিয়ে জবা গাছটার তলায় গিয়ে বসল। সুধন্য বড় ব্যথিত হলেন। সপ্তাহে তিনদিন মাছ হয়। একপো খয়রা মাছ কিনতে আজ তাঁকে দুটো টাকা নগদ দিতে হয়েছে। তার দুটো ঐ গেল বেড়ালের পেটে।

বেড়ালটাকে তেড়ে গেলেন না সুধন্য। গিয়ে লাভ কি ? বেড়ালের মুখের মাছ তো হেমন্তবালা আর হেঁশেলে তুলবে না, খাচ্ছে খাক।

হেমন্তবালার চিৎকার শোনা গেল একটু বাদেই, চোখের পলকে দু-দুটো মাছ হাওয়া হয়ে গেল। বুঁচির বাপ কি একটু চোখে-চোখেও রাখতে পারে না বাড়িঘর, না কি ! কোথায় গেল লোকটা, আঁ্যা ?

নস্যির ডিবেটা এখনও পাওয়া যায় নি। সুধন্যর খুব অস্বস্তি হচ্ছে। বুঁচিটা বাড়ি ফিরলে ওর মায়ের হাতে আজ খুব পেটান খাবে।

দুপুরের কলকাতা যাওয়ার ট্রেনটা এসে স্টেশনে ঢুকল। সামনের মাঠ ভেঙে দুজন ধুতিপরা লোক গাড়ি ধরতে দৌড়োচ্ছে। চমৎকার দৌড়, কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন সুধন্য। পাবে কি ? না, পাবে। স্টেশনের হাতায় প্রায় পৌঁছে গেছে। ঘণ্টি বাজল, গার্ড হুইশ্‌ল্ দিল, ইঞ্জিন কু দিল, সব নিয়ম মাফিক। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন, ঠিক একইভাবে ট্রেন ছাড়ে। লোক দুটোর একজন সিগন্যালের তারে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে গেল। সুধন্য হাঁ করে চেয়ে আছেন।

শেফালীর গলা পেলেন—বাবা !

উত্তর দিলেন না, দেখছেন। না, পেয়ে গেল। ঐ প্রথম লোকটা উঠে

পড়েছে কামরায়। উঠে হাত ঝুলিয়ে দ্বিতীয় লোকটাকে চলন্ত গাড়িতে তুলে নিল টেনে।

বাঁচা গেল।

—বাবা! হাঁ করে দেখছ কি?

—উঁ!

মনটা ভাল নেই, কেন যে বুঁচিটা তেঁতুল চুরি করতে গেল! আজ দুপুরে খাওয়ার সময়ে ফিরে এলে খুব মার খাবে মেয়েটা। ছোট মেয়েটা যতই দামাল দুষ্টু হোক, ওর কান্না শুনলে সুধন্যর বুকটা কেমন করে যেন। ওটার ওপর তাঁর বড্ড মায়া। ছোট মেয়েটা।

—কি দেখছিলে? শেফালী জিজ্ঞেস করে ফের।

—দুটো লোক দৌড়ে ট্রেন ধরল, তাই দেখলাম। আজকাল আর দেখার আছেটা কি? যা চোখে পড়ে দেখি।

শেফালী এমনিতে শান্ত মেয়ে। কিন্তু খুব জেদী। রাগীও। তাছাড়া বাপকে বাপ বলে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। বেশী আদর দিলে যা হয়। যারা আদর দেয় তাদের ওজন কমে যায় এদের কাছে।

শেফালী বিরক্ত হয়ে বলল—শোন, আমাদের বায়োসায়েন্স থেকে মহারাষ্ট্রে পাঠাচ্ছে স্পেসিমেন কালেকশনে। প্রায় কুড়িজনের টিম যাবে।

—ও।

—কলেজ একটা গ্র্যাণ্ট দিচ্ছে, যাতায়াতের ভাড়া ওরাই দেবে। থাকা-খাওয়ার খরচ আমাদের। পার হেড দেড়শ টাকার মতো লাগবে।

—ও।

—আমাকে সিলেক্ট করেছে।

সুধন্য চুপ করে থাকেন, শোনেন হেমন্তবালা বেড়ালের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছেন, সেই সঙ্গে বুঁচি আর সুধন্যকেও।

—টাকাটা দেবে বাবা?

—টাকা!

—টাকা মোটে দেড়শ। আচ্ছা, না হয় তুমি আরও কম দিও। একশতেই আমি চালিয়ে নেব। একটা জায়গায় ঘোরাও হবে।

সুধন্য শ্বাস ফেলেন। দেবেন বৈ কি! না দিয়ে যাবেন কোথায়! বরাবর দিয়ে আসছেন।

বুঁচিটা বড্ড মার খাবে আজ। বেড়ালটা দুটো মাছ নিয়ে গেল, মোট পাঁচটার

মধ্যে ছুটো। শেফালী একশ টাকার ধাক্কায় ফেলে দিল। বাড়িটায় কত টাকা আটকে আছে। ছেলেও নেই যে ভোগ করবে। কি লম্বা ছুটি চলছে রে বাবা!

নস্যির ডিবেটা কখন কি ভাবে হাতে এসে গেল কে জানে! ঠিক ম্যাজিসিয়ানের মতো, কোথাও কিছু না, হঠাৎ হাতে চেয়ে দেখেন, নস্যির ডিবেটা হাসছে।

বড় খুশী হন সুধন্য। ভগবান মঙ্গলময়। সুধন্য পৃথিবী ভুলে নস্যির ডিবের মুখে টোকা মারেন। খুব জোর একটা টিপ নেবেন।

লড়াই

পালান আমাদের ক্ষেতে কাজ করে।

সে ভাল লোক কি মন্দ লোক তা বোঝা খুব মুশকিল। তবে সে জানে খুব ভাল মাঞ্জা দিতে, মাছের এক নম্বর চার তৈরি করতে, কাঠ-মিস্ত্রীর কাজও তার বেশ জানা, আর পারে গভীর ভাঙা গলায় গেঁয়ো গান গাইতে।

পালান গাছের নারকোল চুরি করে বেচে দিয়ে আসে। নিশুতরাতে পুকুরে জাল ফেলে মাছ তুলে নিয়ে যায়, ক্ষেতের ফসল চুরি করে। কিন্তু ধরা পড়লেই দোষ স্বীকার করে পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। অনেক কাজের কাজী বলে আর তার হাসিটি বড় নির্দোষ আর সরল বলে দাদু তাকে তাড়ায় না।

আমাদের দিশি কুকুরটার নাম ঘেউ। ভারী তেজী কুকুর। মেজো কাকা যখন বিয়ে করে কাকীমাকে ঘরে আনলেন—বেশীদিনের কথা নয়—তখন কাকীমার বড়লোক বাপের বাড়ি থেকে যেমন হাজার রকমের দামী জিনিস দিয়েছিল তেমনি আবার দুটো প্রাণীও দিয়েছিল সঙ্গে। এক প্রাণী হল এক যুবতী ঝি, তার নাম অধরা, অন্য প্রাণীটি হল ঘেউ।

ঘেউয়ের রঙ সাদা, চেহারা বিশাল আর চোখ রক্তবর্ণ। সে আসবার পর থেকে এ বাড়িতে বাইরের লোক আসা প্রায় বন্ধ। ঘেউ ডাকে কম কিন্তু কামড়ায় বেশী। সে আসার পর থেকে এ বাড়িতে অন্য বাড়ির ছেলেরা আসে না, অন্যের কুকুর-গরু আসা বন্ধ। হাঁসমুর্গী পর্যন্ত ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

মেজোকাকীমা বড় সুন্দরী। হাঁটু পর্যন্ত এক ঢাল চুল, দুধে-আলতায় গায়ের রঙ; রূপকথার রাজকন্যের মতো চেহারা। তিনি আস্তে হাঁটেন, কম কথা বলেন, দুটো বড় বড় চোখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে চারধার দেখেন। জেঠিমা, মা, বড়-কাকীমা যখন উদয়াস্ত সংসারের কাজ করছেন তখন মেজোকাকীমা শুয়ে বসে বই পড়ে সময় কাটান। তাঁর ছাড়া কাপড় অধরা কেচে মেলে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়, আলতা পরিয়ে দেয়। সবাই গোপনে বলে নতুন বৌ কারো বশ মানবে না।

তা হোক, তবু মেজোকাকীমাকে আমাদের বড় পছন্দ। তাঁর কাছে জিনিস কেনার পয়সা চাইলেই পাই। শিশুদের তিনি বড় ভালবাসেন। প্রায়ই মিষ্টি কিনে এনে আমাদের খাওয়ান।

আমার দাদুর অনেক পয়সা। লোকে তাকে বিরাট ধনী বলে জানে। কিন্তু বড়লোকদের মতো চালচলন দাদুর নয়। যেটুকু সময় ওকালতি করেন সেটুকু বাদ দিলে অন্য সময়ে তার হেঁটো ধুতি, খালি গা—আর হাতে হয় দা নয়তো কোদাল কিংবা বেড়া বাঁধবার বাঁখারির গোছা। দাদু কখনো বিশ্রাম করতে ভালবাসেন না। বলেন, বিশ্রাম এক ধরনের মৃত্যু। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টা ঘুমোবে। বাকী সময়টায় কাজ করবে।

পালান আর ঘেউ দাদুর ছায়া হয়ে ঘোরে। বাড়িতে ধোপা বা নাপিত এলে ঘেউ তাদের তাড়া করবেই। তখন দাদু বা পালান তাকে ধমক দিলে তবেই ক্ষান্ত হয়। অন্য কারো ধমককে সে গ্রাহ্য করে না, এমন কি মেজোকাকীমা বা অধরার ধমককেও নয়। তাই মেজোকাকীমা একদিন রাগ করে অধরাকে বললেন বাপের বাড়িতে থাকতে ঘেউ আমার কত বাধ্য ছিল। এখন বেয়াড়া হয়েছে। অধরা, ওকে এখন থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবি।

মেজোকাকা কাকীমাকে বড় ভয় পেতেন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে প্রায়ই চোখে চোখে তাকাতে পারতেন না। কাকীমা তাঁকে শেকল কেনার কথা বলতে কাকা খুব মজবুত বিলেতি শেকল কিনে এনে দিলেন। ঘেউ বাঁধা পড়ল।

দাদু এসব টেরও পান নি। পরদিন বাগানে গিয়ে গাছপালার পরিচর্যার সময়ে একটু অবাক হয়ে চারপাশ দেখে বললেন, কুকুরটা কই রে ?

পালান বলে, বাঁধা আছে দেখেছি।

—বাঁধা ? কে বাঁধল ?

—ঐ খোঁচড় ঝিটাই বোধ হয়।

দাদু ডাকলেন, ঘেউ ! কোথায় রে তুই ?

মেজোকাকার ঘরের পেছনের বারান্দা থেকে এখন ঘেউয়ের করুণ আর্তনাদ আর শিকলের ঠুনঠুন শব্দ ভেসে এল। আর কী ভীষণ যে দাপাদাপি করতে লাগল সে। মেজোকাকীমা কঠিন স্বরে ঘেউকে বললেন, বেত খাবে এরপর।

ঘেউ চুপ করল।

দাদু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমরা আলায়-বালায় ঘুরি, অতশত খেয়াল করি না। তবু টের পেলাম, বাড়ির হাওয়ায় একটা থমথমে ভুতুড়ে ভাব।

সেবার পুজোর কিছু আগে মেজোকাকীমার বাপের বাড়ি থেকে তত্ত্ব এল। সে তত্ত্ব দেখে লোকে তাজ্জব। বিশাল বিশাল পেতলের পরাতে থরে-বিথরে

সাজানো সব জিনিস। খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, গয়নাগাঁটি পর্যন্ত। কম করে পনেরোজন লোক বয়ে এনেছে, সঙ্গে আবার বল্লমধারী পাঁচজন পাইক।

সে তত্ত্ব দেখতে বিস্তর লোক জমা হয়েছিল। ঘেউ বাঁধা আছে বলে লোকে তখন আসতে সাহস পায়।

জীবজন্তু বা পোকামাকড় মারা দাদু খুব অপছন্দ করতেন। এমন কি সাপ পর্যন্ত মারা নিষেধ ছিল। আমাদের বাড়িতে বহুকাল ধরে একজোড়া গোখরো ঘুরে বেড়ায়। বাস্তুসাপ বলে তাদের আমরা খুব একটা ভয় পেতাম না। তারা যেখানে সেখানে বিড়ে পাকিয়ে পড়ে থাকে। কখনো রোদ পোহায়, হাততালি দিলে চলে যায় ধীরেসুস্থে।

এই সাপ দুটোকে ভয় পেতেন কাকীমা। মাঝে মাঝে রাগারাগি করে বলতেন, সাপকে কোন বিশ্বাস আছে ? এক্ষুনি এদের মেরে ফেলা দরকার।

তাঁর সে কথায় কেউ কান দেয় নি। এমন কি মেজোকাকাও না। সবাই বিশ্বাস করত, সাপ দুটো এ বাড়ির পরম মঙ্গল করছে।

মেজোকাকীমার বাপের বাড়ির তত্ত্ব এসেছিল ঠিক দুপুরবেলায়, পুরুষমানুষ কেউ তখন বাড়িতে নেই। তত্ত্ববাহক লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বাড়ির মেয়েরা মহা ব্যস্ত।

সেই সময়ে মেজোকাকীমা পাইকদের ডেকে বললেন, দুটো গোখরো সাপ আছে ও-বাড়িতে। একটু আগেও উঠোনের পশ্চিম ধারে তুলসীঝাড়ের তলাকার গর্তে ঢুকতে দেখেছি ওদের। ও দুটোকে খুঁজে বের করে মেরে ফেল।

পাইকরা মহা বাধ্যের লোক। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসোঁটা আর বল্লম বাগিয়ে উঠে পড়ল।

এক পাইক তুলসীঝাড়ের তলাকার গর্তে শাবল চালিয়ে মুখ বড় করে ফেলল। ভিতর থেকে ফোঁসফোঁসানির শব্দ আসছিল। ঠিক সেই সময়ে দৃশ্যটা দেখে বারান্দা থেকে ঘেউ বুকফাটা চিৎকার করে দাপাদাপি শুরু করল। তার দুই চোখ লাল, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে, শিকলটা প্রায় সে ছেঁড়ে আর কি !

মেজোকাকীমা একটা লম্বা বেত নিয়ে এসে সপাটে কয়েক ঘা বসালেন ঘেউয়ের পিঠে। ঘেউ সে মার গ্রাহ্য করল না। উল্টে শিকল প্রায় ছিঁড়ে মেজোকাকীমাকে কামড়াতে গেল।

পুকুরে নেমে পানা পরিষ্কার করছিল পালান। ঘেউয়ের চিৎকারে কি যেন বুঝতে পেরে উঠে এসে উঠোনে দাঁড়াল। বিশাল কালো চেহারা তার, কালো কাঁধে তখনও সবুজ কচুরিপানা লেগে আছে।

অবাক হয়ে সে তুলসীঝাড়ের কাছে পাইকদের কাণ্ড দেখে হঠাৎ দু হাত তুলে ধেয়ে আসতে আসতে বলল, সর্বনাশ। সর্বনাশ!

মেজোকাকীমা তখন রাগে আগুন। পাইকদের চেঁচিয়ে বললেন, এ লোকটা মহা চোর। এটাকে ঠাণ্ডা করো তো। তারপর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও বাড়ি থেকে।

পালান একবার ঘুরে তাকাল মেজোকাকীমার দিকে। মনে হল, এক রাগী দৈত্য তাকিয়ে আছে সুন্দরী রাজকন্যার দিকে।

পরমুহূর্তেই পালান লকড়ির ঘরে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড লাঠি হাতে বেরিয়ে লাফিয়ে উঠোনে নামল।

ততক্ষণে অবশ্য পাইকরা একটা গোখরো সাপকে বল্লমে বিঁধে মেরে ফেলেছে। উঠোনে সাপটাকে শুইয়ে তারা অবাক হয়ে সাপটার বিশাল দৈর্ঘ্য দেখছিল। দুজন পাইক ওদিকে শাবল আর বল্লমের খোঁচায় দ্বিতীয় সাপটাকেও জখম করে ফেলেছে।

এ সময়ে পালানের লাঠি তাদের একজনের কাঁধে পড়তেই লোকটা 'বাপ' বলে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে। অন্য পাইকরা মুহূর্তের মধ্যে সজাগ হয়ে যে যার অস্ত্র হাতে নেয়।

তারপরই উঠোন জুড়ে এক বিশাল লড়াই বেধে যায়। একদিকে পালান একা, অন্যদিকে পাঁচজন পাইক সমেত পনেরোজন জোয়ান।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভীতু মেয়ে কমললতা গিয়ে হঠাৎ খুব সাহস করে ঘেউয়ের গলার বকলশ থেকে শেকলের হুকটা খুলে দিল। ঘেউয়ের সাদা শরীরটা আলোর ঝলকানির মত উঠোনে ছুটে গেল।

সারা পাড়া জুড়ে বিশাল হাঙ্গামার গোলমাল ছড়িয়ে পড়ল। ভিড়ে ভিড়াক্কার। আমরা ছোটরা সেই ভিড়ের পিছনে পড়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু বিকট গালাগাল আর চেঁচানি শুনতে পাচ্ছিলাম।

সব লড়াই-ই একসময়ে থামে। এটাও থামল। দেখি, ভিড়ের ভেতর চ্যাংদোলা করে পালানকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছে কিছু পাড়ার লোক। তার পেটে বুকে বল্লমের ফুটো, মাথা রক্তের টুপি পরে আছে। ঘেউ মাটিতে পড়ে করুণ আর্তনাদ করছিল। অনেক চেষ্টাতেও সে কোমর আলগা করে দাঁড়াতে পারছিল না।

মানুষ কি ভাবে যুদ্ধে জিতবে তার কোনও নিয়ম নেই। অনেক সময়ে মানুষ যুদ্ধে জিতেও হারে, আবার কখনও হেরেও জিতে যায়।

এই ঘটনার দু মাস বাদে দেখা যেত, পালান আবার ক্ষেতের কাজে নেমেছে। তবে আগের মত অতটা দৌড়ঝাঁপ গাছবাওয়া পারে না। ধীরেসুস্থে টুকটুক করে কাজ করে বেড়ায়, দাদুর সঙ্গে ছায়া হয়ে লেগে থাকে।

ঘেউও আগের মত নেই। তার একটা ঠ্যাং সব সময় উঁচু হয়ে থাকে। তিন ঠ্যাঙে সে নেংচে নেংচে ঘোরে দাদুর সঙ্গে।

দাদু নির্বিকার। সেই হেঁটো ধুতি, খালি গা আর হাতে সব সময়ে গৃহকর্মের নানা সরঞ্জাম।

মেজোকাকীমা তখন ঘোমটা টেনে খুব লজ্জা-বৌয়ের মত নানা কাজকর্ম করে বেড়ায়। জেঠিমা, মা, কাকীমাদের সঙ্গে একসঙ্গেই খায়, গল্প করে, হাসেও।

এখন অধরার বড় কাজ বেড়েছে। সামনে অগ্রহায়ণে পালানের সঙ্গে তার বিয়ে, পালানকে সেই জন্য দাদু একটু জমি দিয়েছেন ঘর বাঁধতে, তাতে অবসর সময়ে ঝুড়ি দিয়ে মাটি ফেলতে হয় অধরাকে। ভিত করে তারপর বাঁশবাঁখারি টিন দিয়ে ঘর উঠবে। বড খাটুনি। মেজোকাকীমা তাকে যখন-তখন ডাকলে সে একটু বিরক্ত হয়ে বলে, বাবা রে বাবা, সব সময়ে তোমাদের কাজে মাথা দিলেই চলবে! আমার নিজের বুঝি কাজ নেই?

মশা

রক্ত খেয়ে মশাটা টুপটুপে হয়ে আছে। ধামা পেটটা নিয়ে মশারির দেয়ালে বসে আছে ঐ। এইবেলা টিপে দিলে ফচাক করে খানিক কাঁচা রক্ত ছিটকে গলে যাবে শালা।

নফরচন্দ্র জীবনে মশা মেরেছে অনেক, আর মানুষ মেরেছে একটা। মানুষটার কথা এখন আর মনে পড়ে না। অল্প বয়স ছিল তখন। সময়ের তফাতে ভুল পড়ে গেছে। তবে মশাদের কথা যদি কেউ শুনতে চায়, তবে ঢের কথা শোনাতে পারে নফরচন্দ্র। একটা জীবন মশা মেরেই তো গেল। তার বৌ চারু পর্যন্ত মরবার আগে তার কোনো গুণের কথা না বলুক এটা জোর গলায় বলে গেছে—পারোও বাপু তুমি মশা মারতে।

তা পারে নফরচন্দ্র। যত মশা তত মারার আনন্দ।

লোমের মতো সরু হাত-পাওলা মশাটা কি পরিমাণ রক্ত টেনেছে দেখ! পেটটা একটা ধানের মতো বড় দেখাচ্ছে। ঐ হাতে পায়ে আর ফিনফিনে পাখনায় এত বড় পেটটা নিয়ে ওড়াউড়ি করবে কেমন করে? বড় তাজ্জব লাগে নফরচন্দ্রের। শালারা নিজেদের শরীরের চেয়ে ঢের বেশী ওজনের রক্ত খায়। আখেরের খাওয়া। দু হাতের পাতা দুদিকে চড়ের মতো তুলে নফরচন্দ্র আস্তে করে মশাটার দিকে এগোয়। ভরাপেটে মশার চালাকি খাটে না। টলতে টলতে একটু-আধটু নড়েচড়ে ঠিকই, কিন্তু বেশী দূরের দৌড় নয়। নফর জানে।

ঘরের আলোটা কিছু কমজোরী। নাকি বয়সে চোখের দৃষ্টিতেই ভাঁটা পড়েছে? কিছু একটা হবে। চোখের সামনে বিন্দু বিন্দু কি সব ভেসে বেড়ায় আজকাল নোংরার মতো। সেই বিন্দুগুলোকেও প্রথম প্রথম মশা বলে ভুল করত সে।

দুহাতে ফটাস করে তালি বাজাল। কিন্তু রক্ত ছিটকালো না। মশাটা সটকেছে।

নফরচন্দ্র নিজের হাতের দিকে চায়। আঙুলের জোড়ে জোড়ে গিঁট পড়ার মতো ভাব। বুড়ো চামড়ায় ফুঁচি পড়েছে। বিনা কারণে আঙুলগুলো ত্যাড়াব্যাঁকা হয়ে যাচ্ছে ইদানীং। এসবই কি হওয়ার কথা ছিল?

বিছানায় হাঁটু গেড়ে বসে নফর ময়লা মশারির চারদিকে তাকিয়ে রক্তচোষাটাকে খোঁজে। আছে খুব কাছেপিঠেই, বেশী ওড়াউড়ি করার মতো ক্ষমতা নেই। এক্ষুনি বসবে কোথাও। কিন্তু চড়টা ফসকাল—সেটাই ভাবনার কথা। এতকাল মশা মারতে কদাচিৎ ফসকেছে নফর।

বাড়ি নিঝুম হয়ে গেছে খানিক আগে। নফর টের পেয়েছে, তার ছেলে গণেশ আজ খেয়ে উঠে আঁচাতে অনেক সময় নিল। একবার যেন বৌয়ের কাছে খড়কেও চেয়েছিল। কিন্তু খড়কে দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করার মতো খাওয়া-দাওয়া তো ছিল না আজ! নফরকে সন্ধের মুখে গণেশের বৌ মুলো দিয়ে রান্না মটরের ডাল, বাসি বাঁকাকপির ঘণ্ট, আর ট্যাংরার চচ্চড়ি খাইয়ে দিয়েছে। সে খাওয়ায় খড়কে লাগে না। নফরের আজকাল সন্দেহ হয়, তাকে ফাঁকি দিয়ে গণেশ আর গণেশের বৌ গোপনে দু-চারটে বাড়তি পদ খায়। নফরচন্দ্র খেয়ে আসার পর বেশ খানিক বাদে একটা মাংস রান্নার বাস খুব মাৎ করেছিল পাড়া। নফর ভেবেছিল রায়েদের বাড়ি রান্না হচ্ছে। তা নয় তবে।

গণেশের বৌ চন্দ্রিমা বেশ মোটাসোটা আহ্লাদী চেহারার মেয়ে। রকম-সকম খানিকটা পোষা বেড়ালের মতো। দাঁত নখ লুকিয়ে রেখে চোখ বুজে ন্যাকা ন্যাকা ভাব করে বটে, তবে দরকারের সময় লুকোনো অস্ত্র বের করে আনে।

তা মোটা গিন্নি খায় ভাল। সারাদিনই খাচ্ছে। কচর-মচর খানিক চানাচুর চিবোলো, টাউ টাউ করে বাটিভর তেঁতুল-পান্তা মারল, দুধের সরটা আঙুলে আলতো তুলে মুখে ফেলে দিল, এক কোষ আচার চাটল হয়তো। তার ওপর হোটেল রেস্টুরেন্টে গিয়ে গণেশের ট্যাঁক ফাঁক করা তো আছেই। আজকাল নফরকে ফাঁকি দিয়ে বাড়তি পদ খাওয়া শুরু হয়েছে।

নফরচন্দ্র মশাটা আর খুঁজে পেল না। ভরাভর্তি পেট নিয়ে শালা যাবে আর কোথায়! কিন্তু নফরের তেমন ইচ্ছেও করল না বেশী খুঁজতে। সেই কোন্ সন্ধেবেলা চাট্টি লেইভাত খেয়েছিল, এখন খিদের চোটে পেটের মধ্যে হাঁড়ি-কলসি ভাঙছে। রায়বাড়ির মুরগী রাত-বিরেতে বেলা ভুল করে ডেকে ওঠে। আজও ডাকছে ঐ।

নফরচন্দ্রের ঘুম আসে না। ঘুম এলেই আজকাল একটা ফালতু লোক এসে বড় ঝামেলা করে। সেই কবে কোন্ ছোকরা বয়সে রাগের মাথায় কী করে ফেলেছিল তারই জের টানতে মেলা ঝামেলা বাধায় এসে লোকটা।

নফরের তেমন দোষ ছিল না। তখন দেশের গাঁ কালীগঞ্জে থাকত।

আকালের বছর। চারদিকে চোর ছ্যাঁচড়ার বড উৎপাত। লক্ষ্মীঠাকুরুণের মত এক মা ছিল নফরের, রোগাভোগা খিদে-পাওয়া মানুষ দোর-গোড়ায় এলে প্রায় সময়েই পাত পেড়ে খাওয়াতো। এক দুপুরে তেমনি পেট টান করে খেয়ে একটা মাঝবয়েসী লোক যাওয়ার সময় একটা কাঁসার বাটি আর দুটো ধুতি মেরে চলে গেল। ঘটনার হপ্তাখানেক বাদে কালীগঞ্জের খাল ধরে নৌকো বেয়ে নফর যখন মাছ ধরতে বড গাঙের দিকে যাচ্ছিল তখনই শ্মশানের ঘাটে লোকটাকে বসে থাকতে দেখে। পাশে পুঁটুলি। চোরটাকে দেখে নফর বেদিশা হয়ে নৌকো ভিড়িয়ে লগির একখানা ঘা লাগিয়েছিল জোর। লোকটা হাত তুলল না, চেঁচাল না ঘা খেয়ে যেন বড ঘুম পেয়েছে এমন ভাব করে শুয়ে পড়ল। কেউ সাক্ষী ছিল না। নফর নৌকোয় কেটে পডল তৎক্ষণাৎ। পরদিন হাটে বাজারে কিছু কথাবার্তা শুনল লোকের মুখে। শ্মশানের ঘাটে একটা লোক মরে পডে আছে। তা কে আর একটা মড়া নিয়ে মাথা ঘামায়। তখন কত মরছে চারদিকে!

ভেবে দেখলে, খুনের জন্যে তো মারতে যায় নি নফর। চোরের সাজা দিতে গিয়েছিল। কত মাথা ফাটাফাটি করেও লোকে বেঁচে থাকে। কিন্তু সেই কমজোরী লোকটা যে ফুলের গায়ে মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা তা কে জানত! নফরের মন মেজাজ কয়েকদিন বিগড়ে রইল ঠিকই, কিন্তু নিজেকে তেমন দোষ দিতে পারল না।

বহুকাল হয়ে গেছে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার বৃত্তান্ত। লোকটাকে ভাল মনেও নেই তার। মাথাটা ন্যাড়া ছিল, সেটা বেশ মনে পড়ে। গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা ছিল মনে হয়। খালি গা ছিল, পরনে একটা হাফুচ ময়লা কাপড়। একদম ফালতু লোক। দুনিয়াতে ওরকম দু-চারটে লোক না থাকলে কেউ টেরও পাবে না। পায়ও নি। লোকটার জন্য থানা পুলিশ হয় নি, কান্নাকাটি হয় নি।

কিন্তু মুশকিল হল তখন মাঝে মাঝে লোকটা এসে নফরচন্দ্রকে ঘুম থেকে তুলে বলে—ন্যাড়া মাথা বলেই বড্ড লেগেছিল হে।

নফর বিরক্ত হয়ে বলে—তাহলে পাগড়ি পরে থাকলেই পারতে।

লোকটা বলে—হুঁঃ, তখন জামা জোটে না তো পাগড়ি। তা তুমি লগি চালাবে জানলে পাগড়িই পরতাম। ন্যাড়া মাথাটায় বড্ড লেগেছিল হে।

—ন্যাড়া হয়েছিলে কেন মরতে?

—সে আর এক কেচ্ছা। মজিলপুরে এক মুদির দোকান থেকে এক থাবা বাতাসা চুরি করেছিলাম বলে তারা মাথা কামিয়ে দিলে, ঘোলের বড্ড দাম বলে ঘোল ঢালে নি। কিন্তু কোমরে দড়ি-বেঁধে গাঁয়ে ঘুরিয়েছিল।

নফরচন্দ্র বলে—তাহলে তোমারই দোষ বলো।

—তাছাড়া আর কার? আমার মাথায় খুব ঝুপসি চুল ছিল তখন। মাথাটা একটা বোঝার মতো দেখাতো। তার উপর লগির ঘা পড়লে বোধহয় তেমন লাগত না। ন্যাড়া মাথা বলে লেগেছিল। না খেয়ে খেয়ে তখন শরীরটা তো মরেই আসছিল। ব্যথাটা সইল না।

—আমার তবে দোষ কি বলো।

—দূর ছাই, তোমার দোষ কে দিচ্ছে? এতকাল পরে সে-সব তুচ্ছ কথা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আসি বলে ভাবো নাকি? তুমি না মারলেও মরণ আমার লেখাই ছিল। আমি তা বুঝতে পেরে কাজ এগিয়ে রাখতে শ্মশানের ধারে গিয়ে বসে থাকতাম।

—তাহলে আমাকে দোষী করছ না তো! ঠিক করে বলো বাপু ন্যায্য কথা।

—আরে না। তবে বলি বাপু, তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা হয়। সেই যে মেরেছিলে তারও তো একটা দেনা আছে।

—দেনা! বলে আঁৎকে ওঠে নফর। বলে—এর মধ্যে আবার দেনা-পাওনার কথা ওঠে কোত্থেকে?

—ওঠে। যখনই আমাকে মারলে তুমি তখনই তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক হল তো।

—সে আবার কি রকম?

লোকটা মিটিমিটি হেসে বলে—হয়। সে এমন সম্পর্ক যে এক জন্মে আর কাটান ছাড়ান নেই। সেই সম্পর্কের জোরেই তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা হয়।

—পাওনা হলেই বা দিই কোত্থেকে। সংসারের অবস্থা তো দেখছ। ঐ গণেশটা আমার একমাত্র অন্ধের নড়ি। কোথায় যেন যন্ত্র চালায়। আয় ভালই, কিন্তু বুড়ো বাপকে দেয় কি? সব ঐ মোটা গিন্নির শরীরের আহ্লাদে খরচ হচ্ছে। তার ওপর মাগী আবার বাঁজা। একটা নাতকুড় হলেও আমার একটা সুখ ছিল। সেও হল না। সংসারের সব আদর মোটা গিন্নি নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে।

লোকটা বলে—সে আমি শুনব কেন বলো! আমার পাওনা আমাকে মিটিয়ে দেবে, তবে অন্য সব কথা।

বলে লোকটা চলে যায়।

জেগে গিয়ে নফরচন্দ্র মশার পুন্-ন্-ন্ শুনতে পেয়ে উঠে বসে। কোথা দিয়ে যে মশারির মধ্যে ঢোকে শালারা। মশা মারবার জন্য বাতি জ্বালতে গিয়ে নফরের ভুল ভাঙে। ও হরি! এ যে বেহান হয়ে গেল! কাক ডাকতে লেগেছে।

ছেলের সঙ্গে এই ভোররাতেই একবার চোখের দেখা হয়। গণেশ বারান্দায় ঘুরে ঘুরে দাঁতন করে এ সময়টায়। চোখাচোখি হলেও কোনো কথা হয় না। কথার আছেটা কি? গণেশ তার সব কথা বরাবর মাকে বলে এসেছে। এখন বৌকে বলে বোধহয়। বাপের সঙ্গে কোনোদিনই তেমন বাক্যালাপ করে না। আজও ভোর রাতে বারান্দায় দেখা হল। কলঘর থেকে ঘুরে এসে নফর বলল—আমার মশারিটা বড্ড ছিঁড়ে গেছে। একটা কিনে দিবি?

—দেবোখন। এ মাসটা জোড়াতাড়া দিয়ে চালিয়ে নাও।

গণেশ ছেলে খারাপ না। বৌটা খচ্চড়।

না কি বৌটাও খারাপ না, সে নিজেই খচ্চড! কোনটা যে কি তা বলা মুশকিল। গণেশের মা চারু বরাবর বলে এসেছে, নফরচন্দ্রের মতো এমন শয়তান নাকি দুটো হয় না। কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ভেবে দেখবার মতো কথা।

আহ্লাদী বৌ যখন উঠে হালুয়ার কড়াই বসিয়েছে তখন গণেশের স্নান সারা। ভাজা সুজিতে জল পড়ল ছ্যাকাৎ করে। রায়বাড়ির মুর্গী ডাকছে। চড়াই পাখির ডানার শব্দ কানের পাশ দিয়ে সড়াৎ করে চলে যায়। গণেশ রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে খেতে চাইল। মোটা গিন্নি বলল—দিচ্ছি।

নফরকেও দেবে। তবে সে একটুখানি। বাসী রুটি গণেশ ছখানা খায়, মোটা গিন্নি কখানা তা নফর জানে না। তবে তার ভাগ্যে দুখানা। চাইলে বলে—আর তো নেই!

ডাক্তারেরও নাকি বারণ আছে। কিন্তু নফর তার শরীরের গতিক কিছু বোঝে না। বেশ আছে। তবে কাল রাতে একটা পেটমোটা মশা তার হাত ফসকে পালিয়েছে, সেটা ভাববার কথা।

বৌ মরে বড় জ্বালাতন হয়েছে। চারু মুখ করত বটে কিন্তু সে কাছে থাকতে নফরের হাতে মশা ফসকাত না। আর ন্যাড়ামাথার সেই পাওনাদারটাও কাছে ঘেঁষে নি কোনোদিন।

সূর্যটা তার ন্যাড়ামাথা নিয়ে ভুস করে উঠে পড়ল ওই। গণেশ বেরিয়ে গেলে মোটা গিন্নি আবার গিয়ে বিছানা নেবে। ঝি আসে অনেক বেলায়। বড় ফাঁকা লাগে নফরের। গণেশের যদি একটা ছানা হত!

মশারি চালি করে বিছানা গুটিয়ে বসে থাকে নফর। দুটো রুটি গরম হালুয়ার সঙ্গে পেটের মধ্যে বেড়াতে গেছে। গণেশ কাজে বেরোল। মোটা গিন্নি একটা মস্ত হাই তুলে বিছানা নিল পাশের ঘরে।

পুবের জানালা দিয়ে একটা বেঁটে দেয়াল দেখা যায়। দেয়ালের ওপর তারকাঁটার তিনটে লাইন। তার ফাঁকে একটা ন্যাড়ামাথার মতো সূয্যি ঠাকুর। পাখি ডাকে।

চারু খুব জপ করত এসময়। জপের মালা রেলগাড়ির চাকার মতো বনবন করে ঘুরে যেত। সংসারের কাজকর্ম শুরু করবার আগে বরাদ্দ জপ এগিয়ে রাখত যতটা পারে। নফরের সে-সবও নেই। খামোখা বসে অং বং জপের চেয়ে অন্য কথা ভাবলে কাজ হয়।

একসময় চাষবাস করত, পরের দিকে একটা দোকানে আধাআধি বখরায় ব্যবসা করত। সে খোঁড়া ব্যবসাতে রোজ দু-পাঁচ টাকা আয় হত। অধৈর্য হয়ে একদিন দোকানের কিছু মাল সরিয়ে কেটে পড়ল। আবার হয়তো অন্য কারবারে হাত দিল একদিন। জীবনটা ফেরেববাজিতে গেছে। গণেশ কম বয়সে যেই চাকরিতে ঢুকল অমনি নফরচন্দ্র হাত ধুয়ে ঘরে থিতু হল। আর কাজ কারবারে যায় নি। গেলে আজ দুটো পয়সা নাড়াচাড়া করতে পারত। তার বদলে নফরের অন্য সব ব্যাপারে মাথা খুলতে লাগল বেশী। চমৎকার মশা মারত, বাগান করত, কয়লা ভাঙত, পান সাজত, বসে থাকলে কত বাতিক হয় মানুষের।

মোটা গিন্নি ঘুমোলে নফর চুপিচুপি উঠে রান্নাঘরে আসে। ঝি এখনো আসে নি। গত রাতের এঁটোকাঁটা পড়ে আছে। উঁকিঝুঁকি দিয়ে নফর দেখে মাংসের হাড়টাড় পড়ে আছে ডাঁই হয়ে। কম গেলে নি দুজনে। হাড়গোড়ের পরিমাণ দেখলে তাজ্জব মানতে হয়। একটা লুচির টুকরোও দেখা যাচ্ছে। তবে কাল রাতে লুচিও ভেজেছিল।

শ্বাস ফেলে নফর ঘরে আসে, ঘর পেরিয়ে একদম সদরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। উদ্দোম পৃথিবী চারদিকে ছড়ানো। একবার ইচ্ছে হয়, যায় চলে যেদিকে দুচোখ যায়। লুচি-মাংসের ব্যাপারটা আজ বড় দাগা দিয়েছে তাকে। কিছুদূর খামোখা ঘোরাঘুরি করে ফিরে আসে নফর। বিবাগী হয়ে যেতে এ বয়সে বড় ভয় করে। কাল রাতে একটা মশা ফসকে গেল। ন্যাড়া মাথার লোকটা রোজ আসছে আজকাল।

ঘরে ফিরে এসে নফর মোটা গিন্নির বকুনি খেল একচোট। আহ্লাদী বৌ বলল—কী আক্কেল আপনার বলুন তো, সদর দরজা হাট খোলা রেখে বেড়াতে

বেরিয়েছেন, কে না কে ঢুকে যে সব ফর্সা করে নিয়ে যেত। এক ডাঁই কাঁসার বাসন পড়ে আছে, আরো কত দামী জিনিস। এই তো সেদিন চুরি গেল এক কাঁড়ি।

বড় দুঃখ হল নফরের। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেই বুঝি ভাল ছিল।

চারু মরে যাওয়ার পর পরই নফর একটা বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছিল। খড়কাটা কলের মালিক হরেকৃষ্ণ পালের একটা হাবাগোবা বোন আছে। তার বয়স অনেক। হাঁ করে চেয়ে থাকে, মুখ থেকে অবিরল নাল ঝরে। ওরিয়েন্ট সেলুনের নরহরি নফরের চুল ছাঁটতে ছাঁটতে একদিন বলেছিল—নফরবাবু, শ পাঁচেক টাকা জোগাড় করতে পারেন তো বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারি।

হাবাগোবা যাই হোক একটা বৌ তো হত। টাকাটাই বখেরা বাধালে। তা-ও চেষ্টা করেছিল। ঘরের কিছু জিনিসপত্র হাতছিপ্প্ করে বাজারে বিক্রি করে কিছু পয়সা পেল। মোটা গিন্নির সোনার জিনিস কিছু হাতাতে পারলে হত। কিন্তু সে আর হয়নি, ঘরের জিনিস কিছু খোয়া যাওয়াতে চন্দ্রিমা এমন হৈ-হুল্লোড বাধালে যে নফর আর কিছু সরাতে সাহস করল না। তার ওপর কানাঘুষোয় তার বিয়ের ব্যাপারটাও গণেশের কানে এসে পৌঁছেছিল। কী লজ্জা! আজকাল পাড়ার ছেলেরা তাকে রাস্তায় দেখলে উলু দেয়।

তবে সেই চুরি করে বিক্রির কিছু টাকা এখনো নফরের তোষকের তলায় লুকোনো আছে। সবসুদ্ধ্ গোটা ত্রিশ। মাঝে মাঝে লুকিয়ে টাকাগুলো ছুঁয়ে আরাম পায় নফর। পৃথিবীতে মানুষ আপন না টাকা আপন তা এখনো সে স্থির করতে পারে না।

আজও সন্ধে পার করেই মোটা গিন্নি তাকে বসিয়ে দিল। এটা আদর নয়, এ হচ্ছে সাবধান হওয়া। নফর খেয়ে বিছানা নিলেই ভালমন্দ রাঁধবে। খাবে দুজনে।

নফর কিছু বলল না। সেই ভাত আজ আর মুখে রুচছিল না তেমন। প্রাণটা লুচি-লুচি করে, মাংস-মাংস করে। তবু ভাতের দলা কোঁৎ কোঁৎ করে চালান দিয়ে ঘরে এসে জাগতে বসে নফর। আজ জেগে থেকে কাণ্ডটা দেখবে।

দেখল। পাড়া মাৎ করে আজ সর্ষে ইলিশ রান্না হচ্ছে। গণেশ একটা চ্যাঙাড়ি হাতে ঘরে ফিরল আজ। পেটের ভিতরটায় খিদের সৈঁতলান দিয়ে মুখে জল এসে গেল নফরের। একটু রাত করে ওরা বসেছে। ভারী হাসি-ঠাট্টা হচ্ছে দুজনে। নফরের মশারির মধ্যে পনপন করে মশা ঢুকছে।

ওরা শুতে চলে গেল। নফর শুয়ে জেগে রইল একা। মশা কামড়াচ্ছে।

কামড়াক। ন্যাড়া মাথার লোকটাও মশারির মধ্যে সেঁধিয়ে এসে বলে—এলাম বুঝলে! দেনা পাওনার কথাটা মিটিয়ে নিই।

তোষকের যে ধারে টাকাটা আছে সে ধারটার একটু চেপে শুয়ে নফর বলে—রোজ তোমার এক কথা।

—বড় অনাদর করেছিলে যে। মেরে ফেললে।

—সে অত ধরলে হয় না।

—ধরছে কে? ধরলে তোমার ফাঁসী হয়।

—তবে?

—বলছি কি, যে জায়গায় মেরেছিলে সে জায়গায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। এখনো জায়গাটা ব্যথা করে বড়।

—সত্যি?

—মাইরি। সে শরীরের ব্যথা নয়, অনাদরের ব্যথা। দেবে নাকি একটু হাত বুলিয়ে?

নফরের চোখে জল আসে। উঠে বসে বলে—দেখি।

মাথাটা এগিয়ে লোকটা দেখিয়ে দেয়—এইখানে।

—দেখেছি। ফুলে আছে। বড্ড লেগেছিল, না?

—তা লেগেছিল। তবে তোমার আর দোষ কি?

—দাঁড়াও, হাত বুলিয়ে দিই। বলে নফর হাত বোলাতে থাকে ফোলা জায়গাটায়। নাঃ, এভাবে মারা ঠিক হয় নি।

—আঃ। ব্যথাটা সেরে যাচ্ছে হে নফর। লোকটা বলে।

নফর তার কানে কানে বলল—লুকোনো ত্রিশটা টাকা আছে আমার। কাল চলো দুজনে দোকানে বসে খুব লুচি মাংস খাই। খাবে?

—খুব খাবো। লোকটা বলে।

শুনে নফরচন্দ্র অনেকদিন বাদে পাশ ফিরে আজ নিশ্চিন্তে ঘুমোলো।

একটা হুলো বেড়াল

চুষিদের বাড়িতে কোনো বেড়াল ছিল না। তবে বেড়ালদের আনাগোনা ছিল। সেসব চোর আর ছোঁচা বেড়ালদের কথা আর বলবার নয়। যতবার মেরে তাড়াও—লজ্জা নেই—আবার আসবে। দেয়ালে বাইরে। জানালায় উঁকিঝুঁকি দেবে। মিহি স্বরে ভারী বিনয়ী ডাক ডাকবে। এমন কি শীতের লেপকাঁথা রোদে দিলে তাতে গিয়ে গোল্লা পাকিয়ে শুয়ে রোদ পোয়াবে। খড়ম, ঝাঁটা, ঠ্যাঙার বাড়ি কি খায় নি তারা ? ফাঁক পেলে মাছ নিয়ে গেছে, দুধে মুখ দিয়েছে, নোংরা পায়ের ছাপ ফেলে গেছে বিছানার সাদা চাদরে।

বেড়ালের আরো নোংরা কাণ্ডমাণ্ড আছে। সেসবের জন্য হয় রামু জমাদারকে ডাকতে হয়, নয়তো আলাদা পয়সা দিলে পান্তি ঝি পরিষ্কার করে দেয়।

একটা ভারী বদ হুলো বেড়াল আছে সে কারো তোয়াক্কা করে না। কুঁদো চেহারা, কপাল আর পিঠে খাবলা খাবলা লোম উঠে গেছে অন্য সব বেড়ালদের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করে। হুলোটার চলন খুব ধীর স্থির, তাড়া করলে দৌড়ে পালায় না, ধীরে সুস্থে অনিচ্ছের সঙ্গে যেন দয়া করে সরে যায়।

চুষির কাকা বিয়ে করবার পর বাড়ির পিছনের বারান্দাটায় দেয়াল তুলে একধারে একটা ঘর হল, বাকিটা হয়ে গেল দরদালান। চুষিদের তাতে খুব আনন্দ। চুষি আর কুসি দুই বোন মিলে তাড়াতাড়ি দরদালানের একধারে পুতুলের ঘর সাজাল। কিন্তু সত্যি বলতে কি পুতুল খেলার বয়স এখন আর চুষির নেই। কুসি ছোটো, সে-ই পুতুল খেলে। মাঝে মাঝে চুষির যখন পড়তে ভাল লাগে না, কিংবা যখন ছুটির দুপুরটা খাঁখাঁ করে, কিংবা মেঘ-বাদলার দিনে ছোটো হতে ইচ্ছে যায় তখন গিয়ে কুসির পুতুলঘরে ভাগ বসায়।

শীতের রাত সন্ধে পার করেই সেদিন নিশুত হয়েছে। মফস্বল গঞ্জের রাস্তাঘাট নির্জন। কুয়াশা জড়ানো ঘুম-ভাবে চারদিকে ঝিমোচ্ছে। বাড়ির দরজা জানালা সব শীতের ভয়ে আঁট করে বন্ধ। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ দরদালানে হুড়ুম-দুড়ুম শব্দ। রান্না সারা। পুরুষরা বাড়ি ফেরে নি বলে তখনো খাওয়া হয় নি। মা বসে ময়দার চষি পাকাচ্ছিল। পান্তি মেঝের পড়ে ঘুম।

মা পান্তিকে ডেকে বলল—দ্যাখ তো। ঘুমচোখে উঠে পান্তি দেখতে গেল। পড়া ফেলে চুষিও। চুষির পিঠোপিঠি ভাই কানু এক হাতে খেলনা পিস্তল, অন্য

হাতে দরজার আলগা বাঠামটা নিয়ে সবার আগে গিয়ে দরজা খুলে চেঁচাল—কোই হ্যায় ?

সবাই জানে এই ভরসন্ধেয় চোর আসে না। তবু তা বলে ভয়টা তো থাকেই।

পান্তি হারিকেন তুলে আলো ফেলতেই চুমি বলল—এঃ মাঃ দেখেছো!

কাণ্ড কাকে বলে! রাংতা এনে কত কষ্টে আজ পুতুলের বিয়ের বাসর সাজিয়েছে! রঙিন কাগজের শিকলি, পিচবোর্ড দিয়ে খাট, বর বৌ সত্যিকারের ফুলছড়ানো বিছানায় শুয়ে। সেই সাজানো বাসর ছয় ছত্রখান করে গুণ্ডা হুলোটা দরদালানের বন্ধ জানালার তাকে উঠে বসে আছে।

কানু চেঁচিয়ে বলল—এ হচ্ছে কে এন সিংয়ের কাজ।

কে এন সিংটা যে কে তা আজও ভাল করে কেউ জানে না। তবে কানু বলে—কে এন সিং হল ভিলেন।

কেউ কিছু গোলমেলে কাণ্ড করলেই কানু চেঁচাবে—এ হল কে এন সিং। একবার বাবাকেও কে এন সিং বলে ফেলেছিল কানু। কারণ, কপিক্ষেত তৈরি করার সময় ভুল করে মায়ের লাগানো একটা দোলনচাঁপা গাছ উপড়ে ফেলে দেয়। মা রাগারাগি করাতে বাবা বলেছিল—ফুলগাছ-টুলগাছ কোন কাজে লাগে! যত সব মেয়েলী ব্যাপার। বাগান হচ্ছে নরম মনের জন্য। ক্ষেত হল শক্ত মনের জিনিস। এই ব্যাখ্যাটা কেউ তেমন মানতে পারে নি। কানু বলে উঠেছিল—কে এন সিং।

বাবা জিজ্ঞেস করল—কে এন সিং কে ?

একজন রাজস্থানী বীর।

—রাজস্থানী বীর ? বাবা ভ্রূ কুঁচকে বলল—রাজস্থান না রাজপুতানা ? রাজস্থানে আবার বীর হয় নাকি, সব তো শুনি ব্যবসা করে।

কানু মরীয়া হয়ে বলে—রাজস্থানী।

বাবা আর কিছু বলে নি। ইতিহাস তো তারও তেমন মনে নেই।

তা হুলোটা কানুর সেই কে এন সিংই বটে। দুধ নয় যে হাঁড়ি ওলটাবি, মাছ নয় যে খাবলা দিবি, পুতুলের ঘরটা তবে ভাঙতে গেলি কোন্ আক্কেলে ? পুতুল খেলার তুই বুঝিস কি রে পাজি ?

কানু বাঠামটা ধরে একলাফে এগিয়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল—কাম অন কে এন সিং, তুমহারা ইজ্জৎ আজ বহুৎ খতড়ে মে হ্যায়। আজ তুমহারা টেংরি টুটেগা বিল্লি কা বচ্চে।

চুষি দৌড়ে গিয়ে পুতুলের ঘরের সামনে বসে বড় বড় চোখে চেয়ে দেখল সব। কান্না পায়! কত কষ্টে সাজিয়েছে। কুসিটা সাঁঝবেলায় ঘুমিয়েছে ভাগ্যিস। কাল সকালে অবস্থা দেখে কাঁদতে বসবে। কানুর হিন্দি শুনে চুষি ধমক দিয়ে বলল—তোমার হিন্দি ছবি দেখা বের করছি কানু। আজই বাবাকে বলব।

—কাম অন কে এন সিং। বলে কানু বাঠামটা যেই জানালার তাকে হুলোটার দিকে বাড়িয়েছে অমনি শুরু হল হুলুস্থুল কাণ্ড। এমনিতে হুলোটা ভয় পায় না, কিন্তু এবারটায় যেন মরীয়া হয়ে এক লাফে নেমে কানুকে এক ধাক্কা দিয়েই দরদালানের দরজায় গিয়ে পড়ল। 'ফু'-অ অ' করে একটা হতাশার শ্বাস ছাড়ল হুলো। দরজা বন্ধ। কানু লাঠি ঠুকতে ঠুকতে তাকে তাড়া করল ফের, বলল—বিল্লি কি বচ্চে, তুম নে ইনসান নহি, স্রিফ বিল্লি কি এক নানহে মুন্নে বচ্চে হো। তুমহারা জিন্দগী মে এক গহেরা দাগ দিখাই যাতি হ্যায়।

হুলোটা তাড়া খেয়ে ফের ছুটে আসে রান্নাঘরের বন্ধ দরজায় আছাড় খেতে। হারিকেন তুলে ধরে পান্তিও তাকে হুড়ো দিতে থাকে—যাঃ গ্যাদড়া মুখপোড়া দূর হ।

কিন্তু হুলোটা যাবেই বা কোথা দিয়ে! যাওয়ার কোনো পথ নেই! চুষিও তখন রাগে রি-রি করা গায়ে উঠে গিয়ে বাবার ছাতাটা হাতে করে নিয়ে এল।

মা ভিতর থেকে ডেকে বলল—দেখিস, ভয় পেয়ে যেন আঁচড়ে কামড়ে না দেয়। মায়েরা জানে অনেক। বাস্তবিক হুলোটা যা ভয় পেয়েছিল সে রাতে!

তিনজন যখন তিন দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে, তখন বারান্দার কোণে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে বসেছে সেটা। দাঁত বার করে ঘ্যাও, ঘ্যাও করে আওয়াজ ছাড়ছে। ল্যাজটা আস্তে আস্তে ঢেউ দিচ্ছে। কানু লাঠি বাড়াতেই সেটাকে একটা থাবা দিল জোর। চোখ জ্বলে উঠল হুলোটার।

চুষি বুঝতে পেরেছিল, কামড়াবে। কানু বোঝে নি। সে আর এক দফা বীরত্ব দেখাতে যেই লাঠি উঠিয়েছে অমনি দেখা গেল হুলোটা বাঘের মতো লাফিয়ে উঠল কানুর গায়ে। একটা থাবা তো দিলই, পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁতও বসিয়ে দিল। কী আক্রোশ তার!

সেই নিয়ে ডাক্তার বদ্যি। মা শুধু এসে বলেছিল—অ্যাখো কাণ্ড, জানালার একটা পাল্লা খুলে দিবি তো! নইলে ও পালাবে কোথা দিয়ে? এই বলে মা জানালা খুলে দিতেই হুলো একলাফে পালাল। বাড়ির পারিবারিক ডাক্তার শুনেন ধরের সঙ্গে বাবার বনিবনা হয় না। কানুকে দেখতে এসে ডাক্তার ধর বললেন—অ্যান্টি টিটেনাস দিতে হবে।

বাবা বললেন—বেড়াল কামড়ালে অ্যান্টি টিটেনাস কেন? আয়োডিন দাও।

—আয়োডিনও দাও। সঙ্গে এ টি এস।

বাবা বললেন—ঘোড়া কামড়ালে এ টি এস দেয়। বেড়ালে কামড়ালে নয়।

ধর কটমট করে তাকিয়ে বললেন—তবে আমি যাচ্ছি—যা খুশি করো।

রাগ করে ডাক্তার ধর চলেই যাচ্ছিলেন, ঠাকুমা এসে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বাবা, বাবা বলে ঠাণ্ডা করে। বাবা শুধু বললেন—বেড়াল যে এত ডেঞ্জারাস হয় জানতাম না।

হুলোর জন্য এত সব কাণ্ড।

একদিন সকালের দিকে পুবের বারান্দায় রোদে বাবা দাড়ি কামাতে বসেছে। কামানোর জন্য গরম জল আনতে গেছে চুষি। কিন্তু রান্নাঘরের উনুনে তখন ভাত ফুটছে। এসময় হাঁড়ি নামালে ভাত প্যাচপ্যাচে হয়ে যায় বলে মা হাঁড়ি নামাতে রাজি নয়। গরমজলের তাই দেরি হচ্ছে। অধৈর্য হয়ে বাবা বলল—ধুত্তোর, আজ দাড়িই কামাবো না। এই বলে ক্ষুর সাবান আয়না নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে কপিক্ষেতের দিক থেকে ফোঁসফোঁস শব্দ এল।

তারপরই বাবার চিৎকার—দেখে যাও সব, দেখে যাও কী ডেঞ্জারাস কাণ্ড হচ্ছে এখানে।

সবাই ছুটে এসে দেখে একটা হাত দেড়েক লম্বা দাঁড়াস সাপের সঙ্গে নিরীহের মতো লালচে রঙের বেড়ালটার লড়াই লেগেছে কপিক্ষেতে। ভারী মজার লড়াই। সাপটা এক একবার বেড়ালটার বুকে পেটে প্যাঁচ মেরে কান কামড়ে ঝুলে থাকে। বেড়ালটা তখন ভেজা বেড়ালের মতো বসে থাকে চুপচাপ। সাপটা অনেকক্ষণ ওরকম থেকে—কাঁহাতক আর বেড়ালের কান কামড়ে থাকা যায়—এই ভেবে প্যাঁচ খুলে নিজের কাজে রওনা হয়। তক্ষুনি বেড়ালটা ভেজা-ভাব ঝেড়ে ফেলে লাফিয়ে গিয়ে সামনের দুই থাবায় সাপটাকে ধরে টেনে আনে। তারপর সেটাকে ফেলে কাতুকুতু দেয়, গলার নলীতে কামড়ে ধরে আঁচড়ে দেয়। সাপটা মহা হাঙ্গামায় পড়ে ওলটপালট খায়, তারপর ফের প্যাঁচ মেরে ধরে। সেই খেলা দেখতে বাইরের লোকও জমে গেল বেড়ার ধারে।

বেড়ার বাইরের লোকজনের মধ্যে চুষি হঠাৎ বাবুদাকে দেখতে পেল। আজকাল কী যে হয়েছে তার! বাবুদাকে দেখলেই কেমন যেন বুকটা ঝাঁৎ করে ওঠে। সারা শরীরে একটা তানপুরার তার পিড়িং করে বাজে। বাবুদা বেশ দেখতে। তার দিকে তাকায় প্রায়ই। চুষি তাকাতে লজ্জা পায়। যদিও ইচ্ছে করে।

কিন্তু সেদিন বেড়াল-সাপের লড়াইয়ের সময় মজাই হল একটা। সবাই যখন লডাই দেখছে তখন চুষির নজরে পড়ল, বাবুদা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। গায়ে কাঁটা দিল চুষির। শিহরণ যাকে বলে। ভারী লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। যতবার চোখ সরিয়ে নেয় ততবারই চোখটা গিয়ে বাবুদার চোখে আটকে যায়। এরকম কয়েকবার হতে হতে চুষি আর চোখ সরানোর হাঙ্গামায় গেল না। চেয়েই রইল।

বাগানে তখন কপিক্ষেতের ভেজা মাটিতে সাপটাকে নখে করে চিরে ফেলেছে বেডালটা।

এই ঘটনার পর বাবা পডল মহা সমস্যায়। বলতে লাগল—আমি জানতাম বেজী আর ময়ূরই সাপের সঙ্গে লডাই করে। কিন্তু বেডালের ব্যাপারটাও বেশ ডেঞ্জারাস দেখছি।

বাবার বন্ধু সুভদ্র তার উত্তরে বলে—তুমি ছুনিয়ার জানোটা কি হে? চিরকাল হম্বিতম্বি করে এলে, শিখলে না কিছুই। বেড়ালের ব্যাপারটা আমি আগে থেকেই জানতাম।

—চালাকি কোরো না সুভদ্র। জানলে এতদিন বলো নি কেন?

—বাঃ সব জানার কথাই এসে তোমাকে বলতে হবে নাকি?

এইভাবে ঝগডা লাগল। তা বাবার সঙ্গে সকলেরই ঝগডা লাগে। রোজ।

কিন্তু বাবা বলতে লাগল—বেডাল তো বেশ উপকারী প্রাণী দেখছি।

শুনে কে যেন বলল—খুবই উপকারী। ইঁদুর মারে।

শুনে বাবা বলল—ইঁদুর? ইঁদুর কোনো প্রবলেমই নয়। প্রবলেম হল সাপ।

এই নিয়ে তার সঙ্গে বাবার একটা মনকষাকষি হয়ে গেল। বাবা কিছুতেই স্বীকার করল না যে, সাপ বিপজ্জনক প্রাণী হলেও গৃহস্থের ঘরে ঢুকে উৎপাত করে না, যতটা করে ইঁদুর।

শীতের ছুপুরে যখন রোদে কাঁসাপেতলের রং ধরে তখন সেই রোদের ওম-এ বসে চারজন লুডো খেলে। ঠাকুমা, মা, চুষি আর পান্তি, কখনো কানু। কাকীমা ছেলে হতে বাপের বাড়ি গেছে, নইলে সেও খেলে। দাতু মারা যাওয়ার পরপরই ঠাকুমা আমিষ, পাড়ওলা শাড়ি আর পান-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর একরাতে স্বপ্ন দেখল, দাতু এসে ঠাকুমার বাঁ হাতের ওপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে বলছে—তুমি যে পান খাও না তাতে আমার বড় কষ্ট হয়। আর কিছু না হোক পানটা অন্তত খেও।

সেই থেকে ঠাকুমা আবার পান খাওয়া ধরল।

মুখে রসস্থ পান থাকলে লুডো খেলবার বড় অসুবিধে। মুখ নিচু করলেই কোন্ ফাঁকে পানের পিক ফুচুক করে বেরিয়ে যায়। ঠাকুমার আবার সামনের দিকের দুটো দাঁত না থাকায় পানের রসে বাঁধ দেওয়ারও উপায় নেই।

ছক্কা চেলে ঠাকুমা তাই ঊর্ধ্বপানে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—কটো ?

কানু বা মা বা চুষি চাল দেখে দেয়। ঘর গুনে গুটিও চেলে দেয়। ঠাকুমা ঘাড় কাৎ করে দেখে। কানু ঠাকুমার গুটি চাললে ঘর চুরি করবেই। মহা চোট্টা।

সেদিন ছুটির দিনের দুপুরে যখন খেলা জমে উঠেছে তখন পান্তি এসে খবর দিল, কাকার ঘরে চৌকির তলায় এক বেড়ালনী মুখে করে করে তার আঁতুড়েছানা এনে রাখছে।

—তাড়াও ! তাড়াও ! বলে চুষি লাফিয়ে উঠেছিল।

পাশের ঘর থেকে বাবা উঠে এসে প্লাস পাওয়ারের চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে বলল—কোথায় বেড়ালছানা দেখি ?

সবাই গিয়ে দেখে। বেড়ালের বাচ্চাগুলো দেখতে কিন্তু বেশ। একেবারে পাউডার পাফ-এর মতো। একটার পেটের তলা দিয়ে আর একটা মুখ বের করে আছে। একটা অন্যটার গা বাইছে। আর মিহি স্বরে 'মিউ-মিউ' করে যাচ্ছে অনবরত। ধাড়ী বেড়ালটা বাচ্চা রেখে পালিয়েছে কোথাও। লোকজন সরে গেলে আসবে।

বাবা ঘোষণা করল—বাচ্চাগুলোর খিদে পেয়েছে। ওদের একটু দুধ এনে দে তো চুষি।

মা বলল—দুধ কি ওরা চেটে খেতে পারে ? খামোখা দেওয়া !

—আহা, দিয়েই দেখ না। খিদে পেলে বাঘে ধান খায় শুনেছি !

দেওয়া হল। কুসির খেলাঘরের একটা ছোট্ট বাটিতে করে। সে বাটির দিকে ফিরেও তাকাল না বাচ্চাগুলো। বরং একটার গায়ে ধাক্কা লেগে বাটি উল্টে দুধটুকু পড়ে গেল। পরে ধাড়ীটা এসে সে দুধ চেটে খায়।

সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখা গেল বাবার আর কুসির। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবা চা আর কুসি দুধ খেয়েই গিয়ে কাকার ঘরের চৌকির সামনে উবু হয়ে বসে বেড়ালছানা দেখে। রাতে শোওয়ার আগেও বাবা গিয়ে টর্চ ফেলে দেখে আসে। পান্তিকে বলে—একটা ন্যাকড়া-ট্যাকড়া কয়েক ভাঁজ করে ঢেকে দিস ওগুলোকে। শীতে কষ্ট পায়।

মা বলে—হুঁঃ বেড়ালরা কত যেন কোট প্যাণ্ট পরে ঘুরে বেড়ায় শীতকালে !

—আঃ হাঃ, তোমার কেবল সব বিষয়ে ফোড়ন কাটা।

মা বাবার রোজই লেগে যায়। তাতে অবশ্য মা রোজই দুই তিন গোলে জেতে। ঝগড়ার শেষে মা প্রমাণ করে ছাড়ল যে, জীবজন্তুদের শীত লাগার কথা নয়। বাবা স্বীকার করল না বটে, তবে বেড়ালছানা চাপা দেওয়ার জন্য আর চাপাচাপিও করল না। মা কিন্তু শোওয়ার আগে একটা ঝুড়িতে চট পেতে নিয়ে গিয়ে ধাড়ীসুদ্ধ ছানাগুলোর জন্য চমৎকার বাসা করে দিল।

শুখা বাতাস আর রোদের তাপ কমে চারদিককার শীতভাব শুষে নিতে লাগল। কুয়োর জল অনেক নিচে নেমে গেছে। শিমুলগাছে ফুল এল। বাবুদা ডাকঘরে কেরানীর চাকরি পেয়ে বাইরে চলে যাওয়ার আগে একদিন এসে মা-বাবাকে প্রণাম করে গেল। আগে কখনো এরকম প্রণাম-ট্রনাম করে নি।

বাবুদা চলে গেলে কি হয় এখন কিন্তু চুষি ঠিক টের পায় তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবার লোকের অভাব নেই। চুষির বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড ঝলকে ঝলকে ফোয়ারার মতো রক্তস্রোত বইয়ে দেয়। শরীর জুড়ে সেই রক্ত ঝরনার মতো ঝরে পড়ে। দিনরাত নিজের শরীরে এক অন্তর্গত ঝরনার শব্দ শোনে সে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালের একটা ব্রণ টিপল চুষি। টিপতে নেই, তাহলে বাড়ে। তবু গালে একটা টুসটুসে ব্রণ দেখতে পেলে সেটার ভাত বের না করেই বা থাকে কি করে মানুষ ?

ব্রণটা গেলে দিয়ে জায়গাটায় একটু ক্রিম ঘষে দিল সে। মুখখানা বারবার ঘুরিয়ে দেখল। একটু নাচের ভঙ্গী করল। আজকাল অনেক কিছু টের পায় চুষি। শরীর, মন, মানুষের চোখ।

কখনো কলঘরে গিয়ে নিজেকে খুঁজে দেখে চুষি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। একী ! এমা ! সে যে কচি মেয়েটা ছিল এতদিন ! বড হয়ে গেল ?

মাঝে মাঝে রোদে হাওয়ায় ভেসে যেতে যেতে খুব হোঃ হোঃ হাসতে ইচ্ছা করে তার।

আবার এক একদিন এমন হয়, কুয়োতলা ছাড়িয়ে পিছনের লাউমাচার ছায়ায় বসে দুপুরবেলার নির্জনে বিভোর হয়ে কাঁদে। বেড়ালছানাগুলো আজকাল দরদালানে আসে, ঘরে আসে। ঠাকুমা প্রথম প্রথম তাড়া দিত—যাঃ, যাঃ, এক্ষুনি সব ছুঁয়ে-ছেনে দেবে।

কিছুদিন বাদে ঠাকুমা আর তাড়া দেয় না। বেড়ালরা দালানে ঘোরে।

ঘরে খেলা করে। ফুটফুটে ছানাগুলোকে এ ও সে কোলে নিয়ে খানিক আদর করে ছেড়ে দেয়, লুডোর ছক পেতে দিলে বেড়ালছানারা দিব্বি পা দিয়ে ছকটা উল্টেপাল্টে খেলা করে।

কুসিও খেলে। সে আজকাল খুব বৌ সাজতে ভালবাসে। বাবা ছোটো ডুরে শাড়ি কিনে দিয়েছে। চুষি তাকে শাড়ি পরিয়ে বৌ সাজায়। কুসি পুতুল-ছেলে কোলে করে একদম মায়ের ভাষায় আদর করে শাসন করে। পাকা মেয়ে।

বাবা দেখে বলে—ওঃ বাবা, মেয়ের বিয়ের কথা ভাবলেই বুক কেমন করে।

মা বলে—তা বিয়ের খরচের কথা ভাবলে ওরকম অনেকের হয়! মেয়ের বিয়েতে খরচ তো করতেই হবে।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে—সবসময় টাকার কথা ভেবে কথা বলি নাকি। মেয়ের বিয়ে দিতে মনের কষ্টও তো আছে।

—তুমি কি সে ভেবে বলেছো!

আবার মাতে বাবাতে লেগে যায়। মা জেতে। বাবা হেরে গিয়ে রেগে কুয়ো থেকে দশ বিশ বালতি জল তুলে ফেলে।

তুলোর আঁশ বাতাসে উড়ে যায়। উঠোনের রোদে সাদা আর সাদা-কালো বেড়ালছানারা এখন গম্ভীরভাবে বসে থাকে থুপ হয়ে। তুলোর আঁশ দেখলে লাফিয়ে লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করে। ঘর দোরে আসে, বিছানায় ওঠে। ধাড়ীটা আর বাচ্চাগুলোর কাছে তেমন ঘেঁষে না, পাড়া বেড়ায় চৌপর দিন।

কাকিমা বাচ্চা কোলে করে ফিরে এল একদিন। বাড়িময় ছুটোছুটি পড়ে গেল। আদর আর কাড়াকাড়িতে বাচ্চাটা ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে। তারপর চুপ করে যায়। তারপর এর কোলে তার কোলে ঝাঁপ খেয়ে যেতে শিখে যায়।

বাবা বলে—মানুষের বাচ্চার চেয়ে বেড়ালের বাচ্চারা অনেক বেশী সাবালক। তারা খুব তাড়াতাড়ি সেল্‌ফ-ডিপেণ্ডেন্ট হয়।

ধর ডাক্তার বলে—সাবালক হয়, কিন্তু বেড়াল বাচ্চারা কোনোদিনই মানুষ হয় না কথাটা মনে রেখো।

—বোকার মতো কথা বোলো না। বেড়াল মানুষ হতে যাবে কেন?

তা সে যাই হোক। কথাটা হল, চুষিদের বাড়িতে আগে কোনো বেড়াল ছিল না। এখন বেড়াল হয়েছে।

বাঘ

এইখান দিয়ে একটু আগে একটা বাঘ হেঁটে গেছে। নরম মাটিতে এখনো টাটকা পায়ের দাগ। বাতাস শুঁকলে একটু বোঁটকা গন্ধও। বাঘটা শুধু যে বেড়াতে বেরিয়েছিল, এমন নয়। ফেরার পথে বাজারও করে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ বুড়ো হরিচরণের একটা বাছুরও নিয়ে গেছে মাঠ থেকে। তাই কাদা মাটিতে বড বড় রক্তের চাপ পড়ে আছে। জেলির মতো জমে গেছে। হ্যাট মাথায় কয়েকজন হাফ্ প্যাণ্টপরা শিকারী ঘুরে বেডাচ্ছে ঝোপে ঝাড়ে। বীটাররা নদীর ধারের জঙ্গলের ওপাশ থেকে টিন, ঘণ্টা আর যা পেয়েছে সব বাজাতে বাজাতে আসছে। একজন পাইপ মুখে শিকারী বন্দুকটা ধাঁ করে মাঝখানটায় ভেঙে কার্তুজ পরীক্ষা করে নিল, তারপর ফডাক করে আবার সোজা করল বন্দুক। সবাই তৈরি।

বাঘটা সেবার বেরোয় নি। কিন্তু বহুকাল আগের দেখা এই দৃশ্যটা আজও ভুলতে পারে না জোনাকিকুমার।

বাঘটা বেরোয় নি বলেই কি আজও এইরকম অপেক্ষা করছে সে?

মাঝদুপুরে আজ বৃষ্টি নামল। তারপরই হঠাৎ থেমে গেল। আবার নামল, আবার থেমে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে জোনাকিকুমারও এক-একবার এক-একটা বাড়ির সদরে বা লবীতে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং এইভাবে সে ময়দানের কাছে একটা আঠারোতলা অফিস বিল্ডিংয়ে পৌঁছেছে সীতানাথের সঙ্গে দেখা করবে বলে। দেখা হল না। সীতানাথ তেরোতলায় বসে। শুনল সে আজ ফুটবল খেলা দেখতে গেছে। জোনাকি একটু হতাশ আর নিঃসঙ্গ বোধ করে। সীতানাথকে পেলে কদমের মেস্-এ গিয়ে তাস পেটানো যেত। হল না। কিন্তু তেরোতলা থেকে একঝলক ময়দান দেখে সে বড় অবাক হয়ে গেল। এ বাড়িতে সীতানাথের অফিস সদ্য উঠে এসেছে, এই প্রথম সীতানাথের অফিসে এসেছে জোনাকি। তেরোতলা থেকে ময়দান সে আর কখনো দেখে নি। কি আশ্চর্য সবুজ! বিশ্বাস হয় না। কলকাতা নয়, ঠিক বিলেত বলে মনে হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা পর্যন্ত চেনা বলে মনে হয় না। নিচে চৌরঙ্গীর রাস্তা, টিকিওলা ট্রাম যাচ্ছে, ভোঁতা ডবলডেকার গাড়ি—সবই অদ্ভুত সুন্দর

দেখায়। ছিমছাম এক ইউরোপের শহর যেন। ময়দান এত সুন্দর জানা ছিল না তো!

জোনাকি আবার লিফ্‌টে নেমে এল। আগাগোড়া বাড়িটা এয়ারকণ্ডিশন করা, ভেজা গায়ে শীত করছিল। বেরোবার মুখে দেখল, ফের বৃষ্টি নেমেছে। নামুক। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই। এ ব্যাপারটা সে আজকাল মাঝে মাঝে টের পায়। কোথাও যাওয়ার নেই। এত কম লোকের সঙ্গে তার চেনাশোনা।

বছর দুই আগে তার একজন সুন্দরী প্রেমিকা ছিল, তিতির। দু' বছর আগে তিতিরের কাছে যাওয়ার ছিল। তখন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মনে হত—তিতির। অফিস ছুটি হলেই মনে হত—তিতির। ছুটির দিন কাছে এলেই মন বলত—তিতির। তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। দু' বছর আগে তিতিরের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই জোনাকির জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ বৃষ্টি পড়ছে। গাছপালা, মানুষজন, চাষ-আবাদ সবই দেখতে হয় বৃষ্টিকেই। শেষ বর্ষায় সে তাই বকেয়া কাজ মিটিয়ে দিচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে অফিসের মুখটায়। তার মধ্যে জোনাকিও। তার কোনো জায়গার কথা মনে পড়ছে না, বৃষ্টির পর যেখানে গিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটানো যায়। তাই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। বীটাররা বাজনা বাজাচ্ছে, শিকারীরা বন্দুক হাতে তৈরি। বাঘটা কি বেরোবে?

তা জীবনে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। জোনাকিরও বেরিয়েছিল। যে মফঃস্বল শহরে সে বাঘ দেখতে শহরতলি ছাড়িয়ে নদীর ধারের গাঁয়ে গিয়েছিল, সেই শহরের একটা ইস্কুল থেকে সে স্কুল ফাইন্যালে দশম স্থান অধিকার করে। পড়াশুনোয় অবশ্য বরাবরই ভাল ছিল সে, ফার্স্ট হত ক্লাসে। পরীক্ষাও ভালই দিয়েছিল। কিন্তু তা বলে দশম? নিজেই সে বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ঘটনার পর সবাই জোনাকির দিকে তাকাল ভাল করে। দারুণ জিনিস আছে তো ছেলেটার মধ্যে।

আর সেইটেই ছিল জোনাকির অস্বস্তির কারণ। তার ভিতরে যে তেমন কিছু নেই এটা সে হাড়ে হাড়ে টের পেত। মুশকিল হল, একবার দশম হয়ে গেলে পরে আর রেজাল্ট খারাপ করা যায় না, লোকে হাসবে। তাই জোনাকি খুব খেটে আই এস-সি দিল। ফার্স্ট ডিভিশনটাও হল না। তারপর থেকে সে হাঁফ ছেড়ে সাদামাটা হয়ে গেল। বি এস-সি-তে পিওর ম্যাথেমেটিক্‌সে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেল, এম এস-সি পড়ল না। চাকরি পেয়ে করতে লাগল।

সেই টেন্থ হওয়ার কথা ভাবলে আজকাল ভারী লজ্জা করে। কেন যে সে টেন্থ হতে গেল! ওই একবার টেন্থ হওয়ার ফলে সবাই পরবর্তী জোনাকিকে দেখে দুঃখ করে। বলে—তোমার ব্রিলিয়াণ্ট ক্যারিয়ার হওয়ার কথা ছিল হে জোনাকি, এ তুমি কি হলে? এরকম দুঃখ মাঝে মাঝে জোনাকিরও হয়।

কেউ কেউ বলে সায়েন্স না পড়ে আর্টস পড়লেই জোনাকি ভাল করত। কিন্তু তা জোনাকির মনে হয় না। সে তো সেই আই এস-সি পড়ার সময় থেকেই বিস্তর খোঁজখবর রাখত। ই ইজ্ ইকুয়াল টু এস সি স্কোয়ার, আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত ইকুয়েশন পর্যন্ত জানা ছিল তার। এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু মাস টাইমস্ দি স্পীড অফ্ লাইট স্কোয়ারড। কজন জানত তা? বি এস-সি বই থেকে সে অঙ্ক কষত ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে। তবু পারা গেল না। আসলে বোধহয় জীবনে ওই একটাই ভুল করেছিল সে, স্কুল ফাইন্যালে দশম হয়ে। সেটা না হলে আজ কারো দুঃখ থাকত না। তার নিজেরও না।

যে চোখ বাঁধা ম্যাজিসিয়ান এতক্ষণ এলোপাতাড়ি তীর ছুঁড়ছিল মাটিতে, সে এবার তার খেলা থামিয়েছে। বৃষ্টি ধরল। না ধরলেও ক্ষতি ছিল না। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই।

বেরোবার মুখে একজন বয়স্ক লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছিল। বলল—এরকম বৃষ্টির কোনো মানে হয়? বলুন তো?

জোনাকির মনে হয় মুখটা চেনা-চেনা। সে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটা তার দিকে চেয়ে একটা চেনা-হাসি দিয়ে বলে—সীতানাথকে খুঁজতে এসেছিলেন? ওর ভীষণ ফুটবল্লের নেশা।

জোনাকি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে বলে—আপনি কি ওর অফিসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছেন আমাকে, মনে নেই বোধহয়। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি, সীতানাথের কাছে মাঝে মাঝে পুরোনো অফিসে আসতেন। তখন থেকেই চিনি। আপনি তো জোনাকি সেনগুপ্ত স্কুল ফাইন্যালে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জোনাকি তাড়াতাড়ি বলে লোকটাকে কথাটা শেষ করতে দেয় না।

—সীতানাথকে তো পেলেন না, এখন কোনদিকে যাবেন?

—ভাবছি। বলে জোনাকি।

—ভাবাভাবির আর কি? চলুন আমার বাসায় চলুন।

জোনাকি অবাক, বলে—আপনার বাসায়? লোকটা অমায়িক হেসে বলে—বেশীদূর নয়। বেকবাগান। আমার ছেলেমেয়েরা কখনো স্ট্যাণ্ড করা ছাত্র

দেখে নি। আপনাকে দেখলে খুব ইম্‌পেটাস পাবে। চলুন না, সবাই খুব খুশী হবো আমরা।

হঠাৎ জোনাকি রাজি হয়ে গেল, বলল—চলুন।

দুই

তিতিরের মাথায় নানা রকম রান্নার পোকা ঘুরে বেড়ায়। যেমন আজ সন্ধেবেলা তিতির একটা অদ্ভুত রান্না করল, ডিমের সঙ্গে বেগুন দিয়ে ওমলেট। তার নাম দিল—ডিমবেগ। পাতলা করে কাটা বেগুনের চাক ফেটানো ডিমে ভিজিয়ে ডোবা তেলে ভাজা। মন্দ নয় খেতে, একটা চেখে দেখল তিতির। তেলটা বড্ড বেশী লাগে।

ভেবে একটু ভ্রূ কোঁচকায় তিতির। বেশী তেলের ব্যাপারটা তাকে খোঁচা দেয়। বাস্তবিক, এই তেল-টেল নিয়ে ভাবতে তার একদম ভাল লাগে না। ভাবার অবশ্য দরকার নেই। তার সংসারে অভাবের ছিটেফোঁটাও নেই, বরং সবই অঢেল আছে। আসছেও। কিন্তু তবু বেশী তেল লাগার ব্যাপারটা তাকে তার বাপের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানে এখনো তার আত্মীয়রা তেল, চাল ইত্যাদির ব্যাপারে বড় সতর্ক। সেই মানসিকতা আজও একটু রয়ে গেছে তিতিরের।

ফেটানো ডিম আর বেগুনের চাক সরিয়ে রেখে রান্না করার লোক চিত্তর দিকে তিতির তাকাল। সে রান্না করছে বলে চিত্ত এতক্ষণ সরে দাঁড়িয়ে অন্য কাজ সেরে নিচ্ছিল।

তিতির বলল—খাওয়ার সময়ে ওগুলো ভেজে দিও।

চিত্ত ঘাড় নাড়ে। তিতির চলে আসে।

কি বিশাল এই ফ্ল্যাটবাড়িটা! হাঁটলে যেন জায়গা ফুরোয় না। এক লাখের কাছাকাছি দাম পড়লো ফ্ল্যাটটার। তার ওপরে মেইনটেনেন্স চার্জও অনেক পড়ে যায় প্রতি মাসে। এসব নিয়ে ভাবার কিছু নেই। তবু হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়—কতগুলো টাকা!

এ-দেয়াল ও-দেয়াল জুড়ে জানলা। খুলে দিলে ঘরটা বারান্দা হয়ে যায়। সাত তলার ওপর থেকে নিচের দিকে তাকায় তিতির। এত ওপরে থেকে অভ্যাস নেই তো। মাথা ঘোরে। জানলাগুলোয় কেন যে ছাই গ্রীল দেয় নি

ওরা ! অমিতও অবশ্য গ্রীল লাগাতে রাজী নয়, বলে—গ্রীল দিলে খাঁচার মতো হয়ে যাবে। কিন্তু তিতিরের ভয় করে। আকাশটা যেন হাত বাড়িয়ে রয়েছে। একতলা পর্যন্ত বিশাল শূন্যের ব্যবধান যেন ক্রমাগত জানলা দিয়ে তাকে ডাকে—এসো, লাফিয়ে পড়ো।

তিতির সরে আসে। লাফিয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। তার জীবনে কোনো দুঃখ আছে ?

অমিত দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফেরার সময়ে একটা মস্ত টেলিভিশন সেট নিয়ে এসেছে। সামনের ঘরে সেটা রাখা, ওপরে পুতুল, ফুলদানি। এখনো অবশ্য টেলিভিশনের পর্দা অন্ধকার। কলকাতায় টি-ভি চালু হলে তারা দেখবে সেই আশায় আগে থেকে এনে রেখেছে অমিত। বিদেশ থেকে আনা কত কি তাদের ঘরে !

তিতিরের মুখখানা ছিল সুন্দর। বয়সকালে শরীরটা দেখনসই হয়েছিল। তার জোরেই না অসম্ভব ভাল পাত্র জুটে গেল তার ! তিতির আয়না দেখল না, কিন্তু টি-ভি সেটের সামনে একটা গদির হেলানো চেয়ারে বসে নিজের মুখখানার কথা, সৌন্দর্যের কথা ভাবতে লাগল।

দু বছর হয়ে গেল, অমিত এখনো ছেলেপুলে চাইছে না। কিন্তু পুরুষমানুষের ছেলেপুলের ঝোঁক থাকেই। কবে বলবে—তিতির এবার ছেলে দাও।

যতদিন তা না চায় অমিত, ততদিন তিতির বেশ আছে।

না, খুব ভাল অবশ্য নেইও তিতির। ঐ যে শিকহীন গ্রীলহীন মস্ত জানলা-গুলি, ওগুলোকেই ভীষণ ভয় তার। দিনের বেলায় রোদভরা আকাশ, রাতে আকাশভরা জ্যোৎস্না বা অন্ধকার, নক্ষত্ররাশি হাওয়া সব কেমন হুহু করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে ! ঘরটা যেন বাহির হয়ে যায়। একা থাকে তিতির। ওপরের ফ্ল্যাটে বা পাশের ফ্ল্যাটে কোনো শব্দই হয় না, কারো গলার স্বর কানে আসে না, নিচের রাস্তাটাও নির্জন—সেখান থেকে এত ওপরে কোনো শব্দ উঠে আসে না। আর এই গভীর নিস্তব্ধতায় ঐ খোলা জানলা দিয়ে হাতির মতো ঢুকে আসে বাইরেটা। ভীষণ হুহু করে ঘরদোর। হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে সব উল্টে-পাল্টে দেখে, এঘর ওঘর খুঁজে বেড়ায়, বলে—খুব সুখী তুমি তিতির।

সুখীই তিতির। শুধু ঐ খোলা জানলাগুলোই তাকে দুঃখ দেয়। আগে ছেলেপুলে হোক, তখন অমিতকে বলবে গ্রীল দিতে। ছোটো খোকা হামাগুড়ি দেবে, হাঁটতে শিখবে, ডিং মেরে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি দেবে—মাগো তখন যদি পড়ে যায় ? খোকার জন্য তখন ঠিকই গ্রীল দিতে রাজী হবে অমিত।

কিন্তু এসব বাড়িতে গ্রীল দেওয়ার নিয়ম আছে কিনা কে জানে! হয়ত কোম্পানী থেকে বলে দেবে যে, গ্রীল-ট্রিল চলবে না, তাতে বাড়ির সৌন্দর্য থাকে না। তখন ঐ বাইরের হাতিটা চিড়িয়াখানার হাতির মতো জানলার ওপাশে আটকে থেকে শুঁড় দুলিয়ে বলবে—খুব সুখী তুমি তিতির!

তিতির উত্তর দেবে—হ্যাঁ হাতিভাই, আমি খুব সুখী। তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যেও।

বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসে না। না আসাই স্বাভাবিক। ওরা আসতে ভয় পায়। সংকোচ বোধ করে। বড্ড বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যে তিতিরের। সবসুদ্ধ তিন বোন তারা। তিতির ছোটো। বড় দুই দিদির ভালই বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা এখন সূর্যের পাশে মাটির পিদিম হয়ে গেছে।

এসব ভাবতে বুকে একটু দুঃখ আর একটু সুখ, দুটি ঢেউ ভাঙে।

টুং করে কলিং বেল্-এ পিয়ানোর একটা রীডের শব্দ ওঠে। রোজ এরকম শব্দ। দরজায় একটা কাচের চৌখুপী আছে। সেইটি দিয়ে দরজা খোলার আগে দেখে নেয় তিতির। হ্যাঁ, অমিত।

অমিত ঘরে আসে। আগে আগে দরজার কাছেই সর্বাঙ্গ দিয়ে চেপে ধরত তিতিরকে, মুখের সর্বত্র চুমু খেয়ে নিত। আজকাল খায় না। অত কি? রোজ তো খাচ্ছেই অন্য সময়ে।

অমিত ঘরে ঢুকে বলে—আজও?

তিতির চমকে বলে—কি?

—তুমি ম্লানমুখী।

তিতির লজ্জা পেয়ে বলে—না। জানো, আমি না ঐ জানলাগুলোর কথা ভাবছিলাম। বড্ড ভীষণ ফাঁকা।

—ওঃ! আমি ভাবি, বুঝি তিতির তার কোনো পুরোনো প্রেমিকের কথা ভাবছে।

তিতির রাগ করে বলে—ভাবছি তো! সে এসে ঐ জানলা দিয়ে ডাকে। একদিন ঠিক ঝাঁপ দেবো।

অমিত একটু বেঁটে, কালো, একটু মোটাও। ইদানীং মেদ কমানোর জন্য স্লিমিং কোর্স নিচ্ছে। অফিসের পর সেখানে যায়। আলু, মিষ্টি খায় না। কত খাবার বানায় তিতির। ও খায় না। কেবল একটু আধটু ড্রিঙ্ক করে। ওর বেহিসেবী হলে চলে না। কত কাজ ওর!

—আজ একটা নতুন খাবার করলাম মাথা খাটিয়ে।

—কি ?

—ডিমবেগ। খেতে বসে দেখবে, আগে বলব না, কি দিয়ে তৈরি হয়েছে।

অমিত হেসে বলে—তোমার সেই নিরামিষ ডিমের কারীটা যেন কি দিয়ে করেছিলে ?

—কেন, খারাপ হয়েছিল ? ডিমের বাইরের সাদাটা করেছিলাম ছানা দিয়ে, আর ডালসেদ্ধ দিয়ে কুসুম।

—বেশ হয়েছিল। তবে কিনা ওসব বেশী খেলে আমার আবার না ফ্যাট বাড়ে।

—তা বলে না খেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেলবে নাকি ? ওসব চলবে না। ঘরভর্তি এত খাবার, খায় কে বলো তো ?

তিন

ভদ্রলোকের নাম শচীন দাশগুপ্ত। ছেলেমেয়েদের সামনে জোনাকিকে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন—এই ইনি স্কুল ফাইন্যালে—

জোনাকি লজ্জা পায় আজও। বাঘটা একবার বেরিয়েছিল, তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

জোনাকিকে শচীনবাবু তাঁর ঘরের সবচেয়ে ভাল চেয়ারে বসালেন, এমনভাবে বসালেন যাতে মুখে ভালভাবে আলো পড়ে। তাঁর চার পাঁচজন ধেড়ে ধেড়ে ছেলেমেয়ে হাঁ করে দেখছিল, গিন্নীও এলেন। এক বুড়ো আত্মীয় কেউ এসেছেন, তিনি বাক্যহারা। স্ট্যাণ্ড করা ছেলে। ইয়ার্কি নয়।

কেবল জোনাকিই জানে—এটা কত বড় ইয়ার্কি। তবু খারাপ লাগে না। শচীনবাবুর বড় মেয়েটি যুবতী। সে বেশ চেয়ে থাকতে জানে। জোনাকির খারাপ লাগছিল না।

বুড়ো আত্মীয়টি জিজ্ঞেস করেন—কি করেন ?

—চাকরি।

—আ হা, চাকরি করেন কেন ? ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেরা এডুকেশন লাইনে থাকলে ছাত্ররা কত কি শিখতে পারে ! বড় চাকরির লোভে কত ভাল ছেলে নিজেকে নষ্ট করে, দেশও বঞ্চিত হয়।

—আমি বড় চাকরি করি না। সামান্য কেরানী।

—সে কি ? বলে শচীনবাবুর আত্মীয় চেয়ে থাকেন।

শচীনবাবু একটু মলম লাগানোর চেষ্টা করে বলেন—তাতে কি ? উনি টেন্‌থ হয়েছিলেন সেটা কি তা বলে মুছে গেছে ? বোর্ডের খাতায় তো আর নামটা মুছে ফেলে নি। যাকে বলে দশজনের একজন।

—তা বটে। বলে আত্মীয়টি নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন বোধহয়।

জোনাকির লজ্জা করছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারল, শচীনবাবুর মেজো ছেলে তার মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে দোকানে গেল খাবার আনতে। শচীনবাবুর বড় মেয়ে জোনাকিকে একটুও অপছন্দ করছে না। কেবল আত্মীয়টি উঠে বললেন—চলি। রাত হল। কেউ তাকে থাকতে বলল না।

কথাবার্তা তেমন কিছু হল না। কি করে হবে, এদের সঙ্গে যে মোটেই পরিচয় নেই। তাছাড়া টেন্‌থ হওয়া ছেলে। মুখ ফস্‌কে বেশী কথা বলা ভালও দেখাবে না। মিষ্টি খেয়ে উঠে পড়ল জোনাকি।

শচীনবাবু আর তাঁর স্ত্রী বললেন—আবার আসবেন। খুব ভাল লাগল।

শচীনবাবুর বড মেয়ে নিমি আলাদা করে বলল—আসবেন কিন্তু। আগে খবর দেবেন, আমার বন্ধুরাও আসবে দেখতে।

জোনাকির বড লজ্জা করছিল। বাঘটা মোটে একবার—

বেরিয়ে এসে জোনাকি দেখলো, এখনো মোটেই রাত হয় নি। বাড়ি গিয়ে কিছু করার নেই। বাবা সাত সকালে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মা বড় মেয়ের বাচ্চার জন্য কাঁথা সেলাই করছে। সাঁঝ-ঘুমোনী ছোটো বোনটা বিবিধ-ভারতী চালিয়ে শুয়ে আছে। বড্ড ছোটো বাসা।

ওই বাসায় তিতিরকে মানাত না। তার চেয়ে বরং শচীনবাবুর বড় মেয়েকে বেশ মানায়। ভাবতেই হঠাৎ চমকে ওঠে জোনাকি। তাই তো! শচীনবাবুরা দাশগুপ্ত না! পালটি ঘর। তবে কি শচীনবাবু ভেবে-চিন্তে প্ল্যান মাফিক জোনাকিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে ? আশ্চর্য নয়। হয়তো অফিসের গেট্-এ তাকে দেখেই শচীনবাবুর মাথায় কল্পনাটা খেলে থাকবে। কেরানী হোক আর যা-ই হোক, এক সময়ের টেন্‌থ হওয়া ছেলে তো ?

ভাবতেও জোনাকির লজ্জা করছিল। এ হয় না। ঐ টেন্‌থ হওয়ার জন্যই এক সময়ে তিতিরও তাকে পছন্দ করেছিল। পরে, ভুল বুঝতে পারে। বাঘটা একবারই—

খুব একটা সুন্দর রাস্তা দিয়ে এখন হাঁটছে জোনাকি। এসব রাস্তায় তো বড় একটা আসা হয় না। চারদিকে বিশাল বিশাল নির্জন সব অ্যাপার্ট্‌মেন্ট

হাউস উঠেছে, আরো কিছু বাড়ির কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। হুশ করে একটা তুটো মোটরগাড়ি চলে যায়। আর কোনো শব্দ নেই। কারা থাকে এখানে? শিকারী, না বাঘ?

বৃষ্টি এল। উপায় কি, জোনাকি দৌড়ে গিয়ে একটা অ্যাপার্টমেণ্টের দরজায় উঠে পড়ল। আসলে দরজাও ঠিক নয়, মস্ত গ্যারেজ ঘরের ফাঁকা জায়গা। দারোয়ান বসে বৃষ্টি দেখছে আর খইনির থুতু ফেলছে। তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। জোনাকি দাঁড়িয়ে অজস্র ঝিকিয়ে ওঠা অস্ত্রের মতো বৃষ্টির ধার দেখে। কিছু করার নেই। তবে অপেক্ষা করতে তার মন্দ লাগে না। কোথাও তো যাওয়ার নেই। সেই তু'বছর আগে, যখন তিতির ছিল, তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। তিতিরই তো একটা জায়গা। কত সুন্দর সব দৃশ্য ছিল তিতিরের নানা ভঙ্গীর মধ্যে লুকিয়ে।

সেই ভীতু বাঘটা কেন কোনোদিনই বেরিয়ে এল না? কেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ঐভাবেই লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ঐভাবেই লুকিয়ে থেকে সে কি মরে গিয়েছিল একদিন? কেন গর্জন করে বেরিয়ে আসে নি? সত্য বটে শিকারীরা ছিল, তাদের হাতে ছিল কার্তুজ-ভরা রাইফেল। কিন্তু এও তো সত্য যে ছিল অবারিত মাঠ, বিশাল পৃথিবীর মুক্তিও! সে উত্তাল গতিতে বেরিয়ে ছুটে চলে যেতে পারত, সেই মুক্তির দিকে। শিকারীর গুলি কি সব বাঘের গায়ে লাগে। লাগলেই বা কি, তবু তো বুঝতে পারত, তার মৃত্যুও কারো কারো প্রয়োজন! তাই অত শিকারীর আনাগোনা, অত সতর্ক দৃষ্টি অত ক্যানেস্তারা পেটানো। কত গুরুত্ব তার?

একটা গাড়ি কেমন চমৎকার সবুজ। কি বিশাল তার চ্যাপ্টা আর সবুজ দেহখানি। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকল। একজন লোক নেমে চলে গেল লিফ্‌টের দিকে। ফিরেও তাকাল না। হতে পারত জোনাকিও ওরকম। যদি কেবলমাত্র দশম হওয়াটুকু বজায় রাখতে পারত সে। কেন পারে নি, তা আর একবার ভাববার চেষ্টা করল সে। ভেবে দেখল, পারে নি বলেই পারে নি। বড্ড বেশী সচেতন হয়ে গিয়েছিল নিজের সম্পর্কে। মফঃস্বলের স্কুলে এক গরিবের ছেলের অতটা হওয়ার কথা নয় তো! বড্ড বেশী পড়ত, তাতেই মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। কিংবা কি যে হয়েছিল এতদিন পর তা আর মনে পড়ে না।

যদি হত তবে জোনাকিকুমার আজ এরকম একটা মস্ত ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে পারত, গাড়ি চালাত। তার বউ হত তিতির বা ওরকমই কেউ। খুব সুন্দর। এই বৃষ্টি বাদলার পৃথিবীতে কেবলই পথ ছেড়ে উঠে এসে পরের দরজায় দাঁড়িয়ে

অসহায়ভাবে বৃষ্টি দেখতে হত না। বেশ সুখেই থাকত এক সফল জোনাকিকুমার। নিমির মতো হাঘরে মেয়েরা তাদের তুচ্ছ ঘর-সংসারে তাকে ডাক দেওয়ার সাহসই পেত না।

এত বৃষ্টি! ঝড়ের হাওয়ায় সমুদ্র থেকে উড়ে আসে মেঘ। পরতে পরতে আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। রাস্তায় প্রতিহত জলকণা উঠে চারদিক ঝাপসা করে দেয়। চেনা পথ ধুয়ে যায় বৃষ্টিতে, ঘরে ফেরার দিকচিহ্ন উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝড়। আজও মনে হয়, এই দুর্যোগেও কোথাও যাওয়ার নেই জোনাকির। এই তো বেশ দাঁড়িয়ে আছে। কেটে যাচ্ছে আসলে খানিকটা সময়। জোনাকির সময়ের অভাব নেই। সে যদি সফল জোনাকি হত তো থাকত। কত ব্যস্ততা, কত টেলিফোন, কত নানাজনের ডাক। সে সব নেই জোনাকির। মস্ত বাড়ির তলায় নিচু গ্যারেজ ঘরে এই কেমন ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছে। অনেকগুলো গাড়ি চলে এল গ্যারেজ ঘরে। কত গাড়ি! দারোয়ান উঠে আলো নেভাচ্ছে। এর পর দরজা বন্ধ করবে। তার আগে হয়তো বা চলে যেতে বলবে জোনাকিকে। সে বড় অপমান। এ বাড়িতে তার ঘর নেই ঠিকই, কিন্তু তা বলে কোনো জায়গা থেকে কেউ চলে যেতে বললে আজও অপমান বোধ করে সে।

জোনাকি তাই বৃষ্টিতেই নেমে এল। কি প্রবল ধারা! গায়ে ছ্যাঁক করে শীতের ছোঁয়া লাগল প্রথমে। তার ফাঁকা মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা ডুগডুগ করে বেজে উঠল। লক্ষ আঙুল দিয়ে বৃষ্টি তাকে চিহ্নিত করে বলতে থাকে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

কোথাও যাওয়ার নেই। তবু যাওয়া থেকেই যায় মানুষের। কেন যে যায়! থেমে পড়লেই তো হয় মাঝপথে! কেন কেবল যেতেই হবে?

রাস্তায় লোকজন নেই। একা জোনাকি হেঁটে চলেছে। চোখ অন্ধ ও শ্রবণ বধির করে দিয়ে অনন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে যেতে থাকে। পোশাক চুপসে যায়। কাঁপুনি উঠে আসে শরীরে। ভিজে ভিজে হাঁটে জোনাকি। চারদিকে মেঘ ডাকছে। একটা বজ্রপাতের শব্দ হয়। জোনাকি একবার বলে—জানো না তো, তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার মধ্যে কিরকম আনন্দ আছে!

কাকে বলে কে জানে!

চার

—ওগো শোনো, কী ভীষণ ঝড় উঠল! তিতির ভয়ের গলায় বলে।

তাকে বুকে টেনে নিয়ে অমিত বলে—ঝড়! তাতে কি? এ বাড়িতে কোনো ভয় নেই তো তিতির!

—বড্ড হাওয়ার শব্দ হচ্ছে যে!

—এত ওপরে একটু বেশী হাওয়া তো লাগবেই। কিছু ভয় নেই। আমার তো ইচ্ছে করে এই ঝড়ের মধ্যে বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে পড়ি। খোলা হাওয়া বৃষ্টির জল আমাকে ধুয়ে মুছে দিক।

—আহা।

—সত্যিই। খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি তো যেতে দেবে না।

—দেবো না-ই তো!

—জানি। বড্ড রুটিন হয়ে গেছে জীবনটা।

—রুটিন না হলে চলে? তোমার কত কাজ! তিতির ওকে একটু আদর করে বলে।

একটু ড্রিঙ্ক করেছিল অমিত। বেশীক্ষণ জেগে থাকতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তিতিরের আর ঘুম আসে না। সে উঠে এয়ারকুলার বন্ধ করে দিল। ঠাণ্ডা লাগছে।

একটা ধূসর পর্দায় জানলাগুলো ঢাকা। পর্দা নড়ছে না। কিন্তু বাইরে হুঙ্কার দিয়ে ফিরছে ঝোড়ো বাতাস। কাচের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে অবিরল টোকা দেয় গোপন প্রেমিকের মতো। তিতিরকে ডাকে।

উঠতেই হয় তিতিরকে। একটা বাজ পড়ল কোথায়। বাড়িটা তার অজস্র কাচের শার্সি নিয়ে ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। ঘুম আসবে না। এরকম ঝড়বৃষ্টির রাতেই ভাল ঘুম আসে লোকের, কিন্তু তার আসবে না।

তিতির পর্দাটি সরিয়ে দেখে, কলকল করে জলস্রোত নেমে যাচ্ছে শার্সি বেয়ে। নিচে একটা ডাইনীর শহর—যত না তার আলো তত বেশী ভুতুড়ে অন্ধকার। বাড়ি-ঘর সব যেন নুয়ে গেছে, গাছপালা হয়ে গেছে কাল্পনিক গাছের ছবির মতো, আলোগুলো বৃষ্টিতে দিপ্‌দিপ্‌ করে। এত উঁচু থেকে সবই মনে হয় বড্ড দূরের।

মাঝখানে শূন্য। আর এই গভীর রাত্রে শার্সি ভেদ করে সেই শূন্যটা ঘরের মধ্যে চলে আসতে থাকে।

বাতি জ্বেলে টি-ভি সেটটার মুখোমুখি বসে এসে তিতির। হাই তোলে। অমিতের জন্য একটা সোয়েটার বুনছিল, সেইটে নিয়ে বসে।

হাতিটা ভেজা গায়ে সামনে দাঁড়ানো, বলে—খুব সুখে আছো তুমি তিতির।

—হ্যাঁ হাতিভাই। কেবল ঐ জানলার গরাদ লাগানো বাকি। সেটা হয়ে গেলে আর কি চাই!

—সেটা লাগাতে খুব বেশী দেরি কোরো না তিতির। কি জানি, কবে তোমাকে আমি চুরি করে নিয়ে যাই জানলা দিয়ে।

—ও কথা বোলো না হাতিভাই। আমি তো কোনো পাপ করিনি যে মরব। বরং এত সুখে থেকেও আমি কখনো আর দশজনের কথা ভুলি না। গত রবিবারে আমরা আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিয়ে এলাম। শিরাতে ছুঁচ ফুটিয়ে কত রক্ত বের করে নিল বলো তো! অনাথ আতুরদের জন্য যে ফাণ্ড খোলা হয়েছে তাতে আমরা প্রতি মাসে অনেক টাকা দিই, মাঝে মাঝে কালেকশনে বেরোই। মূক-বধিরদের জন্য, অন্ধদের জন্য, আমরা সব সময়েই ব্যথিত। যা পারি, যতখানি পারি করি। সুখী বলেই স্বার্থপর ভেবো না আমাদের।

হাই উঠছে। ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ। তবু ঘুমোতে গেলেই কি একটা হয়। এই ঝড় জলের রাতটা তার দুর্যোগ নিয়ে কেবলই ঢুকে আসে ফ্ল্যাটে। কেন যে এত বড় বড় জানলা করেছে এ বাড়িতে। কোনো মানে হয় না। আকাশ ঢুকে পড়ে, বাতাস ঢুকে পড়ে। শূন্যতাও বেড়াতে আসে নির্লজ্জ প্রতিবেশীর মতো, এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিতিরের সুখ-দুঃখের খতিয়ান নিয়ে যায়। বিশ্রী। অমিত কিছুতেই তিতিরের একটা কথা শুনতে চায় না। ও কি বোঝে না যে জানলায় একটা প্রতিরোধ দরকার। ভীষণ দরকার!

টি-ভির পর্দাটা ঢালু, তার আলোহীন কাচে কোনো ছবি দেখা যায় না। কবে যে কলকাতায় টি-ভি চালু হবে! শোনা যাচ্ছে, ওয়ার্লড টেবিল টেনিস দেখাবে এবার। তাহলে কিছুদিনের জন্য বাঁচা যায়। স্নেহভরে একবার চমৎকার সেটটার দিকে চেয়ে থাকে তিতির।

হাতিটা এখনো যায় নি বুঝি। তিতিরকে ডেকে বললে—বলো তো সুখ কাকে বলে!

—সুখ! বলে তিতির ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। বলে—কি জানি বাবা! তোমার সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন। তবে মনে হয়, যার কখনো পুরোনো দিনের কথা

মনে পড়ে না, যে কখনো অতীত নিয়ে ভাবে না, অনুতপ্ত বা দুঃখিত হয় না, যে কেবল প্রতিটি বয়ে যাওয়া মুহূর্তকে অনুভব করে—সেই সুখী।

উঠে ফের বাতি নিভিয়ে দেয় তিতির। বাইরে যে আজ কি প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে! মাগো, গরিব-দুঃখীদের বড় কষ্ট।

—তোমার কিছু মনে পড়ে না তিতির?

হাতিটা তবে এখনো যায় নি! তিতির ভ্রূ কুঁচকে বলে—ওঃ! হ্যাঁ, চেষ্টা করলে আবছা সব মনে পড়ে। মনে পড়লে ভীষণ হাসি পায়।

—কি রকম?

—এই ধরো না, আমি একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করতাম। সে স্কুল ফাইন্যালে টেন্‌থ হয়েছিল। তারপর আর কিছু হয় নি। মনে পড়ে খুব একটা প্রেম হয়েছিল। ভারী মজার নাম ছিল তার। জোনাকি!

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শোওয়ার ঘরের দিকে চলেছে তিতির। আর একা একা খুব হাসছে। এত হাসি পায়। জোনাকি! কি নাম বাবা।

শোওয়ার ঘরে এসে একটু চমকে যায় তিতির। পর্দাটা সরানো। মস্ত জানলা কে অমন আদুড় করে দিল? বাইরে একটা ধূসর পাগলা ঝড়। মুহুর্মুহু কাচের শার্সিতে করাঘাত করছে এসে এক মহাশূন্য। বাতাস আকাশ। শার্সি জুড়ে এক বিশাল পর্দার টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে এক মহাজগতের মহাপ্রলয়।

শিউরে ওঠে তিতির। ও মা! জানলার একটা ধারের ছোট্ট একটা পাল্লা কে কখন খুলে দিল! বৃষ্টির প্রবল ছাঁট আসছে, বাতাস ঘূর্ণির মতো পর্দাটাকে ওড়াচ্ছে কোণের দিকটায়। তিতির জানলার কাছে দৌড়ে গেল। কিন্তু পাল্লার কাছে পৌঁছোতে পারল না। সেই আদিম পাগল ঝড়টা তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে—সরে যাও, সরে যাও, আমি তোমার ঘর তল্লাসী করতে এসেছি।

তিতির ভয় পেয়ে সরে আসে।

বিছানায় একটা হাল্কা চাদর গায়ে চাপা দিয়ে শুতে গিয়েই ফের ভীষণ চমকে ওঠে। অমিত কোথায় গেল?

—ওগো! বলে ভয়ার্ত তিতির উঠে বসে। কোনো উত্তর আসে না।

বাইরে হোহো করে হেসে ওঠে বাতাস। আকাশ বাঘের মতো ডেকে ওঠে শিকার খুঁজে পেয়ে।

—কোথায় গেলে তুমি?

অন্ধের মতো তিতির উঠে অন্ধকার ঘরে ঘুরতে থাকে। ঘরের একধারটা ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টিতে বাতাসে। ঐ রন্ধ্রপথে বার বার বাহির চলে আসে ঘরের

মধ্যে। ঘরটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাইরে। আব্রু নষ্ট করে। অমিতকেও কি নিয়ে গেল ?

ককিয়ে কেঁদে ওঠে তিতির। ও একটু আগেই বলেছিল, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ওর চলে যেতে ভাল লাগে। তিতির ভীষণ চিৎকার করে বলে—এত তাড়াতাড়ি আমার সব কেড়ে নিও না। ওগো, কে তুমি বার বার আসো ঘরের মধ্যে ? দয়া করো।

মস্ত ঘরের এককোণে একটু ছোট্ট দেশলাই কাঠির তিনকোনা আগুন জ্বলে ওঠে। অমিত বলে—তিতির, আমিও তোমাকে খুঁজছি। এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দিয়েছো, দমবন্ধ লাগছিল, তাই একটা পাল্লা খুলে দিয়ে বসে আছি।

—ডাকোনি তো ! তিতির চোখ মুছে, কান্না গিলে হেসে ফেলে।

অমিত চুপ করে থাকে। তারপর বলে—সব সময়ে ডাকতে নেই তিতির। মানুষের মাঝে মাঝে একদম একা হওয়া দরকার। আমিও দেখ না, একা বসে ঝড় দেখছি কখন থেকে !

তিতির কাছে গিয়ে বলে—কেন গো ?

—ওঃ তিতির। কী প্রকাণ্ড এই আকাশ, কি বিরাট শূন্যতা চারদিকে। আর কি ভয়ঙ্কর শক্তিমান ঝড়। এ-সব দেখলে নিজেকে তুচ্ছ লাগে বড়। মাঝে মাঝে, নিজেকে তুচ্ছ ভাবতে কি যে আনন্দ হয় !

খানাতল্লাস

আসুন ইনস্পেকটার, আসুন !

বলতে কি, একটা জীবন আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করেছি। আপনি আসবেন, খানাতল্লাসিতে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবেন আমার সযত্নে সাজানো সংসার, আপনি এবং আপনার সেপাইদের বুটের আওয়াজে চমকে উঠবে আমার শিশু ছেলের ঘুম, আমার বৌ আর বোন কোণে লুকিয়ে কাঁপবে থরথর করে, আমার বুড়ো মা বাপ ইষ্টনাম জপ করবে, আমার ভাই অকারণ গ্রেফতারের ভয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালাবে। দৃশ্যটা আমি দেখতে চেয়েছিলাম। জানিই তো ইনস্পেকটর একদিন আসবেনই তাঁর দলবল নিয়ে। বড উৎকণ্ঠা ছিল, বড় ভয়। এই স্থায়ী ভয় থেকে পরিত্রাণ করতে আজ আপনি এলেন। যতদুর সম্ভব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যান আমার সংসার। এরপর আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। সুখীও।

আপনি লম্বা লোক, মাথাটা একটু নিচু করে আসুন। আমরা কেউ লম্বা নই বলে দরজাটা খুব উঁচু করে তৈরি করা হয় নি। জানেনই তো আমরা সব সাধারণ মানুষ, বেঁটেখাটো, আমাদের বড দরজার দরকার হয় না।

একমিনিট ইনস্পেকটর, আমার আগফা ক্লিক ক্যামেরায় আপনার একটা ছবি তুলে নিই !

না ? নিয়ম নেই ? তাহলে থাক। ক্যামেরাটা নিন, নিয়ে দেখুন, এর ভিতরে লুকোনো বোমা পিস্তল বা বিস্ফোরক নেই। ক্যামেরাই। তবে ফিল্ম, আছে কিনা বলতে পারব না ? ক্যামেরাটা 'আমার' বলে উল্লেখ করলাম, না ? আসলে তা নয়। এটা আমার এক মাসতুতো বোনের। সে খুব বড়লোকের বৌ ছিল। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না। তার স্বামীর আবার অন্য মেয়েছেলে ছিল। বিয়ের পর থেকেই আমার সেই বোন দুঃখী। বড কান্নাকাটি করত। সেই বোনই একবার নিমন্ত্রণে এ বাড়িতে এসে ক্যামেরাটা ফেলে যায় অন্যমনস্কতাবশত। সেই রাতে ফিরে গিয়েই টিক-কুড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করে। ক্যামেরাটা কেউ ফেরত নিতে আসে নি, আমরাও দিইনি। রয়ে গেছে। দিশী জিনিস, ভাল করে এর ট্রেডমার্কটা পরীক্ষা করতে পারেন। অন্তত এটা চোরাই আমদানি নয়।

আঃ, কি বিশাল চেহারা আপনার! আপনি যে রাজকর্মচারী তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ঠিক এরকমটাই আমি আশা করছিলাম। এরকম না হলে কি ইনস্পেকটরকে মানায়? আপনি যেমন লম্বা, তেমনি বিশাল আপনার কাঁধ, কি অসাধারণ আপনার দুটি দীর্ঘ ও সবল হাত! কি গম্ভীর আপনার পদক্ষেপ! আর কি অদ্ভুত তীব্রতা আপনার চোখে!

হ্যাঁ ইনস্পেকটর, এটাকেই বলতে পারেন আমাদের বাইরের ঘর। আপনি তো নিশ্চয়ই খবর রাখেন যে এটা আমার নিজের বাড়ি নয়? আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাড়া। একশ ত্রিশ টাকা, আর ইলেকট্রিক।

না, না, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা খুব লম্বা নই বলে দরজাটা উঁচু করে তৈরি করা হয় নি—এ কথার দ্বারা আমি কিন্তু এমন ইঙ্গিত করিনি যে বাড়িটা আমার বা আমাদের তৈরি। তা নয়। এখানে আমরা অর্থে আমরা সবাই। আমরা সবাই আজকাল বেঁটে মানুষ। যেমন আমি, তেমনি এ বাড়ির মালিক, তেমনি সব বাড়ির সবাই। ঢুকবার বা বেরোবার জন্য খুব বড দরজার দরকার হয় না আমাদের। আপনার মতো দীর্ঘকায় অতিথিও তো বড একটা আসে না আমাদের বাড়িতে।

হ্যাঁ, এটাই বাইরের ঘর। তবু বলি, মাত্র দু'খানা ঘর বলে এ ঘরটাকে আমরা এক্সক্লুসিভ করতে পারিনি। একাধারে ঐ যে চৌকি দেখছেন, ওখানে আমার বাবা আর মা শোয়। মেঝেতে আমার বোন। না, ভাই শোওয়ার জায়গা পায় না। সে রাত্রিবেলা এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকে। ভিতরের ঘরটায় আমরা স্বামী স্ত্রী, একটা ছোট্ট ছেলে। তবু এই ঘরটাই আমাদের বাইরের ঘর, কেউ এলে ঐ যে সব তুচ্ছ চেয়ার দেখছেন ওগুলোয় বসে, গল্প-টল্প করে। এটাকে ড্রইংরুম বলা কি অপরাধ ইনস্পেকটর?

ফুলদানির মধ্যে কি খুঁজছেন ইনস্পেকটর? ফুলগুলো? হা-হা। না, ওসব ফুল আমি রোজ কিনি না। কি করে কিনি বলুন? হ্যাঁ, এখনো টাটকা তাজা ও সৌরভে ভরপুর ঐ রজনীগন্ধা দেখে মোটেই ভাববেন না যে আমার রোজ ফুল কেনার পয়সা জোটে। বাড়তি পয়সা আমার মোটেই নেই। চুপি চুপি বলি ইনস্পেকটর, গতকাল আমাদের বিবাহ বার্ষিকী গেছে। না না, ওসব বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকী পালন করা আমাদের হয় না। কাউকে নিমন্ত্রণ করিনি, ফালতু উপহার কিনে পয়সাও নষ্ট করিনি, কেবল মায়াবশে স্মৃতিবিভ্রমে, ভাবপ্রবণতার দরুন একডজন ফুল কিনেছি। হে মহান ইনস্পেকটর, ক্ষমা করুন আমার এই হৃদয়দৌর্বল্য। না, সত্যিই আমাকে এসব মানায় না। ফুল

দিয়ে কি হয়? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। এ ফুল কেবল আমাদের বোকামির প্রতীক।

কিছু পেলেন ফুলদানির ভিতরে? না? আমিও জানতাম, কিছুই পাবেন না। ফুলগুলো ফেলে দিয়েছেন ছুঁড়ে। জল ঢেলে ফেলেছেন মেঝেয়, শূন্য ফুলদানিটা আছড়ে ফেলার জন্য হাত উদ্যত করেছেন, হে বৃহৎ, আপনাকেই এসব মানায়। চমৎকার। ফেলে দিন, লণ্ডভণ্ড করুন। আমি দেখি।

ঐ কৌটোটা? না ইনস্পেকটর, ওর মধ্যে কালো অন্ধকারে যা লুকোনো আছে তা নয় বুলেট বা বারুদ। ও হচ্ছে আমার মায়ের নামজপের মালা। দোহাই ইনস্পেকটর। বেডকভারটা তুলবেন না। ওর নিচে ছেঁড়া চাদর, তেলচিটে বালিশ।

তুললেন? হায় ঈশ্বর, আমি বরং দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকি। কি লজ্জা! ইনস্পেকটর, আপনি কি চাদর তুলে তোশকটাও দেখবেন? হায়। তবে আর লজ্জার কিছুই বাকি থাকবে না। কি করে তবে গোপন করব, ঐ প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো তোশকটাকে? ওর তুলোগুলো চাপ বেঁধে থাপে থাপে স্তূপ হয়ে আছে, ছেঁড়া টিকিনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে তুলো, ওর সারা দেহে চন্দ্রদেহের মতো খানাখন্দ।

না মহান, আমি কাঁদছি না। তবে আপনি বড় নিষ্ঠুর। কেন দেখলেন ওসব?

ঐ বাক্সটা? হা হা। না, ওটা নয় বেঁটে বন্দুক বা লম্বা পিস্তল। হাসির কথা, আমার বাবা একসময়ে বেহালা বাজাতেন। আপনি কি কখনো বেহালার বাক্স দেখেন নি? না, আমরা কেউ বেহালা বাজাতে জানি না। ওটা এমনি পড়ে আছে। দেখুন, ভাল করে দেখে নিন।

ফরেন মেড? আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বটে। তবে ওটাও সেই পঞ্চাশ বছর আগে বৃটিশ আমলে কেনা। তখনকার দিনে ওসব শৌখিন জিনিস বিদেশ থেকেই আসত। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ ক্ষুরটাও। বাবা ওটা দিয়ে দাড়ি কামান। অন্য কোনো কাজে লাগে না, বিশ্বাস করুন। না, এসব চোরাই চালানের নয়, স্মাগলিঙেরও নয়।

কালো টাকা?

হে বৃহৎ, হে প্রকাণ্ড, টেবিলের টানায় রাখা ঐ সাঁইত্রিশ টাকা বাট পয়সার কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? না ধর্মাবতার, ওটা কালো টাকা নয়, বরং ভীষণ রকমের সাদা টাকা। এত সাদা যে ওকে রক্তহীন ফ্যাকাসে টাকাও বলা যায়।

মাসের আরো ছ'দিন বাকি মহাত্মন, ও টাকার আয়ু আর কতক্ষণ? সেই অন্তিম মুহূর্তের ভয়ে ওরা ফ্যাকাসে হয়ে আছে দেখছেন না?

ঘট? আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর মধ্যে আমার স্ত্রী খুচরো পয়সা জমান। ভাঙুন ইনস্পেকটর, ভাঙুন। আমার স্ত্রী কোনোদিন আমাকে তার মাটির ঘট ছুঁতে দেয় না। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো চালাকি চলবে না। হে সর্বশক্তিমান, আপনি ঘটটা ভেঙে দেখুন তো কত জমিয়েছে আমার বৌ!

না, না, আপনাকে কষ্ট করে ঐ দুই তিন নয়া পয়সার খুচরো গুনতে হবে না। আন্দাজ করছি দু তিন টাকার বেশী নেই। তা এই দু-তিন টাকার মধ্যে একটা কালো টাকার ছায়া আছে। এটা প্রায় চুরির টাকা। ওটা আপনি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

এই নিন লোহার আলমারির চাবি। হা-হা মশাই, আলমারিটা আমার কিনা জিজ্ঞেস করছেন? না মহান, এই একটিমাত্র সত্যিকারের দামী জিনিস যা আমি বিয়েতে পেয়েছিলাম। এই স্টিলের আলমারি দিতে নারাজ হয়েছিলেন আমার গরীব শ্বশুর, তার ফলে আমার বিয়ে ভেঙে যায় আর কি! হা-হা। না, অবশেষে তিনি আলমারি দিতে রাজি হয়েছিলেন, বিয়েটাও হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

এই আমার আর আমার স্ত্রীর ঘর। কি দেখছেন শ্রদ্ধাস্পদ? প্লীজ, প্লীজ, ঐ বাঁশের চ্যাঙাড়িটা দেখবেন না। দোহাই আপনার, আমাদের মতো সামান্য মানুষেরও কিছু গুপ্ত জিনিস থাকে। বিপজ্জনক নয় মহাত্মন, লজ্জাজনক। পায়ে পড়ি, দেখবেন না।

লজ্জা ইনস্পেকটর, কি লজ্জা। ঐ বাঁশের চ্যাঙাড়ির মধ্যে থাকে কনট্রা-সেপটিভ। শ্রদ্ধাস্পদ, আমি আর আমার স্ত্রী যে উপগত হই—এটা কি লজ্জাজনক নয়? সবাই জানে, তবু কি লজ্জার! কেন দেখলেন ইনস্পেকটর? কেন দেখলেন? লজ্জায় আমি যে চোখ তুলতে পারছি না। ক্ষমা করুন মহাত্মন, আমাদের এই গোপনীয়তাটুকুর জন্য। আপনি তো ঈশ্বরের সমতুল, আমরা মানুষ মাত্র। জানি, আপনি এটুকু ক্ষমা করবেন। গরীবের অপরাধ।

আসছি ইনস্পেকটর, এক মিনিট। না, না, আমি স্ত্রীর সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্র করছি না। আমি তাকে বলছি, সে আপনার জন্য একটু চা করুক। করার দরকার নেই? যেমন আপনার আদেশ।

আলমারিতে সোনা পেয়েছেন ইনস্পেকটর? আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ, ওগুলো সোনার গয়নাই বটে। মোট পাঁচ ভরি। হার, দুল, আংটি, বোতাম মিলে মোট পাঁচ ভরি। এ ছাড়া আরো কয়েক ভরি আছে মায়ের বাক্সে,

সেসব মায়ের গয়না। আমাদের বাড়িতে মোট প্রায় দশ ভরি সোনার জিনিস আছে। হ্যাঁ ইনস্পেকটর, আমি অপরাধী। জানি মহাত্মন, ভারতবর্ষের শতকরা সত্তর ভাগ লোকেরই ঘরে দশ ভরি সোনা নেই। আমি সেই দুর্লভ শতকরা ত্রিশজনের একজন, যার ঘরে দশ ভরি—হ্যাঁ মহাত্মন—দশ ভরি সোনা আছে। বাজেয়াপ্ত করবেন ইনস্পেকটর? না? ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

আমার স্ত্রীকে দেখছেন ইনস্পেকটর? দেখুন, দেখুন। ওকে বহুকাল কেউ দেখে না। চেহারা এমনিতেও দেখনসই ছিল না, এখন আরো ভেঙে গেছে। না, বয়স খুব বেশী নয়। তবু ঐরকম। খুব সাদামাটা, রোগাভোগা। রাস্তায় বেরোলে কেউ তেমন লক্ষ্য করে না। বহুকাল পরে আপনিই এক পরপুরুষ যিনি ওকে লক্ষ্য করছেন। ও বড ভয় পেয়েছে, কাঁপছে। এমনিতে খুব কুঁদুলী, আমার সঙ্গে ভীষণ ঝগডা করে। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো চালাকি নয়। আপনি যে মহান, শক্তিমান, ভয়ঙ্কর। আপনার সামনে আমরা আমাদের অস্তিত্ব কার্পেটের মতো পেতে দিয়েছি ধুলায়।

ইনস্পেকটর, সাবধান! আমার এক বছর বয়সের ছেলের ঘুম ভেঙেছে। ঐ প্রচণ্ড হামা দিয়ে আসছে আপনার দিকে। কি সাহস। আপনার ভয়ঙ্কর স্তম্ভের মতো জানু ধরে ঐ ও উঠে দাঁড়াল। ইনস্পেকটর, ও যে আপনার কোমরের খাপে ভরা রিভলভারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে! ক্ষমা করুন, ইনস্পেকটর, ক্ষমা করুন। এ সাহস ওকে মানায় না। ন্যালা-ভোলা ছেলে। ক্ষমা করুন।

করেছেন? বাঁচা গেল।

না শ্রদ্ধাস্পদ, ঐ চিঠির বাণ্ডিলটা কোনো গুপ্ত কাগজপত্র নয়। তবে গোপনীয় বটে। বাচ্চা হতে আমার স্ত্রী কিছুকাল বাপের বাড়ি গিয়েছিল। তখন লিখেছিল। দেখবেন? হা-হা। দেখুন, আপনার কাছে লজ্জা কি? না দাদা, না। চিঠিতে যা লেখা আছে তা হল আবেগের কথা, বিশ্বাসের কথা, কিন্তু সত্যিই কি তাই? যেমন ধরুন এই লাইনটা—তোমাকেই যেন জন্ম-জন্মান্তরে স্বামী পাই—এ কথাটা কি সত্যি হতে পারে? পাগল! আমি তো ভেবেই পাই না, আমার মতো এত সাদামাটা অসফল লোককে আমার স্ত্রী বার বার কেন স্বামী হিসেবে চাইবে! এ তো যুক্তিতে আসে না শ্রদ্ধাস্পদ! ও সবই বানানো কথা। বলতে হয় বলে বলা, লিখবার রেওয়াজ আছে বলে লেখা। তবে, আমি মাঝে মাঝে বের করে পড়ি। বেশ লাগে। মনে হয়, সত্যিই বুঝি!

হ্যাঁ, এই যুবতী মেয়েটাই আমার বোন। না, সুন্দরী নয়। কোত্থেকে সুন্দরী হবে? সুন্দরের ঘরেই সুন্দর জন্মায়। আমরা অতি সাধারণ। তাই ও-

সুন্দরী নয় বটে। তবে যুবতী। ইচ্ছে হলে আপনি একটু তাকিয়ে থাকুন ওর দিকে। ও ধন্য হোক।

কিছু কি পেলেন শ্রদ্ধাস্পদ? আপনার ভ্রূ কোঁচকানো, মুখশ্রী গম্ভীর এবং চিন্তান্বিত। কিন্তু কি পেলেন মহান? ঐ তো ভাঙা ঘটের মাটির চাড়া ছড়িয়ে আছে খুচরো পয়সার সঙ্গে। ঐ পড়ে আছে ফুল, জল আর ফুলদানি। বিছানো ওলটানো বলে, বাক্স আলমারি খোলা বলে আমাদের সব ঢেকে রাখা ছেঁড়া আর ময়লা বেরিয়ে পড়েছে। প্রকট হয়েছে আমাদের তুচ্ছতা। তবু বলুন, কি পেলেন অবশেষে? কোন জিনিস বাজেয়াপ্ত করবেন ইনস্পেকটর?

আমার বুড়ো মা-বাবার ঘোলা চোখের মধ্যে তাকিয়ে কি খুঁজছেন আপনি? কি আছে ওখানে? কি খুঁজছেন আমার স্ত্রী আর বোনের চোখে? ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে? আমার ছেলের চোখেই বা কি আছে শ্রদ্ধাস্পদ? আমার চোখেও? বলুন, ইনস্পেকটর। বলুন!

আপনি ঘন শ্বাস ফেলে আপন মনে বললেন—পেয়েছি। শুনে আমার বুকের ভিতরটা কুয়োর মতো ফাঁকা হয়ে গেল। দোহাই, আমাকে আর রহস্যের মধ্যে রাখবেন না।

পেয়েছেন? ও হরি, ও তো সকলেরই থাকে শ্রদ্ধাস্পদ! আপনি পেয়েছেন আমাদের চোখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা। শ্রদ্ধাস্পদ, আমাদের যে আর কিছু নেই। এ সবই অবশ্য অবান্তর, বাজে জিনিস। এ সব তো বাজেয়াপ্ত করার উপযুক্তও নয়।

ইনস্পেকটর, ইনস্পেকটর, হে শ্রদ্ধাস্পদ, সর্বশক্তিমান, আমাদের এটুকু কেড়ে নেবেন না। আমাদের আর সব নিয়ে যান, বাজেয়াপ্ত করুন। আমাদের ভিখারির পোশাকে বের করে দিন রাস্তায়! দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের ওটুকু বাজেয়াপ্ত করবেন না। ইনস্পেকটর, ইনস্পেকটর···

ক্রিকেট

হরিবোল বুড়ো এসে ঐ বসে আছে শিমুল গাছের তলায়। নিষ্পত্র গাছ, তার ছায়া নেই। গাছের কঙ্কালসার হাতগুলি রোদের দিকে বাড়ানো, ঠিক কাঙাল ভিখিরির হাতেব মতো। শীতের শেষে যখন বসন্ত আসবে তখন তার হাত ভবে দেবে ফুলে। কে তার হাত ফুলে ভরে দেয় তা বোঝা যায় না। কিন্তু কেউ দেয়।

হরিবোল বুড়ো একা বসে আছে। ভারি অস্বস্তি তার। পাড়ার ছেলেগুলো এইবেলায় ধারে কাছে ডাংগুলি খেলে, সেগুলো আজ বেপাত্তা। কোথা গেল সব সোনার চাঁদ হাড়হাভাতেগুলো? গাছের ছায়া নেই, রোদ মুখে পড়েছে। তা এ রোদ বড় মিঠে, শীতের রোদ তো, কুসুম গরম।

পেয়াদা বগলাচরণ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হাঁক পেড়ে বলে—কে, হরিবোল খুড়ো নাকি? মাগতে বেরিয়েছো?

—বসে আছি বাবা। কিছু অন্যায় হয় নি তো?

—না, কি আর অন্যায় হবে! তবে বলি, ছোঁড়াগুলো যে হরিবোল বললেই তেড়ে মারতে যাও সেটা ঠিক হচ্ছে না। কবে কোন্‌টাকে জখম করবে, অমনি থানায় গিয়ে এত্তেলা করবে।

—আজ সারাদিন উপোস আছি বাবা, অত কথা ভিতরে সেঁধোচ্ছে না।

—উপোস আছো! বগলাচরণ দু-পা এগিয়ে কোমরে হাত রেখে বলে—সেটা কি রকম? গতকালই তো অধর ভট্‌চাজের শ্রাদ্ধে সিধে পেলে।

হরিবোল বুড়ো উদাস হয়ে বলে—ভাই, আমি সারাদিন খাইনি, আজ কেউ হরি বলে নি। তুমি একবার হরিবোল হরিবোল বল, তবেই আমার পেট পুরে যাবে, এই ভিক্ষা চাই।

—বটে! তবে এই বললুম, হরিবোল হরিবোল।

হাসতে হাসতে বগলাচরণ বিষয়কর্মে যায়।

উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে ইভান ওয়েলচ খুব নিরাসক্তভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। বোয়িং জেট বিমানটি আকাশ ছিঁড়ে ফেলছে শব্দে শব্দে। কিন্তু

ভিতরে কিছুই টের পাওয়া যায় না। অতি ক্ষীণ একটু থরথরানি, অতি মৃদু একটু গোঙানির আওয়াজ।

একটু আগেই কালো কফি খেয়েছে ইভান, একটু হুইস্কি মিশিয়ে। তবু বড ক্লান্তি লাগে। টোকিও থেকে সিঙ্গাপুর, দূরপ্রাচ্য, তারপর আবার ভারতের বম্বে শহর ছুঁয়ে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপের দিকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মস্ত প্রতিনিধি ইভানকে সারা পৃথিবী দৌড়ে বেড়াতে হয়। গোটা এক সপ্তাহেও তার বিশ্রাম নেই। আজ নিউইয়র্ক তো কাল হংকং, দুদিন বাদে মেলবোর্ন, তারপর বেইরুট কি বার্লিন। বড় ক্লান্ত। বোয়িং-এর গতিকে বড্ড কম বলে মনে হয় ইভানের। কনকর্ড বিমান চালু হলে আরও অনেক বেশী গতিতে উড়ে যাওয়া যাবে। তখন ইভান হয়তো আর একটু সময় পাবে বিশ্রামের। তার বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। খুবই শক্ত সমর্থ চেহারা। মাথায় প্রচণ্ড সব চিন্তা। সারা পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা যেন তার মাথার কমপিউটারে অনবরত ভরে দেওয়া হচ্ছে। পাশে বসা সেক্রেটারীকে ডিকটেশন দিচ্ছিল ইভান। একটু বাদেই মেসেজটা বম্বে থেকে টেলেক্স করতে হবে। জরুরী। তবু ইভান হঠাৎ থেমে গেল। জানালা দিয়ে দেখতে পেল, এক ধূসরতার ভিতরে সূর্যাস্ত ঘটছে। আকাশে খণ্ড মেঘ, নিচে একটা মাঠ। বিমান কিছু নিচু হয়ে যাচ্ছে। একপলকের জন্য ইভানের মনে হল, বহু নিচে লম্বা কয়েকটা গাছের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট আয়নার মতো জল চকচক করে উঠল। অতখানি মাঠ কত সহজে এক চকিত পলকে পার হয়ে গেল তার বিমান। পশ্চিমের দিকে সূর্য ডুবছিল, কিন্তু বিমানটি যেহেতু পশ্চিমেই যাচ্ছে সেইহেতু সূর্যাস্ত ঘটল না। বরং বিমানের উন্মাদ গতি সূর্যকে কয়েক ইঞ্চি ঊর্ধ্বাকাশে তুলে আনল যেন। ঝকঝকিয়ে উঠল রোদ। ইভানের জীবনে নিশ্চিত সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত কমই ঘটে। জাপানে একবার সূর্যোদয় দেখে সে আবার সিঙ্গাপুরে দ্বিতীয়বার সূর্যোদয় দেখছে একই দিনে। তার ওমেগা হাতঘড়ি সপ্তাহে সাতবার আন্তর্জাতিক সময়সীমা পার হয়।

খুব ক্লান্ত লাগছিল ইভানের। তার জীবনে বড অতৃপ্তি। সে যেমনটা চেয়েছিল জীবনটা ঠিক তেমনই হয়েছে। কি আশ্চর্য, সে যা চায় তাই মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে যায়। মেয়েমানুষ, টাকা, সম্মান, উচ্চপদ, কিছুই বাকি থাকে না। কে যেন তার জন্যে পৃথিবীময় এক ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে। তার স্বাস্থ্যও অফুরন্ত। সেই কারণেই কি এত অতৃপ্তি ?

ইভান ভাবল, এবার একদিন সে উপোস থেকে দেখবে। আর, সাতদিন মেয়েমানুষকে ছোঁবে না। আর, গ্রামের দিকে গিয়ে অনেকক্ষণ ঘাসের

উপর হেঁটে হেঁটে পোকামাকড় আর ফড়িং দেখবে। পাখির শিসের নকল করবে।

ইভান একটা শ্বাস ফেলে বলল—দেন ডেথ!

সেক্রেটারী এ কথাটাও ভুল করে টুকে নিয়ে চমকে বলল—ইয়েস মিস্টার ওয়েলচ? হোয়াট অ্যাবাউট ডেথ?

ইভান সেক্রেটারীর ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ হেসে ফেলল। এত হাসল যে তার চোখে জল এসে গেল। হাসতে হাসতে কাশি এল। কাশতে কাশতে রক্তাভ হয়ে গেল মুখ। পাঁচ ডলার দামের রুমালে মুখ চেপে সে বেদম হচ্ছিল। হোসটেস ছুটে এল।

ইভান হাত তুলে তাদের নিবৃত্ত করে নাক ঝাড়লো জোরে। সামলে নিয়ে সেক্রেটারীকে বলল—আই জাস্ট্ থট্ অ্যালাউড।

ইভান মনশ্চক্ষে একটু আগে দেখা ধূসর মাঠটাকে আবার যেন দেখতে পেল। মাঠটা দেখেই কি হঠাৎ মৃত্যুর কথা মনে এল তার।

সেক্রেটারী ডেথ কথাটা কেটে দিল।

ন'পাড়ার অবস্থা ভাল নয়। ধানভাসি বান এসেছিল এবার। দশ দিন ঠায় জল দাঁড়িয়ে রইল মাঠে আহাম্মকের মতো। ধান পচে গোবর। ছোট্ট জায়গার ছোট্ট মানুষ সব, কে তাদের খবর রাখে।

হাতে মাথায় পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে একটা পরিবার উদোম মাঠটা পেরোচ্ছে পিঁপড়ের মতো। গোটা দুই দুরকম বয়সী বৌ, ছ-রকম বয়সের ছ'টা ছেলেমেয়ে, তিনটে এক বয়সী বুড়ি, একটা বুড়ো, তিনটে মরদ।

শঙ্খচূড় সাপের খোলস সজনের ডালে লটকে আছে। বানের সময় ঐ অত উঁচুতে উঠেছিল সাপটা। একটা ছেলে ঢেলা মারল। পাতলা কাগজের মতো খোলসটা হাওয়ায় উড়ছে ফুরফুর করে। ঢেলাটা লাগল বটে, খোলসটা পড়ল না। ঢেলাটা বুরুশ করে চলে গেল।

এক বৌয়ের দশমেসে পেট। সে বলল—আস্তে চলো।

তার বর থেমে একটু মুখ ঘুরিয়ে দেখে নেয়। বলল—বাবুদের রেলগাড়ি কি তোর মতো চাষানীর জন্য বসে থাকবে নাকি!

—না থাকল। এখানে পড়ে থাকব কোথাও। তোমরা যাও।

—অত টিসকোতে টিসকোতে হাঁটিস না। কদমের আর একটু জোর কর।

বৌটা বলে—পারব না।

—পোঁটলাটা আমার হাতে দে।

—তোমার তো আরো পুঁটলি আছে, নেবে কোথায়। হাত দুটো বই তো নয়।

—পারব।

মরদটার তেমন জোরবল নেই, কাঁকলাশের মতো চেহারা। তবু কোত্থেকে যেন তিন নম্বর আর একটা হাত বের করে পোঁটলাটা নিয়ে নিল। গলাটা চেপে বলল—পেটের বোঝাটা ব ঠিকমতো।

অপরূপ এক বিকেলবেলা চারধারে। কোদালে মেঘের চাপগুলো চুন হলুদ রঙ মেখে পশ্চিমের আকাশে ছয়লাপ হয়ে আছে। রূপকথার রাঙা আলোয় চারধারে স্বপ্নের মতো জগৎ। শিশুরা এই সৌন্দর্যের মধ্যে চেঁচিয়ে কথা বলে। বড়রা গম্ভীর, চুপ। রোদে পোড়া গাছপালার বন্য গন্ধ আসছে। এ সময়ে একটা বিশাল উড়োজাহাজ ঝুম্ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সবাই হাঁ করে দেখে একটু। কারা যায় ঐসব কলের পাখি করে?

পেটে খিদে মরে গিয়ে একটা গোঁতলানি এল গর্ভবতী বৌটির। বুক চেপে সে মাঠের মধ্যে বসে পড়ে। তার পেট থেকে অয়াক তুলে কেবল জল বেরিয়ে আসে।

এখানে কিছু তালগাছের জড়াজড়ি। তার মাঝখানে ছোট্ট একটু পুকুর। জল শুকিয়ে অনেকখানি কাদাজমি বেরিয়ে আছে দাঁতের মাঢ়ীর মতো। মাঝখানে ছোট্ট একটু জলের চাকতি। বৌয়ের বরটা কাদামাটির ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে নামছিল। চারধারে পাখিরা ক্যাচাল করছে। পোকামাকড়ের শব্দ। নিথর জলের কাছে এসে লোকটা ঘটি ডোবানোর আগে স্থির জলে নিজের ভুতুড়ে মুখের ছায়া দেখল। এ মুখ একটা মুখ মাত্র। মানুষের মুখ বলে বোঝা যায় ঠাহর করলে। ঘটিটা ডোবাতেই হিজিবিজি হয়ে শতখান হয়ে গেল মুখখানা। লোকটা বলল—যা শেষ হয়ে যা!

মেলবোর্নের ক্রিকেট মাঠের এখন রাত্রি। অনেকক্ষণ আগে দিনের খেলা শেষ হয়ে গেছে। শূন্য স্টেডিয়াম, অন্ধকার মাঠ, কেউ কোথাও নেই। শুধু একজন তরুণ কোন ফাঁকে এসে মাঠে ঢুকেছে। প্যাভিলিয়নের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সে অস্থির হাতে একটা সিগারেট ধরল। আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। মৃদু বাতাস।

ছেলেটা মাঠের সীমানার ধারে সামনে পা ছড়িয়ে বসল। তার চোখে জল। জীবনের প্রথম টেস্টম্যাচ খেলতে নেমেছিল সে। প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়ে যায়। ড্রেসিংরুমে ফিরে এলে ক্যাপটেন পিঠ চাপড়ে বলেছিল—বব, ঘাবড়াবার কিছু নেই। সেকেণ্ড ইনিংসে সেঞ্চুরী করবে।

দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমেছিল আজ লাঞ্চ-এর পর। তার প্রেমিকা জ্যানেট স্ট্যাণ্ডে বসে খেলা দেখছে। দেখছে মা বাবা বন্ধুরা। নতুন টেস্ট খেলোয়াড়ের জন্ম দেখছে লক্ষ দর্শক, স্টেডিয়ামে বা টি ভি-তে।

তার খেলা দেখে সকলেই বলত—এ হবে দ্বিতীয় ব্র্যাডম্যান।

ছেলেটিরও তাই বিশ্বাস ছিল। জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সে ভেবেছিল, আর পিছু ফিরে তাকানোর কিছু নেই।

দ্বিতীয় ইনিংস সে শুরুও করেছিল ভাল। প্রথম চার ওভারে তিনটে চার আর দুটো এক রান। বেশ ভাল শুরু। আধঘণ্টা সে ক্রিজে চমৎকার অবস্থান করছিল। তারপরই একটা বল এল লেগ-স্ট্যাম্পের ওপর। মনে হয়েছিল সহজ বল, সুইপ করলে স্কোয়ার লেগ দিয়ে সীমানা পার হবে। করেওছিল সুইপ। কিন্তু ভুতুড়ে বলটা হঠাৎ পীচ থেকে ওপরে না উঠে মাথা নিচু করে মিডল্‌স্ট্যাম্পের দিকে সরে এল। আর তখন স্ট্যাম্প আড়াল করে রয়েছে তার ডান পা। পায়ে বলটা লাগতেই চারদিকে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে বিপক্ষের খেলোয়াড় —হাও! আম্পায়ার বিনা দ্বিধায় আঙুল তোলে। ছেলেটি আম্পায়ারের দিকে তাকায়ও নি। সে জানত আউট হয়ে গেছে সে। যখন সে প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরে আসছিল তখন কেউ হা-হুতাশ করে নি, হাততালিও দেয় নি। শুধু একটা চ্যাংড়া ছেলে একদলা চুইংগাম ছুঁড়ে মেরেছিল তাকে, সেটা এসে তার বুকে আটকে যায়।

ড্রেসিংরুমে দু-একজন তাকে স্তোক দিয়েছিল। ছেলেটি কিছুই শুনতে পায় নি। ড্রেসিংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে তরুণী জ্যানেট কাঁদছিল। ছেলেটির বাবা একবার ঘরে এসে তার পিঠে হাত রেখে নীরবে বসে থেকে গেল কিছুক্ষণ। গভীর রাতে হোটেল থেকে চুপিচুপি চলে এসেছে ছেলেটি, মেলবোর্নের অন্ধকার ক্রিকেট মাঠে বসে আছে।

আকাশে একটা তারা খসল।

সিগারেট শেষ হয়ে গেল।

এই মাঠে কাল তারা অবশ্যই হেরে যাবে। হাতে মোট দুটো উইকেট আছে, তুলতে হবে আরো দুশো রান। ছেলেটির ওপর বড় নির্ভর ছিল দলের। সে পারে নি।

ছেলেটা দেখল, অন্ধকার স্টেডিয়ামে লক্ষ লক্ষ ভূত বসে তাকে দেখছে আর খুব হাসছে। তারা তাদের দীর্ঘ হাত নেড়ে তাকে বাহবা দিচ্ছে।

ছেলেটা মাথা নিচু করে বসে রইল। চোখে জলের ধারা। মনে হল, তার আজকের দুঃখ আর কোনোদিনই ঘুচবে না। এইখানেই তার জীবন শেষ হয়ে গেল।

উড়োজাহাজ বম্বেতে নামল। ইভান দেখল, এখনো সমুদ্রের ওপর অন্ধকার আকাশে বুঝি সূর্যের খুব ক্ষীণ একটা রেশ রয়ে গেছে। কিংবা মনের ভুল।

এখানে কয়েকঘণ্টা বিশ্রাম। ইভান প্লেন থেকে নামতে না নামতেই প্রোটোকল শুরু হয়ে যায়। লোকজন ঘিরে ধরে তাকে। অনবরত ক্যামেরার ফ্ল্যাশ চমকাচ্ছে। সিকিউরিটি দু পাশ থেকে তাকে চেপে ধরে। অনবরত তাকে শেকহ্যাণ্ড করতে হয়। অনেক লোকের সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে পরিচিত হতে থাকে সে।

ভি আই পি লাউঞ্জে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরে তাকে। অনর্গল ইজরায়েল, আরব দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, চীন আর ইউরোপ সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হতে থাকে তাকে।

ইভান রাষ্ট্রসঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি, বিশ্ব শান্তির অন্যতম দূত। সব উত্তরই তার জানা আছে। সে যন্ত্রের মতো উত্তর দিতে থাকে। তার দক্ষ সেক্রেটারী পাশেই বশংবদ বসে থেকে অবিরল তাকে নানা পরিসংখ্যান বলে দিতে থাকে।

নানা কথার মধ্যে ইভান কেবল বলে—আমরা শান্তি চাই, আমরা ক্ষুধার নিবৃত্তি চাই, আমরা চাই অভাবমোচন, স্বাধীনতা। আমরা মানুষকে সব রকম অভাব থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর।

বলতে বলতে ক্লান্ত ইভান টের পায়, সে কতবার জীবনে এইসব কথা বলেছে। আজও বলছে। কিন্তু আজ তার ভিতরটা যেন এক জনশূন্য হলঘরের মতো ফাঁকা। সে যখন মুখে 'শান্তি, শান্তি' বলছে তখন তার ভিতরের হলঘর থেকে প্রতিধ্বনি বলছে—মৃত্যু, মৃত্যু।

কেন বলছে? ইভান খুবই অবসাদ বোধ করে। তার কোনো অভাব নেই, ব্যক্তিগত কিছুই আর চাওয়ার নেই, সেই জন্যই কি অবসাদ? ইভান মুখে

চমৎকার সব উত্তর দিয়ে যাচ্ছে আর তখন তার মন তাকে বলছে—বাস্টার্ড, ইউ বাস্টার্ড, ইউ হ্যাভ ডান এনাফ টু মেক হেল্। নাউ ডাই। প্লীজ।

ইভান ভাবে, সে এবার একদিন কি দুদিন উপোস করে থেকে দেখবে ক্ষুধা কাকে বলে। সে সাতদিন মেয়েমানুষের শরীর ছোঁবে না। সে একদিন দূর কোনো দরিদ্র দেশের গ্রামের পথে পথে হেঁটে বেড়াবে যেমন হাঁটত মিশনারীরা। সেই প্লেন থেকে দেখা ধূসর মাঠটায় সে কোনোদিন যেতে পারবে কি?

শেষবেলায় ওয়াক তুলে সেই যে বমি করছিল বৌটি তারপরই তার গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়েছিল।

সূর্য ডুবে গেলে নিঝুম হিম নেমে এল চারধারে। এতক্ষণ তারা দীর্ঘ পথ হেঁটেছে রোদে, তাই শীত গায়ে লাগে নি। কিন্তু এখন বৌটিকে ঘিরে যখন তারা উদাস মাঠের মাঝখানে বসে আছে তখন গভীর শীতে সবাই ঠকঠক করে কাঁপে। পেটে প্রকাণ্ড অন্ধকার খিদে, দেহে তুচ্ছ আবরণ। বৌটা গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

মাঠ পেরিয়ে একটা পাগল লোক এল এ সময়ে। তাদের কাছে এসে বলল—বাবারা, সারাদিন খাওয়া জোটে না আমার। তোমরা একবার হরিবোল হরিবোল বল, আমার পেট পুরে যাবে। এই ভিক্ষা চাই।

অবোধ লোকগুলি তার দিকে চেয়ে থাকে কেবল। তারা ভাষা ভুলে গেছে। কথা আসে না মুখে।

শুধু তাদের দলের সবচেয়ে প্রবীণ লোকটি বলে—আমরা বড় কাঙাল। কিছু নাই। হরির নাম নিতে পারি, আর কিছু চেয়ো না।

—তাই বল বাবা। তারপর চলো, দুনিয়াটা দখল করি।

সবাই হাসল। দুঃখে, শোকে।

মেলবোর্নের ছোকরা ক্রিকেট খেলোয়াড়টি ঘাসের ওপর শুয়েছিল। জ্যানেট তাকে আর ভালবাসবে কি? টেস্ট খেলতে আর কখনো তাকে ডাকা হবে কি? সে নিজেও কি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে?

শুয়ে থেকে সে টের পায় অন্ধকার স্টেডিয়াম থেকে ভূতেরা নেমে আসছে। তাদের দীর্ঘ কালো শরীর বাতাসে দোল খায়। বাতাসে লতিয়ে লতিয়ে তারা চলে। অন্ধকারে হাজার হাজার ভূত এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা তার কানে কানে বলল—চলো, খেলবে।

চোখের জল মুছে ছেলেটি ওঠে। ভূতেরা তাকে প্যাড পরায়, গ্লাভস পরায়, হাতে ব্যাট ধরিয়ে দেয়। তারপর মহানন্দে হাততালি দেয় তারা।

ছেলেটি পীচের ওপর এসে স্ট্যানস নেয়। অন্ধকারে দেখা যায় আম্পায়ারের বদলে কেবল টুপি আর সাদা কোট দাঁড়িয়ে আছে। একটা ভূত এশিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে একটা নরমুণ্ড ছিঁড়ে আনে, তারপর দৌড়ে এসে বল করার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দেয় তার দিকে। ছেলেটা চমৎকার একটা কাট মারে, মুণ্ডুটা ছিটকে যায় মহাকাশে। মহারোল ওঠে চারধারে, হর্ষধ্বনি শোনা যায়। আবার আফ্রিকার দিকে হাত বাড়িয়ে একটা নরমুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে আর একজন দৌড়ে আসে।

এই রকমভাবে খেলা চলে আর চলে। এ খেলা আর শেষ হতে চায় না। যেন অনন্তকাল, ধরে এই শেষহীন খেলা চলবেই। সে কোনোদিন আউট হবে না।

ছেলেটির আর দুঃখ থাকে না।

অনেক রাতে একটা গোয়ালঘরের মেঝের খড়ের ওপর গর্ভবতী বৌটি এক নির্জীব শিশু ছেলেকে প্রসব করছে। জন্মের পর ছেলেরা কাঁদে, এ শিশুটিও কাঁদল। কিন্তু উপোসী মার শুষ্ক গর্ভ থেকে সে সামান্যই জীবনীশক্তি আনতে পেরেছে, তাই তার অতিক্ষীণ কান্নার আওয়াজ তার মাও শুনতে পেল না।

সে মুমূর্ষু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—ও দিদি, বেঁচে আছে তো!

বাইরে বিপুল অন্ধকার। পুরুষেরা বাইরে বসে আছে হাঁ করে। আজ তাদের রেলগাড়ি করে শহরে যাওয়া হল না। কবে হবে কে জানে! আর একটা পেট বাড়ল।

অনেকদিন আগে এরকমই মাঠের মধ্যে গোয়ালঘরে, শীত রাতে কে যেন জন্মেছিলেন, হরিবোল বুড়ো শুনেছে। তিনি কোনো সন্ত পুরুষ, ঈশ্বরের সন্তান।

আকাশে একটা তারা খসল। হরিবোল বুড়ো আস্তে আস্তে গোয়ালঘর প্রদক্ষিণ করতে থাকে। পায়ের নিচে ঘাস, আশেপাশে গাছগাছালির ডালপালা গায়ে লাগে। হরিবোল বুড়ো গাছগাছালি আর ঘাসদের উদ্দেশ করে বার বার বলে—আহা, লাগল বাবা? ব্যথা পেলে? ঘুম ভেঙে গেল বাবারা সব। একবার হরিবোল হরিবোল হরিবোল বল সব, কাঙালের খোকাটার পেট ভরে যাক। খোকাটা একটু কাঁদুক।

ভেলা

বিশ শো পঁচাত্তর সালের ফেব্রুআরি মাসের এক সকালে আচমকা কোকিলের ডাক শোনা গেল।

ধরিত্রী তার দুশো তলার ওপরকার ফ্ল্যাটের ঘরদোর পরিষ্কার করছিল। তার হাতে একটা টর্চের মতো ছোট যন্ত্র। সুইচ টিপলে যন্ত্র থেকে একটা অত্যন্ত ফিকে বেগুনী প্রায় অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসে। সেই রশ্মি চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেললেই ঘর পবিষ্কার হয়ে যায়, জীবাণু থাকে না। ঘর জীবাণুমুক্ত করার পর দেয়ালে একটা সুইচ টিপল ধরিত্রী। কোনো শব্দ হল না, কিন্তু ছাদের গায়ে লাগানো মৌচাকের মতো একটা যন্ত্র জীবন্ত হয়ে উঠল ঠিকই। দুশো তলার ওপরে বন্ধ ফ্ল্যাটে কোনো ধুলো বালি নেই। তবু ঐ যন্ত্রটা তার প্রবল বায়বীয় প্রশ্বাসে ঘরের যাবতীয় সুক্ষ্ম ধুলো ময়লা টেনে নিতে লাগল।

এইসব ঘরের কাজ শেষ করে ধরিত্রী তাদের খাওয়ার ঘরে এল। খাওয়ার ঘরের উত্তরদিকে দুটো দরজা। একটা দরজা ধরিত্রী হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্র সরে গেল দেয়ালের মধ্যে। ওপাশে অবিরল একটা কনভেয়ার বেল্ট বয়ে যাচ্ছে। খুব ধীর তার গতি। তার ওপর থরে থরে খাবার সাজানো। যা খুশী তুলে নেওয়া যায়। একরাশ ডিম চলে গেল, এক ঢিবি মাখন, কিছু আপেল—একটার পর একটা। ধরিত্রী খুব বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে রইল। অন্তহীন খাবার বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনোটাই তার ছুঁতে ইচ্ছে করল না। দরজাটা বন্ধ করে সে দ্বিতীয় দরজাটা খুলল। দরজার ওপাশে অগাধ শূন্যতা, দুশো তলার ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত একটা ভারী বাতাস থম ধরে আছে। ধরিত্রী একটু ঝুঁকে চারদিকে তাকাল। জলে যেমন নৌকো ভাসে তেমনি বাতাসে ইতস্তত কিছু ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই বাতাসী ভেলার একটা খুব কাছ দিয়েই ভেসে যাচ্ছিল, তাতে এক বুড়ো হালের মতো একটা যন্ত্রের হাতল ধরে বসে আছে। লোকটা একবার ধরিত্রীর দিকে উদাস চোখে তাকাল। ধরিত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

লোকটা হাতলটায় সামান্য চাপ দিতেই ভেলাটা মুখ ঘুরিয়ে ভেসে এল ধরিত্রীর দিকে। ব্যাটারিচালিত ভেলাটায় কোনো শব্দ নেই। নিঃশব্দে স্থির হয়ে হালকা ধাতুর তৈরি সাদা গোল লাইফ বেল্টের মতো দেখতে যানটি দরজার গায়ে লেগে রইল।

বুড়ো লোকটা কথা বলল না, ধরিত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসল মাত্র। খুব নিরাবেগ হাসি।

ধরিত্রী বলল—আমার কিছু ফুল দরকার। আসল ফুল।

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপব একটু ভাবী গলায় বলল—কোন ঋতুব ফুল?

ধবিত্রী একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল—এটা তো বসন্তকাল।

লোকটা মাথা নাড়ল—হ্যাঁ।

—তাহলে বসন্তেব ফুল। কিন্তু আসল ফুল, সিন্থেটিক নয়।

লোকটা হাসল। মাথা নাড়ল। বলল—আমি আসল ফুল জানি। আমি তো উনিশশো পঁচাত্তরের লোক।

ধবিত্রী সামান্য কৌতূহলেব সঙ্গে বলল—তাই নাকি। তাহলে তো বেশ পুবোনো হয়েছেন।

—হ্যাঁ। লোকটা মাথা নেড়ে বলে—আমাব চাববাব মৃত্যু হয়েছে। আমাব হৃদ্‌যন্ত্র, চোখ, ফুসফুস আব লিভাব সব ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা। মেডিক্যাল বোর্ড থেকে নোটিশ দিয়েছে, আমার ব্রেনটাও এবাব ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করতে হবে। যদি সেটা করতে হয় তবে আমাব সব শৈশবস্মৃতি চলে যাবে। আশি নব্বই বছর আগেকার কোনো কিছুই মনে থাকবে না। এমন কি আমার আত্মপবিচয় পর্যন্ত পালটে যাবে। আমি নতুন মানুষ হয়ে যাবো।

ধরিত্রী একটু দুঃখিত হল। লোকটা ভাবপ্রবণ, তাই পুবোনো কথা সব ধবে রাখতে চায়। বলল—উপায় কি বলুন।

লোকটা মাথা নাড়ল, বলল—না, উপায় নেই। কিন্তু তখন আর আসল ফুল কাকে বলে তা বুঝতেই পারব না হয়তো। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফুল পেয়ে যাবেন।

লোকটা হাতলটা বুকের কাছে ধবে চাপ দিল। ভেলাটা উল্কার মতো ছিটকে বাতাসে মিলিয়ে গেল। ধরিত্রী ঝুঁকে লোকটার গতিপথ লক্ষ্য করতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না। দরজায় কোনো চৌকাঠ বা হাতল নেই যে ধববে। ভারসাম্য হাবিয়ে পিছলে দরজার বাইরে শূন্যতায় পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ের কিছু ছিল না। এখানে ভাবী কৃত্রিম বাতাসে আর কমিয়ে রাখা মাধ্যাকর্ষণে কেউ খুব জোরে পড়ে না। ধবিত্রীও পড়ল না। মাত্র তার ফ্ল্যাট থেকে দুতলা পর্যন্ত নিচে ধীরে ধীরে পড়ে গিয়েছিল সে। একটা বাতাসী ভেলা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিল। এ ভেলায় একজন যুবক রয়েছে। সে একটু হেসে বলল—কি হয়েছিল?

ধরিত্রী হেসে বলল—হঠাৎ।

যুবকটি মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ভেলাগুলো চমৎকার লাইফ বেল্টের মতো দেখতে হলেও মাঝখানটা ফাঁকা নয়, সেখানে একটা বাটির মতো আধার লাগানো। আর চমৎকার নরম কুশনের তৈরি বসবার জায়গা। ধরিত্রী বসল। ভেলাটা ধীরে ধীরে তার ফ্ল্যাটের দরজায় তুলে দিল তাকে। আর তখনই ধরিত্রী কোকিলের ডাক শুনতে পেল। একটা দুটো কোকিল ডাকছে। ধরিত্রী আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য দেখা যাচ্ছে, আকাশের নীল প্রতিভাত। কিন্তু সবই দেখা যাচ্ছে একটা অতি স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসের ডোম-এর ভিতর দিয়ে। শহরের সিকি মাইল উঁচুতে ফাইবার গ্লাসের ঢাকনিটা রয়েছে। তাই বাইরের আবহাওয়া কিছুতেই বোঝা যায় না। ঝড় বৃষ্টি টের পাওয়া যায় না। অবশ্য তবু চাঁদ সূর্য তারা দেখা যায়। সবই পরিস্রুত হয়ে আসে। কোনো ক্ষতিকারক মহাজাগতিক রশ্মি এখানে প্রবেশ করতে পারে না, কোনো চৌম্বক ঝড় অলক্ষ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। সব বড় শহরই ওই ফাইবার গ্লাসের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা।

তবু শীত বসন্ত সবই টের পাওয়া যায়। একটা পরোক্ষ আবহনিয়ন্ত্রক যন্ত্র দিয়ে শহরের আবহাওয়া যথাসাধ্য প্রাকৃতিক রাখা হয়। এমন কি বর্ষায় কখনো কখনো বৃষ্টিপাতও করানো হয়ে থাকে।

কোকিলের ডাক শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল ধরিত্রী। ভেলা থেকে নামতে গিয়েও একটু থমকে রইল সে। একটা কোকিল উড়ে এসে ভেলার ওপর বসেছে। ধরিত্রী হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। কোকিলটা মুখ তুলে তাকে বধির করে দিয়ে ডাকতে লাগল। ধরিত্রী পাখিটার দিকে চেয়ে হাসে। পলিথিন আর কৃত্রিম পশম দিয়ে তৈরি এই সব পাখির পেটে যন্ত্র, বুকে ব্যাটারি, মুখে খুদে স্পিকার বসানো। রিমোট কন্ট্রোল বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রের সাহায্যে এই সব পাখিকে ওড়ানো হয়, ডাকানো হয়। কারণ, অধিকাংশ পাখির প্রজাতিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবু মানুষকে প্রাকৃতিক স্পর্শ থেকে বঞ্চিত না রাখার জন্যই এই সব ব্যবস্থা। নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় চমৎকার রাস্তাঘাটের পাশে গাছের সারি। পার্কে সবুজ ঘাস। ওখানে যে কিছু আসল গাছ নেই তা নয়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শহরের যে ভিত তৈরি করতে হয়েছে তাতে গাছ জন্মানো দুষ্কর। তাই শতকরা নব্বই ভাগ গাছই কৃত্রিম। রবার পলিথিন বা ফাইবার গ্লাসের তৈরি। ঘাসও কৃত্রিম। তবু এক যান্ত্রিক কৌশলে ওই সব কৃত্রিম গাছে চমৎকার সব কৃত্রিম মরশুমি ফুল হয়। ফল

ফলে। হুবহু আসলের মতো। সেই সব ফুল গন্ধময়, ফল সুস্বাদু। শহরে বসন্তকাল এল।

ভেলা ছেড়ে ধরিত্রী উঠে এল ঘরে। দরজা বন্ধ করে চলে এল শোওয়ার ঘর পার হয়ে তাদের বসবার ঘরে। সেখানে চল্লিশ বছর বয়স্ক বিপুল নামে ব্যক্তিটি বসে আছে। তার মাথায় একটা হেডফোনের মতো যন্ত্র লাগানো। না, যন্ত্রটা কানে লাগাতে হয় না। একটা স্প্রিংয়ে ছোট্ট একটা পিন লাগানো, সেটা ডান কানের ওপরে মাথায় আলতোভাবে স্পর্শ করে থাকে। আর ওই পিনটা পৃথিবীর যাবতীয় খবরের তরঙ্গ মাথার ভিতরে নিঃশব্দে সঞ্চার করে দিতে থাকে। যন্ত্রটার আসল নাম ইনফর্মেশন পিন, সংক্ষেপে ইন্ পিন। খবরের কাগজ পড়ে বা রেডিও শুনে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। চোখ এবং কানকে অন্য কাজে ব্যস্ত রেখেও নিঃশব্দে এবং বিনা আয়াসে, প্রায় অজান্তে মস্তিষ্কের কোষে সব খবর জমা হয়ে যায়। ইন্ পিন হচ্ছে ইন্দ্রিয়মুক্তির যন্ত্র। চোখ কানকে মুক্ত রেখেই সব জানা যায়।

ধরিত্রীকে দেখে বিপুল যন্ত্রটা খুলে রাখল।

ধরিত্রী মৃদু গলায় বলল—আমি কিছু আসল ফুল আনতে ভেলা পাঠিয়েছি।

বিপুল কিছু অন্যমনস্ক ছিল, বলল—আসল ফুল! কেন?

—বাঃ, আজ যে পনেরোই ফেব্রুআরি। আজ যে আমাদের—

এইটুকু বলল ধরিত্রী, আর বলল না। বিপুল বুঝল। ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে রইল ধরিত্রীর দিকে। তার চোখে মুখে সব সময়ে একটা নিস্তব্ধ উত্তেজিত ভাব। বিপুল ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলে—ধরিত্রী ভেলাওলাকে বলো নি তো যে আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী!

ভয়ার্ত ধরিত্রী বলল—না না। তাই কি বলতে পারি! তারপর ধরিত্রী একটু চুপ করে থেকে বলে—অবশ্য লোকটা আসল ফুল চাই শুনে একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু ভয় নেই, এ লোকটার উনিশ শো পঁচাত্তর সালে জন্ম। শরীরে অনেকগুলো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। এ লোকটা সন্দেহ করলেও ক্ষতিকর কিছু বলে বেড়াবে না। ও তো মানুষের বিয়ে দেখেছে এককালে। ওর মা বাবারও বিয়ে হয়েছিল। হয়তো ওর নিজেরও।

বিপুল উত্তর দিল না। উঠে জানলার কাছে এল। জানলা প্রায় সব সময়েই খোলা থাকে। একটা দূরবীন তুলে বিপুল নিচেটা দেখতে লাগল। পার্কে কিছু নগ্ন নারী পুরুষ এখানে সেখানে বসে আছে। কাছেই বাচ্চারা খেলছে। একটি

রমণী কেবলমাত্র একজোড়া স্কেটিং জুতোর মতো জুতো পায়ে চলে যাচ্ছে। ফুটপাথ চলন্ত। রমণীটি তবু সেই চলন্ত ফুটপাথের ওপর দিয়ে আরো জোরে যাচ্ছে। জুতো জোড়া ইলেকট্রনিক শক্তিতে চলে। রমণীটি হাসছে, চিৎকার করে পথচারীদের কি যেন বলছে। কি বলছে তা অবশ্য বিপুল জানে। ও বলছে—শরীর নেবে? শরীর! পার্কের কাছে এক প্রৌঢ় সেই রমণীটিকে ধরে পার্কের মধ্যে নিয়ে গেল। বিপুল দূরবীন রেখে ঘরের মধ্যে সরে এল।

উনিশ শো নিরানব্বই সালে এই যৌন-বিপ্লবের শুরু। প্রাচীনপন্থীরা এই মুক্তমিলনে বাধা দিতে চেয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছিল লড়াই। বিবাহের সঙ্গে বিবাহহীনতার। তারপর একখানা রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ শো উনপঞ্চাশ সালে বিবাহ নিষিদ্ধ করলেন। পবিত্র যৌন-বিপ্লব স্বীকৃতি পেল ইতিহাসে। শুধু তাই নয়, নরনারীর দীর্ঘকালীন একসঙ্গে বসবাসও কার্যত নিষিদ্ধ। কোনোখানে নর বা নারীর মধ্যে দখলদারি প্রবৃত্তি দেখলে তাকে শাস্তিদানের আওতায় আনারও চেষ্টা চলছে।

বিপুল বলল—আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি, না ধরিত্রী?

—হ্যাঁ।

বিপুল একটা ছোট্ট বোতাম টিপল। বসবার ঘরে আর শোওয়ার ঘরের মাঝখানের অস্বচ্ছ কাচের পাতলা দেয়ালটা নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল মেঝের মধ্যে। ফলে দুই ঘর মিলে একটা বিশাল হলঘরের সৃষ্টি হল। বিপুল পায়চারি করতে লাগল। একবার থেমে বসবার ঘরের দেয়ালে একটা চৌখুপির মধ্যে বসানো ট্যাপ থেকে এক পাত্র গরম সবুজ চা ভরে নিল পেয়ালায়। খানিকটা খেল, বাকিটা মেঝেয় ফেলে দিল। ধরিত্রী প্রশ্বাস-যন্ত্রটা চালু করে দিতেই মেঝের তরলটুকু মিলিয়ে গেল। পায়চারি করতে করতে বিপুল বলে—তুমি যখন খাওয়ার ঘরে গিয়েছিলে তখন এনকোয়ারি কমিশন থেকে একটা ফোন এসেছিল। ওরা জানতে চাইছে, আমার এই ফ্ল্যাটে একজন মহিলা দশ বছর যাবৎ বাস করছে কেন। এটা প্রচণ্ড বেআইনী। উপরন্তু ওরা যে পবিত্র যৌন-বিপ্লবের মাধ্যমে যৌনমুক্তি এনেছে সে আদর্শ এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে। ওদের নির্দেশ, আমরা যেন অবিলম্বে ভিন্ন হয়ে যাই।

ধরিত্রীর মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে বলল—তুমি ওদের বলো নি তো যে তুমি যৌন-বিপ্লবকে যৌনদাঙ্গা বলে আড়ালে বলে বেড়াও!

বিপুল ভ্রূ কুঁচকে বলে—না। তবে ওরা হয়তো কিছু গন্ধ পেয়েছে। ওরা আরো লক্ষ্য করেছে যে, তুমি আর আমি সব সময়েই জামা-কাপড় পরে বেরোই।

ওরা এটাকেও ভাল চোখে দেখছে না। সম্ভবত ওরা শীগগিরই আসবে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক জানতে।

ধরিত্রী চুপ করে রইল।

জানলায় টোকা পড়তেই দুজনে ভয়ঙ্কর চমকে ওঠে। তাকায়। খোলা জানলার বাইরে সাদা গোল ভেলাটা ভাসছে। এক বোঝা রজনীগন্ধা বুকে করে সেই বুড়ো লোকটা দাঁড়িয়ে হাসছে। ওরা তাকাতেই লোকটা ভেলা থেকে জানলায় পা রেখে ঘরের মধ্যে নেমে এল। ধরিত্রীর হাতে ফুলের গোছা দিয়ে বলল—আসল ফুল।

ধরিত্রী ফুলগুলো বুকে চেপে রইল। তারপর উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকল বিপুলের দিকে। বিপুল চিন্তিতভাবে ফুলগুলো দেখছিল।

বুড়ো দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটু হেসে বলল—কোনো বিপদ?

বিপুল মাথা নেড়ে বলে—আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি। তাই এনকোয়ারি কমিশন আসবে।

—খুব খারাপ।

বলে বুড়ো চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোলো। তারপর বিপুল আর ধরিত্রীর ঘরদোর ঘুরে ফিরে দেখল একটু। কোনো খাটপালঙ্ক নেই। চেয়ার টেবিল বা আসবাবও নেই বললেই হয়। দেয়ালের গায়ে গায়ে কিছু বোতাম ছাড়া কোনো যন্ত্রপাতি দেখা যায় না। ওই বোতাম টিপলেই প্যানেলের ভিতর থেকে সব রকম যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আসে। আসবাবপত্রও। বসবার ঘরের এক কোণে কিছু কৃত্রিম ফুল সাজিয়ে রাখা। সে ফুল বাসি হয় না, তাতে চিরস্থায়ী গন্ধ। এমন কি সেই ফুলের আশেপাশে খুদে ব্যাটারিচালিত গোটাকয়েক মৌমাছি আর একটা ফরমায়েশী সাদা প্রজাপতি অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো ফুলের সঙ্গেই পাওয়া যায়। ওই সব কলের কীটপতঙ্গের আয়ু দীর্ঘ। ব্যাটারি ফুরোলে আবার চার্জ করে নেওয়া যায়। বুড়ো এই সব দেখছিল। হঠাৎ বলল—আমি জানি আপনারা স্বামী-স্ত্রী।

বিপুল বলল—চুপ। বোলো না।

ধরিত্রী খুব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—বলবেই তো। আমি তোমার স্ত্রী,

তুমি আমার স্বামী। দশ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

বাইরে একটা কোকিল ডাকল। যন্ত্রের কোকিল। বুড়ো দুজনের দিকে তাকাল। তারপর দুজনের মাঝখানের শূন্যতার দিকে চেয়ে বলল—আমার মাথাটা একশ বছরের পুরোনো। খুব ধোঁয়াটে। তবু বলি দশ বছর আগে বিয়ে বে-আইনী ছিল। মন্ত্র নেই, পুরুত নেই, রেজিস্ট্রার নেই, তবে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল কিভাবে?

—হয় নি। বিপুল বলে।

—হয়েছিল। ধরিত্রী চেঁচিয়ে বলল—আমরা ফুলের মালাবদল করেছিলাম, আর তুমি কয়েকটা সংস্কৃত মন্ত্র বলেছিলে, যেগুলোর অর্থ আমি বুঝিনি। কিন্তু তবু সেটা বিয়েই।

—ধরিত্রী!

বিতর্ক শুনে বুড়ো মাথা চুলকোয়। বিড়বিড় করে বলে—আমার হৃদ্‌যন্ত্র নতুন, ফুসফুস নতুন, কিন্তু মাথাটা পুরোনো। বড্ড ধোঁয়াটে। কিছু বুঝতে পারছি না। তবে এভাবেও বিয়ে হতে পারে। আগে হত।

—এখন হয় না! বিপুল বলল।

ধরিত্রী কথা বলতে পারল না। কিন্তু ফুলগুলি বুকে চেপে চেয়ে রইল। বিপুল তার দিকে চেয়ে বলল—ধরিত্রী, আমাদের কিছুই লুকিয়ে রাখা যাবে না। তার চেয়ে তুমি চলে যাও।

বুড়ো মাথা চুলকোচ্ছিল। বিড়বিড় করে বলল—আরো হয়ত পাঁচশ বছর এরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। বার বার শরীরের যন্ত্র বদলে দেবে। আমি সব ভুলে যাবো। অন্য মানুষ, ফের অন্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ভীষণ মুশকিল।

বুড়োর কথা কেউ শুনছিল না। বিপুল চেয়ে আছে ধরিত্রীর দিকে, ধরিত্রী বিপুলের দিকে।

জানলার বাইরে একটা লাল রঙের ভেলা এসে থেমেছে। ভেলার গায়ে লেখা—অনুসন্ধান। ভেলা থেকে চারজন লোক জানলা টপকে ভিতরে এল। এনকোয়ারি কমিশন।

বুড়ো সেই চারজনকে দেখে সরে এল জানলার কাছে। একটু কষ্টে নিজের ছোট সাদা ভেলাটায় চড়ে বসল। তারপর ভেসে যেতে লাগল। মাথাটা বড্ড ধোঁয়াটে। অনেক কালের কথা জমে পাথর হয়ে আছে। শীগগিরই এই মাথাটা

তার থাকবে না। একদম অন্য রকম হয়ে যাবে। বুড়ো ভাবল—আমাকে কোথাও চলে যেতেই হবে। এরা আমাকে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবে, যতদিন এদের খুশী। কিন্তু মরাটাও যে ভয়ঙ্কর দরকার তা এরা কবে বুঝবে?

সেই রাতে বুড়ো একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখল। তার বাবা রাস্তা সমান করার রোলার চালাত। ঘট-ঘটাং করে প্রচণ্ড শব্দে সেই রোলারটা পুরোনো পৃথিবীর রাস্তাঘাট সমান করত। বুড়ো দেখল, সেই রোলারটায় সে আবার চড়েছে। প্রচণ্ড শব্দে সে রোলারটা চলছে। সামনে শূন্য প্রান্তর, মাঝখানে অফুরান মুক্তির মতো রাস্তা। পিছনে তাড়া করে আসছে বাতাসী ভেলা, রকেট, সন্ধানী আলো, মৃত্যুরশ্মি। বুড়ো ডাকল—বাবা! রোলার চালাতে চালাতে বাবা একবার পিছু ফিরে চেয়ে বললেন—ভয় নেই! আমরা ওদের ছাড়িয়ে যাবো।

বুড়ো একটু হাসল, তারপর নিশ্চিন্তে চোখ বুজল।

চিড়িয়াখানা

—ইঃ বাবা রে! এই শালো মানুষ খায়। গেঁয়ো যুবকটি বলল।

—গতরখানা দেখেছিস? তার প্রৌঢ় কাকার চোখ পটপটাং হয়ে খুলে আছে।

নথ-নাড়া বৌটা কথা বলছে না। বাক্য হরে গেছে। কুঁচো-কাঁচাদের মধ্যে একটা ছেলে ঘুষি পাকিয়ে লাফাচ্ছে—আয় বাঘ, লড়বি? এক ঘুষিতে মুখ ভেঙে দেবো।

খাঁচার শিক-এর ওপাশে ভারী চকিত পায়ে অবিশ্রান্ত পায়চারি করছে বিশাল রাজকীয় বাঘ। বিরক্ত, রাগত, ক্ষুধার্ত এবং খানিকটা বুঝি উদাসীনও। রোজ কত মরণশীল মানুষ দেখতে আসে তাকে।

বাঘ। বাঘ। মানুষের সমাজে সবচেয়ে বেশী নামডাকের জানোয়ার। বাঘের নাম করলেই যেন একটা 'গাঁক্' শব্দ শুনতে পায় মানুষ।

গেঁয়ো মানুষের দঙ্গলটা বাঘের খাঁচার সামনে অনেকক্ষণ কাটায়। খুব ভোরে তারা গাঁ ছেড়ে বেরিয়েছে। পাঁচ মাইল হেঁটে এসে গোসাবার লঞ্চ ধরেছে সকালে। ক্যানিং থেকে ট্রেনে বালিগঞ্জে। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চেপে কালীঘাট। সেখানে এ ওর কোমর ধরে মানুষের রেলগাড়ি হয়ে সার দিয়ে মন্দিরে ঢুকে পুজো দিয়েছে। কপালে সিঁদুর, হাতে শালপাতার ঠোঙায় প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে এসে খুব জিলিপী আর কচুরি দিয়ে উপোস ভঙ্গ করেছে সবাই। তারপর চলো চিড়িয়াখানা।

যুবকটিই দলের পাণ্ডা। সে আরো বার দুই গেছে চিড়িয়াখানায়। তার পিছু পিছু একত্রিশ নম্বর ট্রাম ধরে দঙ্গলটা এসেছে চিড়িয়াখানার মজা দেখতে। ফের রেলগাড়ি হয়ে সার দিয়ে টিকিট কেটে ঘোরানো গেট-এ ঠেক-ঠোক্কর খেয়ে ঢুকেছে ভিতরে।

গায়ে লম্বা লম্বা কালো দাগওলা ঘোড়ার মতো জন্তু দেখে মেজ বৌঠান বলল.

—এ বাঘ বুঝি?

—দূর। ও হল জেব্রা।

—সে কি রকম জন্তু গো।

যুবকটি দেখেশুনে বলে—ঐ বিলিতি গাধা আর কি।

মেজ বৌঠান বুঝতে পারে। বিলেতে সব কিছুই আলাদা রকমের তো! বিলিতি আমড়া, বিলিতি বেগুন।

ঈগলের খাঁচার সামনে দলটা দাঁড়ায় বটে সময় নষ্ট করে না।

নথ-নাড়া বৌটা বলে—ওঃ, বাজপাখি আবার খাঁচায় রাখবার কি? এ আমরা কত দেখিছি।

যুবকটি একটু দোটানায় পড়ে বলে—এ সেই বাজপাখি নয়।

মেজ বৌঠান জিজ্ঞেস করে—বিলিতি নাকি? ওমা, এ যে শেয়ালও রেখেছে দেখছি খাঁচায় পুরে।

কাকী বলে উঠল—মবণ! ও পতু, বেজি দেখছিস কি হাঁ করে দাঁড়িয়ে? পতু নামে বাচ্চা ছেলেটা ছুটে এসে বলল—ও ঠামা, বেজির ইংবিজি কি ম্যাংগোজ? ছাখো লেখা আছে। ম্যাংগো তো আম।

যুবকটি সংশোধন করে বলল—ম্যাংগো নয়, মনগুজ।

শজারু বা বনমোবগ দেখে দঙ্গলটা তেমন অবাক হল না। কাকী বলেই ফেলল—এ সব কী দেখাতে আনলি, ও কালীপদ?

নথ-নাডা বৌ বলে ওঠে—এ সবই নাকি বিলেতের।

—বলছে?

যুবকটি মিইয়ে যায়। চাপা গলায় বলে—গাঁইয়া বলে লোকে টের পাবে। চুপ কবো, লোকে তাকাচ্ছে।

পতুর দিদি দশ বছবেব ফুলঝুবি হঠাৎ হাতে তালি দিযে বলে ওঠে—হরিণ! হরিণ!

চিড়িয়াখানার ফটকের মুখ থেকে প্রত্যেকে এক ঠোঙা করে ভেজানো ছোলা কিনে এনেছে জীবজন্তুকে খাওয়াবে বলে। ফুলঝুরি তার খানিকটা নিয়ে হরিণের চত্বরে ছুঁড়ে দিল। হরিণেরা গা করল না।

এমু দেখে সবাই একটু থতমত।

—এ কি পাখি নাকি? মেজ বৌঠান জিজ্ঞেস করে।

—পাখিই। যুবকটি বলে।

—উড়তে পারে? পাখনা তো দেখছি না।

যুবকটি বলে—পারে বোধ হয়।

—বাবা, অত বড গতর নিয়ে ওড়া কি চাট্টিখানি কথা? কী পাখি রে?

নথ-নাড়া বৌ চিমটি কাটে—বিলিতি। যুবকটি সবাইকে তাড়া দেয়—চলো, চলো, এখনো ঢের দেখার আছে।

চাইনীজ সিলভার ফিসলেট দেখে ফুলঝুরির ছোট বোন বলে ওঠে—ও ঠামা, গ্যাখো, এ পাখিটার পুরুতমশাইয়ের মতো টিকি আছে গো!

লামা, ক্যাসোয়ারি, স্বর্ণমৃগ দেখে দেখে দলটা রিণ্টু রং-এর খাঁচার সামনে আসতেই ফুলঝুরির বোন রুপোঝুরি বলে—দিদি, একটা আতপ চাল আতপ চাল গন্ধ পাচ্ছিস?

—ঠিক রে। ফুলঝুরি শ্বাস টেনে বলে।

—আতপ চালের গন্ধ।

সান গ্লাস চোখে এক শহুরে সুন্দরী তার ইংরিজি বলা ছেলে আর পাইপটানা স্বামীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। এই কথা শুনে হঠাৎ লিপস্টিক চিরে একটু হাসে।

ফুলঝুরি কাকীমার কানে কানে বলে—শাড়িটা দেখেছো? সোনারপুরের কমলাদি এরকম একটা কিনেছে না? নথ-নাড়া বৌ বলে—যাঃ, সেটা তো চাঁদেরী। এটা জর্জেট।

একটা দেড হাত লম্বা ঠোঁটওলা পাখি ঘেরা জায়গা থেকে লোভীর মতো মুখ বের করে বারবার হাঁ করছে। সেই হাঁয়ের মধ্যে পতু ছোলা ছুঁড়ে দিচ্ছিল ভয়ে ভয়ে। কপাৎ করে পাখিটা ঠোঁট বন্ধ করে। সব কটা ছোলা ভিতরে যায় না।

একটু বয়সের একটা মেয়ে এতক্ষণ একটাও কথা বলে নি। কালীঘাটে সে একটা রঙিন মোড়া কিনতে চেয়ে বায়না করায় কাকীর হাতে থাপ্পড় খেয়েছে। এতক্ষণ অনেকবার আঁচলে চোখ মুছতে হয়েছে তাকে। সামনে অঘ্রানে তার বিয়ে, এত বড় মেয়েকে সবার সামনে মারা?

এবার সে হঠাৎ বলে ওঠে—এই পতু আমার ছোলার ঠোঙাটা নিলি যে বড়? তোরটা কই?

ফুলঝুরি বলে ওঠে—ও টিয়াদি, এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে পতু নিজের ঠোঙার ছোলা খাচ্ছিল। আমি দেখেছি।

—কী রাক্ষস বাবা! কাকী বলে ওঠে, পেট নামবে দেখিস।

মেজ বৌঠান যুবকটিকে বলে—ও ঠাকুরপো, এ পাখিও কি বিলিতি?

কালীপদ এবার ঠেকে শিখেছে। বলে—না না। ডিশি। সজনেখালির জলায় কত আসে।

—ওড়ে?

—তা ওড়ে।

—তবে এখান থেকেই বা উড়ে যাচ্ছে না কেন? ওপরে তো ঢাকা চাপা কিছু নেই।

কালীপদ ডান দিকে ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে বলে—দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গয়াল, সারস, নীলগাই। একে একে দেখে যেতে থাকে তারা। দুপুরের রোদে তেমন তেজ নেই। শীত আসছে। চিড়িয়াখানায় ঘন সবুজে আস্তরণ পড়েছে। জলের গন্ধ। ছুটিয়াল মানুষজনের মন্থর চলাফেরা।

—দ্যাখো, হরিণের জঙ্গল। রুপোঝুরি বলে। সে বরাবরই অদ্ভুত সব কথা বলে।

পতু আইসক্রীমওলার কাছে খানিক দাঁড়িয়ে রইল।

ডানধারের বিশাল ঘেরা জায়গায় অতিকায় কচ্ছপটা হাঁটছে। এত বড় যে কচ্ছপ বলে বিশ্বাস হয় না।

বাঁ ধারে জলের কল দেখে সবাই আঁজলা ভরে পেটপুরে জল খেল। কুঁচো-কাঁচারা জল ছোঁড়াছুঁড়ি করল খানিক।

—হাতির পিঠে চড়বে নাকি? কালীপদ আস্তে করে জিজ্ঞেস করে।

নথ-নাড়া বৌটা বলে—ও বাবা!

মেজ বৌঠান শুনতে পেয়ে হেসে বলে—চড না। কালীপদ ধরে থাকবে'খন।

—মরণ!

ফুলঝুরি পাঁচটা পয়সা আর ছোলা ছুঁড়ল হাতির দিকে। হাতি ছোলা কুড়িয়ে শুঁড় দিয়ে নিখুঁত খেয়ে নিল, পয়সা তুলে পাশে বসা মাহুতের দিকে ছুঁড়ে দিল।

ছোটদের আলাদা একটা চিড়িয়াখানা দেখে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবতে ভাবতে অবশেষে ঢুকে পড়ারই সিদ্ধান্ত হল। কলকাতায় ফের কবে আসা হবে ঠিক তো নেই। মাথাপিছু পঁচিশ পয়সার টিকিট কাটতে হয় এখানে। গণ্ডারকে এত কাছ থেকে দেখে সবাই অবাক মানে। পতু বাঁদরটা তো শিকের ভিতরে থেকে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়েও দিল একটু। কাকী বলে—এর চামড়াতেই ঢাল হয়?

এটা বেশ সাজানো জায়গা। ছোট একটা খালের মতো আছে। তার ওপর খেলাঘরের সাঁকো। একটা ছোট দুর্গ। চারধারে খুদে খুদে সব প্রাণীর খাঁচা। হরেক খরগোশ, বাচ্চা হরিণ, মেছো কুমারী, সাদা ইঁদুর।

সবচেয়ে অবাক লাগে ইঁদুরের মতো দেখতে হরিণ দেখে। কী ছোট, কী সুন্দর!

আর লজ্জাবতী বানর? না, তার কথা জীবনেও ভুলবে না যে একবার দেখেছে। দেড় বিঘৎ-এর ছোট্ট একটু বানরটা তার একার খাঁচায় হাঁটু আর হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে আছে। শরীরটা গোল হয়ে আছে। যত তাকে ডাক, ভ্যাঙাও, ঢিল মারো, সে মুখ তুলবে না। টিপ্পার বুকটা দুঃখে ভরে গেল। জীবজন্তুর কত কষ্ট থাকে। সবুজ কচ্ছপ আর বাচ্চা কুমীর বাস করছে এক জায়গায়। একটা কচ্ছপ কুমীরের গা বেয়ে উঠে গেল দিব্যি। আড়াল থেকে কথা-বলা ময়না ডাকছে মুহুর্মুহু। সে ডাকে বুক ঝনঝন করে বেজে ওঠে। কী মিষ্টি ডাক!

শীতের স্পর্শ-লাগা বেলা পড়ন্ত হয়ে আসছে। চলো, চলো। আরো কত দেখার বাকি।

—সাপ দেখবে না?

—না বাবা, বড গা ঘিনঘিন করে।

—সাপ আর দেখবার কি আছে? গাঁয়ে তো কত দেখছি।

—তবে চলো ঐ বাঘ দেখি, তারপর লম্বা সাঁকো পেরিয়ে যাবো জলের ওধারে।

—কি আছে ওখানে?

—জলের মধ্যে একটা দ্বীপ। তাতে হাজারো পাখি রাত কাটাতে আসে। কলকাতার পাখিদের গ্র্যাণ্ড হোটেল হল ঐ দ্বীপ।

বাতাস কাঁপিয়ে বাঘ ডেকে ওঠে। ওংঘ-অ! ওংঘ-অ!

পতু প্রথমটায় সাপটে ধরেছিল ফুলঝুরিকে। তারপর ছেড়ে দিয়ে হি-হি করে হাসতে থাকে।

—যা ভীতু না তুই! ফুলঝুরি বলে।

—বাঘ! বাঘ! বাঘ বলে রূপোঝুরি লাফাতে থাকে।

কালীপদ বলে সুন্দরবনে কত আছে।

—তুমি দেখেছো কখনো? নথ-নাড়া বৌ খোঁটা দেয়।

—সুন্দরবনের বাঘ জীবনে একবারই দেখে মানুষ। যখন দেখে তখন আর ফেরে না।

বৌ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—দেখে তবে কাজ নেই।

—এবার মাঘ মাসে যাবো দেখতে।

—যাওয়াচ্ছি।

অস্থির পায়চারি করছে সিংহ। তার বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই। চোখে কিছু

হতাশার রাগ। হলদে মুলোর মতো দাঁত বের করে মুখোমুখি বাঘ একবার ডাকল। ত্রিভুবন কেঁপে ওঠে।

এই না হলে বাঘ!

সবুজ জলের ওপর দিয়ে লম্বা সাঁকো পার হয়ে যায় সবাই। জলের ধারে একটা বাঁধানো বসবার জায়গা। বড্ড সুন্দর। জলের মাঝখানে উঁচু মতো ছোট একটা দ্বীপ। গাছগাছালিতে ভরা। তাতে হাজার হাজাব পাখি এসে পড়ছে। স্থির জলে যমজ ছায়া ফেলে ময়ূরপঙ্খীর মতো ভেসে যায় সাদা আর কালো রাজহাঁস।

সন্ধের মুখে খাওয়ার সময়। ভালুকটা গপাগপ ডালভাত খাচ্ছিল তার খাঁচায় বসে। বড় খিদে।

সিংহ দেখবে না? কিংবা সিংহ্র? সাদা বাঘ?

দেখব, দেখব।

ওমা! এর বাবা বুঝি বাঘ আর মা সিংহী? আর এর বুঝি বাপ সিংহ, আর মা বাঘিনী? বাবা রে, দুজনের তেজ কেমন এক হয়েছে দেখ। খাঁচায় আঙুল ঢুকিয়ে দেখবে নাকি একটু চাটে না কামড়ায়?

—ও পতু, সবে আয় দস্যি ছেলে।

সান গ্লাস পরা সেই সুন্দরী আর তার স্বামী আর ছেলে গাছতলায় বেঞ্চে বসে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খাচ্ছে। ছেলের হাতে একটা কেক। পতু চেয়ে থেকে একটা ঢোক গেলে।

ফুলঝুবি আর টিয়াব জানোয়ার দেখতে আর ভাল লাগছে না। তারা আশপাশের মেয়ে-বৌদের শাড়ি আর সাজ দেখে। গা টেপাটিপি করে হাসে।

নথ-নাড়া বৌ বলে—আর পারি না। একটু বসলে হয়।

কালীপদ বলে—আজ তো আর গাঁয়ে ফেরা হবে না। সোনারপুরে কমলাদের বাড়িই থাকতে হবে। কিন্তু সেও একটু আগে যাওয়া দরকার। এতগুলো লোকের জন্য আয়োজন।

নথ-নাড়া বৌ আস্তে করে বলে—তোমাতে আমাতে একবার আলাদা করে আসব, বুঝলে! কেমন জোড়ায় জোড়ায় কতজনা ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ তো!

—কাকা, বাদামভাজা কিনবে? পতু বলে।

সবাই সব ভুলে যায় ম্যাকাও পাখির খাঁচার সামনে এসে। পয়সা সার্থক। চোখ সার্থক। কষ্ট সার্থক।

—এত সুন্দর রামধনুর মতো পাখিও ছিল দুনিয়ায়? ও কালীপদ, এ কি রং করা পাখি?

—না, কাকী, এই রকমই হয়।

ম্যাকাও ঝুল খাচ্ছে খাঁচার গায়ে। কর্কশ স্বরে ডাকছে। খাঁচা কেটে বেরিয়ে যাওয়ার কত নিষ্ফল প্রয়াস তাদের।

—আহা রে, ওদের কেন ছেড়ে দেয় না?

—ছেড়ে দিলে কি দেখতে পেতে?

বেলা গড়িয়ে যায়। রৌদ্রতপ্ত ঘাসে, নিবিড় গাছপালায় বনের গন্ধ ঘনিয়ে ওঠে। তাপ মরে আসে। ঘামে-ভেজা শরীরে শীত-বাতাস এসে লাগে। ফেরার সময় হল।

মানুষ ফিরে যায়। তারপর কয়েকটা দিন হয়তো কলকাতার বুকে আশ্চর্য বনভূমির কথা মনে পড়ে। কাজের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ বাঘের ডাক শোনে। রাতের ঘুমে ম্যাকাও পাখির সৌন্দর্য রঙের ফোয়ারা খুলে দেয় চোখে।

শুক্লপক্ষ

রাজা চলেছেন ভিখারীর ছদ্মবেশে। ভিখারীর চীরবাস পরনে, গায়ে মাখা ভুসো-কালি, সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন, একটি চোখ কানা, একটি পা খোঁড়া। তাঁর ছদ্মবেশে কোনো ত্রুটি নেই। হাতে ভিক্ষাপাত্র, শুধু তাঁর চীরবাসের অন্তরালে একটি গোপন কোমরবন্ধে লুক্কায়িত রয়েছে একটি চর্মপেটিকা। তাতে মহামূল্যবান মণি-মাণিক্য, স্বর্ণখচিত রাজকীয় পাঞ্জা, এ সম্পদ যে লাভ করবে সে একদিনেই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম হয়ে যাবে।

প্রতি মাসের শুক্লপক্ষে রাজা ছদ্মবেশে বহির্গত হন। প্রতি শুক্লপক্ষে রাজ্যের একজন ভাগ্যবান রাজানুগ্রহে ধনিত্ব লাভ করে আর লাভ করে রাজার অজেয় শক্তিধর পাঞ্জা, যার প্রভাবে সে রাজ্যের সর্বত্র মাননীয়, গণনীয় হয়ে ওঠে। তার কর্মের কোনো দোষ ধরা হয় না। তার ক্ষমতা রাজার তুল্যই হয়ে ওঠে প্রায়। সামান্য পার্থক্য মাত্র। সবাই জানে, অপেক্ষা করে, কিন্তু সেই ভাগ্যবানদের পরিচয় কেউ পায় না।

নাগরিক এবং প্রজাকুলে নানা শ্রেণীর ব্যক্তি রয়েছেন। পূজনীয় ব্রাহ্মণেরা, শ্রদ্ধেয় ক্ষত্রিয়, মহাভাগ বৈশ্যকুল, নমস্য শূদ্রেরা। রয়েছেন কৃষিজীবী, বণিক করণিক, শিক্ষাদাতাগণ, সৈনিক, শান্তিরক্ষী, শ্রমজীবী, প্রণম্যা বারবনিতারাও। এঁরা যে-কেউ রাজানুগ্রহ লাভের অধিকারী, যেমন কোনো ভিখারী কাঙাল, তেমনি আবার হয়তো ধনীদেরই কেউ।

শুক্লপক্ষে প্রতি রাত্রে প্রতিটি গৃহের সম্মুখে একটি করে দীপ জ্বলে। মানুষেরা নিত্যকর্ম বা গৃহকর্মের মধ্যেও অন্যমনস্ক থাকে। রাজকীয় পদধ্বনির জন্য সজাগ থাকে তাদের শ্রবণ, প্রাতঃকালে সকলেই দুয়ার উন্মোচন করে সাগ্রহে দেখে, তাদের অলিন্দে সিঁড়িতে বা অন্য কোথাও রাজা তাঁর চর্মপেটিকা উপঢৌকন রেখে গেছেন কিনা। শুক্লপক্ষে প্রত্যেকেই রাজার চিন্তা করে। রাজার জন্য অপেক্ষা করে।

শুক্লপক্ষ শুরু হয়েছে।

নগরের একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বিপণী, নানা জাতীয় খাদ্যশস্য, মশলা বিক্রি করে

বিক্রেতা। লোকটি অসাধু, ওজন চুরি করে, মূল্য বেশী নেয়, কটু কণ্ঠে দরাদরি করে।

কিন্তু শুক্লপক্ষে তার অন্য চেহারা। সে জানে, রাজা হয়তো এই পথ দিয়ে যাবেন। তিনি বিনীত, ভদ্র, সাধু, ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেই পছন্দ করেন। রাজা পছন্দ করেন শুভ্র পরিধেয়, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সংযত আচরণ। পছন্দ করেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, বংশগৌরবে গরীয়ান, বর্ণভিত্তিক বৃত্তি-আশ্রয়ী প্রজাকে। লোকটি তাই শুক্লপক্ষে ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়।

প্রতিপদের সন্ধ্যায় এক আগন্তুক বিপণীতে প্রবেশ করল। লোকটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। বহু বছর ধরে সে রাজার অপেক্ষা করছে। এই কি রাজা? রাজাকে সে দেখেনি। রাজা কোন বেশে আসবে তাও সে জানে না। তাই উগ্র সম্ভ্রমের সঙ্গে সে বলল—আদেশ করুন ভদ্র, আপনার সন্তোষ ছাড়া আমার উদ্বৃত্ত কিছুই থাকবে না।

আগন্তুকের চেহারাটি রাজকীয় বটে। শালপ্রাংশু মহাভুজ, বৃষস্কন্ধ, তীক্ষ্ণ নাসা এবং তীব্র চোখ। ঈগল পক্ষীর একটা আভাস তার সর্বাঙ্গে। পরিধানে সূক্ষ্ম পশমী বস্ত্র, হাতে বলয় ও মূল্যবান অঙ্গুরীয়।

আগন্তুক ব্যবসায়ীটির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন—আমার কিছু শুষ্ক দ্রাক্ষা ও যবচূর্ণ প্রয়োজন।

বিক্রেতাটি দ্রব্য ওজন করে বিনীতভাবে পেটিকায় পূর্ণ করে দিল।

আগন্তুক দ্রব্যের পরিমাণ দেখে সবিস্ময়ে বললেন—কী আশ্চর্য! গতকাল আমার ভৃত্য এই বিপণী থেকে সমমূল্যের একই দ্রব্য নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা পরিমাণে এর দুই তৃতীয়াংশ হবে। আমি বিদেশী পর্যটক, এ দেশের মূল্যমান জানি না।

বিক্রেতাটি নানাবিধ বিনয়ের শব্দ করে বলল—ভৃত্যরা সবসময়ে বিশ্বাসভাজন হয় না।

আগন্তুক চিন্তান্বিত মুখে বললেন—আমার ভৃত্যটি পুরাতন, এবং এতকাল বিশ্বাসভাজনই ছিল। এখন তার মতিভ্রম হয়ে থাকতে পারে।

এই বলে তিনি ব্যবসায়ীকে সাধুবাদ দিয়ে প্রস্থান করলেন। দ্রব্যপূর্ণ পেটিকাটি বহন করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। ভৃত্যটি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, সুতরাং তাঁকে নিজে আসতে হয়েছে। বহনকার্যে তাঁর পটুত্ব কম।

রাস্তায় পদার্পণ করেই তাঁর কিছু স্মৃতিভ্রম হয়ে থাকবে। সম্মুখে অনেকগুলি পথ পরস্পরকে ভেদ করে গেছে। তিনি দিক নির্ণয় করতে পারছিলেন না।

জনৈক পথিককে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন—আমি নগরের উত্তর-ভাগে যাবো, আমাকে সহজ পথটি দেখিয়ে দিন।

পথিক সবিস্ময়ে তাঁর মুখ নিরীক্ষণ করে সবিনয়ে বলল—ভদ্র, আপনার বোঝাটি আমার হাতে দিন। চলুন, আপনাকে পৌছে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর কয়েকজন পথিক সাগ্রহে এগিয়ে এসেছিল। সকলেই আগন্তুককে অযাচিত সাহায্য করতে উন্মুখ। তাঁদের পরোপকারস্পৃহা দেখে আগন্তুক বিস্মিত হলেন। গত রাত্রিতে তিনি সদ্য এ নগরে পদার্পণ করেছেন। এখনো সম্যক পরিচয় পাননি। যেটুকু পেলেন তাতে বিমুগ্ধ হলেন। অচেনা পথিক যদি আত্মীয়েরও অধিক যত্নে অন্যের ভার বহন করে, যদি পথ প্রদর্শন করে দেয় তবে এ নগরী অবশ্যই স্বর্গতুল্য।

সুঠাম রাজপথগুলি সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত। কোথাও কোনো আবর্জনা চোখে পড়ে না। তৈলসিক্তবৎ রাজপথের পাশেই হরিৎ তৃণক্ষেত্র, ছায়াময় বনস্পতির সারিবদ্ধ সৌন্দর্য। সূর্যোদয়ের বহুপূর্বেই পথমার্জনাকারীরা তাদের কর্মে তৎপর হয়েছে। রাজপথে প্রথমে সম্মার্জনীতে ধূলিমুক্ত করে তৎপরে চন্দনচূর্ণমিশ্রিত জলে নিষিক্ত হচ্ছে। কর্মীরা গান গাইছেন। তাঁদের মন হর্ষোৎফুল্ল। হয়তো রাজা এই পথে, এই সময়ে যাবেন।

এক বাতুল ভাগ্যান্বেষী কর্মসন্ধানে এসে আশ্রয়লাভে নিশ্চেষ্ট হয়ে বৃক্ষতলে নিদ্রিত। অন্য সময় হলে তার ভাগ্যে সম্মার্জনীর আঘাত লাভ হতে পারত, কারণ এ রাজ্যে পথবাস নিষিদ্ধ। কিন্তু আজ একজন পুরকর্মী তাকে দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে অবনত হয়ে বিনয় বচনে বললেন—মহদাশয়, এ বৃক্ষচ্ছায়া আপনার নিরাপত্তার পক্ষে প্রশস্ত নয়। ভদ্র, এই দীনের কুটিরে চলুন। আমার স্ত্রী আপনাকে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে বরণ করবেন। আমরা অতিথি ও দেবতায় পার্থক্য করি না।

এই বলে পুরকর্মী পথিকের মুখশ্রীর দিকে অপলক চেয়ে রইলেন। তাঁর হৃদয়ে অমরাবতীর ঘণ্টা বাজতে লাগল। রাজা! এই কি রাজা!

পথিক এই আতিথেয়তায় মূক হয়ে আবেগে অশ্রু বিসর্জন করে বললেন—এই ভাগ্যহীনের জীবনে এমন সমাদর আর ঘটেনি। আপনার মঙ্গল হোক।

সেদিন ভাগ্যান্বেষীর ভাগ্যে পূর্ণ আহার জুটল। তিনি বিশ্রামের জন্য শয্যা পেলেন। সে রাত্রে তাঁর দেহে পক্ষীকুলের পুরীষ বর্ষিত হল না।

শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে নগরের দক্ষিণভাগে এক গৃহস্থের ঘরে এক শিক্ষানবীশ চোর সিঁধ কাটছিল। অন্য সময় হলে সে অবশ্যই কৃতকার্য হত। কিন্তু এই শুক্লপক্ষে গৃহস্থরা রাজার অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। তাদের নিদ্রা অত্যন্ত ভঙ্গুর, মায়ামৃগের মতো তা ক্ষণে ক্ষণে পালায়।

গৃহস্থ উঠলেন। চোরটি তখন সদ্য গৃহে প্রবেশ করেছে। গৃহস্থের একেবারে সম্মুখে পড়ে গেল। ভয়ে সে তটস্থ। গৃহস্থেরও সেই অবস্থা। করজোড়ে বললেন—আপনার যাচ্ঞা কী?

চোর সভয়ে বলল—আমি পরস্বাপহারক। আমাকে দয়া করে লঘু শাস্তির বিধান করুন। আমি অপরাধ স্বীকার করছি এবং আত্মসমর্পণ করছি।

গৃহস্থ মৃদু হাসলেন। রাজা কোন বেশে আসবেন তা তো কেউ জানে না। চতুর রাজা কত পরীক্ষা করেন মানুষকে, কতভাবে কাছে আসেন। তিনি স্নিগ্ধ বচনে বললেন—ঈশ্বরের করুণায় আমার তৈজসপত্র ও সম্পদ আপনার তুলনায় বেশী। আপনার সঙ্গে ঐশ্বর্য ভাগ করে নিয়ে সমবণ্টন ও সমভোগের আনন্দ লাভ করতে দিন। কোনো মানুষই তার বৃত্তির জন্য পতিত হয় না, যদি সে অভাবগ্রস্ত ও নিরুপায় হয়। আপনি আশ্বস্ত হোন, আমি চৌরোদ্ধরণিক বা শান্তিরক্ষীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করব না। বরং এতকাল যে আমি আমার পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীনতাবশত আমার সম্পদ একা ভোগ করেছি সেজন্য আমি লজ্জিত। আপনার অবস্থার জন্য আমিই দায়ী।

এই বলে গৃহস্থ চোরকে আলিঙ্গন করলেন। সদ্য নিদ্রোত্থিত তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি ও পুরুষেরা করতালি দিল।

*

স্ত্রৈণ ও কাপুরুষ ব্যক্তিকে রাজা পছন্দ করেন না। তা বলে রাজ্যে স্ত্রৈণ ও কাপুরুষ ব্যক্তির অভাব নেই। প্রায় সকলেই তাই।

রাজার রাজস্ব বিভাগের কর্মী এক দুর্বলচিত্ত লোকের মুখরা স্ত্রী ছিল। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকেই স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নিম্নমুখী হয়েছে। গৃহে শান্তি বিরাজমান। হতক্লান্ত লোকটি দিনশেষে, কর্মাবসানে গৃহে প্রত্যাবর্তনের চিন্তায় বিভীষিকা দেখত।

এখন সে অনায়াসে, অকুতোভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

রাজা মুখরা স্ত্রীলোক পছন্দ করেন না। রাজা পছন্দ করেন পতিভক্তিপরায়ণা, গৃহস্থলক্ষ্মী।

লোকটি গৃহে প্রত্যাগমন করলে অপরাপর দিনের মতো দজ্জাল স্ত্রী অভাব

অভিযোগের কথা তোলে না। বরং গৃহ-মার্জনা করে, সাংসারিক কর্তব্যগুলি সমাধান করে, সূর্যাস্তকালে স্নানান্তে দক্ষিণের দ্বারদেশে বসে সযত্নে দেহের পরিচর্যা করে, যাতে স্বামী দেখে খুশী হন। গুণ্ঠনে লজ্জাবতী হয়ে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকেন উৎসুক নেত্রে। বধূটি জানে, এখন শুক্লপক্ষ। রাজার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।

লোকটিও জানে। অপরাপর দিন গৃহে প্রত্যাগমনের পরই লোকটি কূপ থেকে জল উত্তোলন করে, শিশুকে কোলে করে থামায়, স্ত্রীর অপারগতাহেতু পড়ে থাকা গৃহকর্ম করে দেয়, এমন কি স্ত্রীর ললাট-বেদনার উপশম-কল্পে সেবা করে।

লোকটি চতুর্থী তিথিতে ঘরে ফিরে এল। স্ত্রী জল উত্তোলন করে রেখেছেন, সে হস্তপদ প্রক্ষালন করল। তার চলায় ফেরায় পুরুষোচিত গাম্ভীর্য ও উপেক্ষা। গৃহকর্মের কিছু শিথিলতা প্রত্যক্ষ করে স্ত্রীকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিল। স্ত্রী স্বামীর সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করলেন না। দণ্ডায়মান থেকে সমস্ত বিনীত বদনে শুনলেন, এবং অপরাধ স্বীকার করলেন।

স্বামীর লঘু আহার্যের ব্যবস্থা করে স্ত্রী তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত যাতে না হয় সেইজন্য পুত্রকন্যাদের গৃহান্তরে নিয়ে গেলেন। অপরাপর দিন তিনি যেমন পুত্র-কন্যাদের কাছে তাদের পিতার চরিত্রের নানাবিধ দুর্বলতার কথা বলেন, আজ তা মোটেই করলেন না। বরং বলতে লাগলেন—তোমাদের পিতা এক মহৎ পুরুষ। তাঁর চরিত্রের দীনভাব, অক্রোধী স্বভাব, সেবাপরায়ণতা ও ত্যাগ দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি সহনশীলতায় পর্বততুল্য। তোমরা তোমাদের জীবনে তাঁর অনুসরণ করো। তিনি আমার দেবতা, তোমাদেরও তিনি ধ্যেয় হোন।

এইসব কথা তিনি আবেগের সঙ্গে বললেন। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল। রাজার সহস্র শ্রবণ উৎকর্ণ রয়েছে চারদিকে! তিনি কি শুনছেন?

করগ্রহণের জন্য নাগরিক ও জানপদবর্গের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে করবিভাগের রাজ-কর্মচারীরা। তারা সকলের কাছে গিয়ে বলছে—কর মানে হাত। করগ্রহণ মানে হাতে হাত মিলানো। আপনারা উন্মুক্ত হৃদয়ে সহযোগিতার হাতখানি প্রসারিত করুন। প্রদান ও গ্রহণে আমাদের হৃদয়ের বিনিময় হোক। বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব উজ্জ্বল হোক।

চাষী, নাগরিক ও ব্যবসায়ী সবাই করপ্রদানে উন্মুখ। রাজকর্মচারীরা গলদঘর্ম হচ্ছেন, তবু হাসিমুখে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। বিতর্ক নেই, কটুভাষণ নেই, হিসাবের গোলমাল নেই, করপ্রদানকারীরা উচ্চৈঃস্বরে বলছেন—রাজাকে যা

দেওয়া যায় তার দশগুণ ফিরে আসে। আমার যে বাহু কর দেয় সহস্র বাহু এসে সেই বাহুর শক্তি বৃদ্ধি করে।

সবাই জানে, রাজা দেখছেন, রাজা শুনছেন।

শান্তিরক্ষীরা ঘুরছেন সর্বত্র। তাঁদের চোখে ঠমক, বা মুখে কটুকাটব্য নেই, তাঁরা অপরাধীকে অন্বেষণ করার চেয়ে অপরাধের অন্বেষণেই বেশী তৎপর। অপরাধ সংঘটনের আগেই তা নিবারণ করছেন। উদ্যোগী হত্যাকারীর হাত হত্যার আগেই তাঁদের হস্তে ধরা পড়ছে। লুণ্ঠনকারীরা লুণ্ঠনের সুযোগ পাচ্ছে না। প্রতি অর্ধপ্রহরে শান্তিরক্ষীর শকট সর্বত্র পরিভ্রমণ করছে। নিরলস সজাগ সতর্ক।

বহিরাগত বণিকেরা রাজকর্মচারীদের করণে উপস্থিত হচ্ছেন কর্মময় দিবাভাগে। একজন বললেন—আমার এ রাজ্যে ব্যবসায়ের আজ্ঞা পত্রটি এখনো স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে। সময় মূল্যবান। এই বলে উনি কোষ থেকে মুদ্রার পেটিকা বের করেন উৎকোচ প্রদানের জন্য।

সংশ্লিষ্ট রাজকর্মচারী সভয়ে চেয়ে থাকেন। রাজা নয় তো! এই হয়তো রাজা!

তিনি হাত বাড়িয়ে উৎকোচ প্রদানরত হাতখানি চেপে ধরে বলেন—শ্রদ্ধাভাজন, আপনার সেবার জন্যই আমি বেতনাদি লাভ করি। তাতেই আমার চলে যায়। অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। আপনার আজ্ঞাপত্রটি অবিলম্বে স্বাক্ষর করে দেওয়া হচ্ছে।

অকুতোভয়ে সালঙ্কারা যুবতীরা, কামিনীকুল চলেছে রাজপথে। পুরুষেরা তাঁদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করছে না, কেবলমাত্র পদপ্রান্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে তাদের শ্রদ্ধাসিক্ত দৃষ্টি। তাঁদের আভরণ বা দেহসৌন্দর্যকে অনুসরণ করছে না কোনো লোভী বা কামুকের দৃষ্টি। যুবকেরা সসম্মানে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। শুক্লপক্ষে কোনো যুবকই কোনো যুবতীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় না। রাজা বলেন, পুরুষদের বিবাহ-প্রস্তাব পৌরুষের পক্ষে হানিকর। পুরুষদের থাকবে কর্মতৎপরতা, মঙ্গলমুখী সুরত। সে কেন নারীচিন্তা করবে?

এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেহমিলনও শুক্লপক্ষে নিয়ন্ত্রিত হয়। স্ত্রীর আগ্রহ ও প্রস্তাব ব্যতিরেকে কোনো পুরুষই স্ত্রীর সঙ্গে উপগমন করেন না। স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে দেহমিলন বলাৎকারের তুল্য অপরাধ।

বারবনিতাদের পল্লীতে স্নিগ্ধ দীপ জ্বলছে। দরজার পাশে মঙ্গলঘট। পত্রে পুষ্পে শোভিত দ্বারদেশ।

আমোদপ্রিয় নাগরিক এসে উপস্থিত হলেন একটি গৃহে।

সুসজ্জিতা পতিতাটি ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। করজোড়ে বললেন—প্রভু, আমি প্রকৃত নারী নই, নারীত্বের ছায়ামাত্র। হৃদয় ও প্রেম ছাড়া নারীর আর কোনো সম্পদ নেই। গৃহ ও সংসার ছাড়া তার কোনো আশ্রয়ও থাকে না। আমি ব্যতিক্রমদুষ্টা, শাশ্বত নারীত্বের আমি কেউ নই। আমি শরীরী মাত্র, রোগ সংক্রমণের ভয়দুষ্টা। আমি কেবল সাময়িক কামহরণ করতে পারি, কিন্তু পুরুষকে তৃপ্ত কবতে পারি না। আতিথ্য-গ্রহণের আগে আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমি এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তা হই।

নাগরিক বিস্মিত হন, বলেন—ভদ্রে, ভূমিকার কী প্রয়োজন? আমরা কেউ কারো কাছে বদ্ধ নই। আমি নিজেও প্রবৃত্তি-আক্রান্ত, ক্লান্ত ও পিপাসু। আমাকে আশ্রয় দাও। তুমিও প্রার্থনা করো, যেন আমি প্রকৃতিজাত দুষ্ট আচবণ থেকে মুক্ত হই। পুরুষের প্রধান পৌরুষ সংযমে ও আত্মশাসনে। আমিও ব্যতিক্রম-দুষ্ট, অসহায়। তোমার গৃহের ধুলাব স্পর্শ আমার ললাটে মঙ্গলচিহ্নস্বরূপ লেপন কব।

রাজা শুনছেন। রাজা দেখছেন।

আজ পূর্ণিমা।

শূন্য সভাকক্ষে দীপ নির্বাপিত। চারজন প্রস্তরীভূত নীবব দৌবারিক চারটি দ্বার প্রহরা দিচ্ছে। নিস্তব্ধতা।

রাজা সিংহাসনে বসে আছেন। সামনে প্রসাবিত তাঁর ক্লান্ত পা, দুটি হাত দুদিক থেকে উঠে এসে গম্বুজের মতো ভাব রক্ষা করছে তাঁব চিবুকের। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কেবল ঈগলচঞ্চুর মতো তাঁর দীর্ঘ নাসার সামান্য আভাস পাওয়া যায়। কপিশ চোখ দুখানিতে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব। আর তাঁর মুকুট থেকে একটি মাণিক্যের দ্যুতি মাঝে মাঝে প্রতিভাত হচ্ছে।

রাজা একা। রাজা নীরব।

সভাগৃহের অলিন্দের স্তম্ভগুলির পরিসর দিয়ে জ্যোৎস্নার দুগ্ধধারা ভেসে আসছে। আজ শুক্লপক্ষের শেষ।

রাজা বসে রইলেন। চিন্তান্বিত। ব্যথিত। উদ্বিগ্ন। নগরীর কোলাহল তাঁর কানে আসছে। কাল থেকে তিনি আর নগর বা জনপদ পরিভ্রমণ করবেন না। কাল থেকে পক্ষকাল কৃষ্ণপক্ষ।

গভীর একটি শ্বাস মোচন করলেন তিনি।

সভাকক্ষে, সারি সারি শূন্য আসনগুলির মধ্যে হঠাৎ একটি বিশীর্ণ ছায়া নড়ে উঠল। চন্দ্রালোকের আভায় দেখা গেল একটি মানুষ যেন এইমাত্র প্রেতলোক থেকে শরীর-গ্রহণ করল। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল রাজার দিকে।

রাজা বিস্মিত বা চমকিত হলেন না। তাঁর কপিশ চোখ কেবল স্থির চেয়ে ছিল। ওষ্ঠে একটু দয়াল হাস্য।

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর ধুলায় লুটিয়ে প্রণাম করল রাজাকে। কৃতাঞ্জলিপুটে সামনে দাঁড়াল।

রাজা নিজের অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন—তুমি কে?

লোকটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—মহারাজ, আমিই সেই ভাগ্যবান যার ভাগ্য এই শুক্লপক্ষে আবর্তিত হয়েছে।

রাজা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—দ্বারে দৌবারিক, প্রাসাদ সুরক্ষিত, এখানে প্রবেশ করলে কী উপায়ে?

অশ্রুমার্জনা করে লোকটি হাসল, বলল—সর্বজ্ঞানই আপনার অধীন। আপনি সবই জানেন। হে দয়াল রাজা, আমি একদা নরহত্যা, নারীধর্ষণ, পরস্বাপহরণ সবই করেছি। নগরীর যে-কোনো সুরক্ষিত গৃহে গোপনে প্রবেশ করা আমার কাছে অতি সহজ।

রাজার মুকুটের সেই মাণিক্যের দ্যুতি লোকটির চোখে এসে পড়ল। রাজা বললেন—তারপর?

—রাজাদেশে আমার দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

—তুমি কি অনুতপ্ত? তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি সম্পূর্ণ?

লোকটি তার বিশীর্ণ মুখ তুলে বলল—রাজা আমি তার কি জানি! যখন বিচারের জন্য আপনার সম্মুখে আনীত হয়েছিলাম তখনই আপনাকে প্রথম দেখি। ঐরূপ সুঠাম সুন্দর তনু, ঐ রাজকীয় গাম্ভীর্য ও করুণাঘন মুখশ্রী, কপিশ চোখের স্নেহ ও তীব্রতা আমাকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। সেই বিহ্বলতা এমনই ছিল যে আমার দণ্ড কতখানি কঠোর তা পর্যন্ত আমি অনুভব করতে পারিনি। তারপর দীর্ঘ কারাবাস। কারাগারে আমাকে কঠোর অনুশাসনে চলতে হত, ছিল অসম্ভব কায়িক শ্রম, নিদ্রা বা আহার যথেষ্ট ছিল না। শুনেছি, প্রতি শুক্লপক্ষে রাজা বহির্গত হন, অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর উপঢৌকন দিয়ে যান। সেই উপঢৌকনের সঙ্গে থাকে রাজকীয় পাঞ্জা, যার প্রভাবে যে-কেউ রাজার প্রায় সমকক্ষ হয়ে ওঠে। প্রতি শুক্লপক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রজার মতো আমিও প্রতীক্ষা করতাম রাজকীয় পদধ্বনির। যদি রাজা

আসেন, যদি তাঁর দয়া হয় তবে আমি মুক্তিলাভ করব, ঐশ্বর্যশালী হবো। প্রতীক্ষায় এবং বিরহে দিন কাটে। শ্রম বড কষ্টকর হয়ে ওঠে, কারাবাস অনন্ত বলে মনে হয়। স্ত্রীপুত্রদের ভবিষ্যৎ জানি না। কারাবাসে কোনো প্রমোদ নেই, স্নেহ নেই, আত্মমর্যাদা নেই। কিন্তু আমার একটি চিন্তা সর্বদা ছিল। রাজার চিন্তা, কাজকর্মে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্বদাই মন বলত, রাজা আসবেন। রাজা উপহার দেবেন, মুক্তি দেবেন। ক্রমে এই চিন্তায় আমি এক অসহনীয় সুখ লাভ করতে থাকি। মাঝে মাঝে অভিমান হত, রাজা আসেন না কেন? এই অভিমান থেকে একদা আমার প্রলোভন বিদায় নিল। আমি প্রতিদিন শয়নকালে ও শয্যাত্যাগেব সময়ে প্রার্থনা করতাম—রাজা, আমি উপঢৌকন চাই না, মুক্তিও নয়। একবার তোমার অসহনীয় সুন্দব রূপ নিয়ে দেখা দাও। আমার সর্ববিধ তুচ্ছতা ধন্য হোক। মহারাজ, মানুষ এ রাজ্যে শুক্লপক্ষে সদাচার করে, কৃষ্ণপক্ষে যথেচ্ছাচার। কারণ কৃষ্ণপক্ষে আপনি রাজাবরোধে থাকেন, বহির্গত হন না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বিপরীত হয়। আপনার প্রতি আমার পিপাসা এত বেড়ে ওঠে যে শুক্লপক্ষের প্রতীক্ষা শেষ হলে কৃষ্ণপক্ষব্যাপী আমি আরো ব্যাকুল হয়ে আপনার অনুধাবন করতাম। আপনার প্রদত্ত ঐশ্বর্য নয়, আপনাকেই আমার প্রয়োজন। আর কিছু চাই না। আমার কারাবাস আরো দীর্ঘতর হোক বা আমাকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হোক, আমি কেবল আপনার মুখশ্রী তার বিনিময়ে একবার মাত্র প্রত্যক্ষ করতে চাইতাম! এইভাবে আমার কারাবাসের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। চতুর্দশী তিথিতে, শুক্লপক্ষে, গতকাল আমি মুক্তিলাভ করি। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী গতপ্রাণা হয়েছেন, পুত্রকন্যারা ইতোভ্রষ্টস্ততোঃনষ্ট হয়েছে, কারো উদ্দেশ জানি না। একাকী রাজপথে চলেছি, মন কেবল বলছে—রাজা! রাজা! শুক্লপক্ষের চতুর্দশী, রাজা ছদ্মবেশে পথে বিচরণ করছেন। তাই আমি পথচারীদের দিকে তাকাই, দীন দরিদ্রের পায়ের ধুলা গ্রহণ করি, ভিখারীদের বুকে টেনে নিই, ক্ষত ধুয়ে দিই, পরিচর্যা করি। সকলের মুখেই আমার রাজার আদল দেখতে পাই। তবু বুকভরা হাহাকার—রাজা! দেখা দাও। রাত্রিবাসের স্থান ছিল না। এক বৃক্ষতলে শয়ান ছিলাম। আজ ব্রাহ্ম সময়ে ঘুম ভেঙে দেখি আমার বুকের ওপর আপনার সেই পেটিকা। তাতে রাজার ঐশ্বর্য, রাজকীয় পাঞ্জা।

এই বলে লোকটি তার কোমর থেকে লুক্কায়িত পেটিকাটি বের করে কৃতাঞ্জলিপুটে রাজার সামনে ধরে রইল। বলল—আপনার পেটিকা। গ্রহণ করুন মহারাজ।

রাজা মৃদুহাস্যে বললেন—তুমি গ্রহণ করবে না?

লোকটির মুখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিল, বলল—আপনার পবিত্র পাঞ্জা আমি বক্ষদেশে সংলগ্ন রেখেছি, কারণ তাতে আপনার হাতের ছাপ আছে। আর, আপনার যা কিছু ঐশ্বর্য আছে তা সবই আমি পেয়েছি। রাজদর্শনের বিধি অনুসারে এটুকু আমার রাজদর্শনের প্রণামীস্বরূপ আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা উচ্চহাস্য করলেন। দৌবারিকরা ছুটে এল। রাজা হস্তোত্তোলন করে তাদের নিবারণ করলেন। তারপর সিংহাসন থেকে দুহাত প্রসারিত করলেন রাজা, বললেন—বৎস দাও। কিন্তু আমাকে স্পর্শ কোরো না। তোমার প্রেম এতই তীব্র যে আমাকে স্পর্শ করলেই তুমি লয় পাবে।

লোকটি দিল। রাজা গ্রহণ করে বললেন—প্রতি শুক্লপক্ষের পূর্ণাতিথিতে এই পেটিকাটি আমিই লাভ করি বৎস।

হাওয়া-বন্দুক

দিন যায়। থাকে কথা।

মণিকার দিন যায়। কিন্তু কি ভাবে যায় কেউ কি তা জানে? তার সুখের ধারণাও খুব বড় নয়, দুঃখের ধারণাও নয় বড়। ছোট সুখ, ছোট দুখে দিন তার কেটে যেত। বুকের মধ্যে প্রজাপতির মতো উড়ন্ত একটুখানি সুখ, বা ছোট্ট কাঁটার মতো একটু দুঃখ—এ তো থাকবেই। নইলে বেঁচে যে আছে তা বুঝবে কেমন করে মণিকা! কিন্তু সুখ দুঃখের সেই ছোট ধারণা ভেঙে, দুয়ার খুলে বিশাল পুরুষের মতো অচেনা দুঃখ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন লুঠেরার মতো দাবি করে সর্বস্ব, তখন সেই দুঃখ আকাশ বা সমুদ্রের মতো ভুবন-ব্যাপ্ত বিশালতার ধারণা নিয়ে আসে। মণিকার দুর্বল মাথায় তা যেন ধরে না।

গড়ের মাঠে শীতের মেলায় তারা হেঁটেছিল দুজনে। তখন টুকুন ছিল না। সঞ্জয়ের সঙ্গে তখনো তার বিয়ে হয় নি। চুরি-করা দুর্লভ বিকেলে তারা ঐ রকম বেরোতে পারত। সঞ্জয় অফিস থেকে বেরিয়ে আসত, মণিকা পালাত কলেজ থেকে। একদিন তেমনি তারা গিয়েছিল শীতের মেলায়। মেলায় ছিল রঙীন আলো, সজ্জিত মানুষের ভিড়—নাগরদোলা, লক্ষ্যভেদের দোকান। ছিল ধুলো, শীতের বাতাস আর ছিল রোমহর্ষ। বিষণ্ণতা কোথাও ছিল না।

লক্ষ্যভেদের দোকানে চক্রাকারে সাজানো বেলুন, ঝুলন্ত খেলনা, বল, দোকানী ডাকছে—

—প্রতি শট্ পাঁচ পয়সা, আসুন, হাতের টিপ দেখে নিন।

সঞ্জয় দাঁড়ায়।

—মণিকা, হাতের টিপ দেখি?

মণিকা—কী হবে ছাই! হাতের টিপ দেখে!

—দেখিই না, যদি অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করতে পারি।

—তাহলে কী হবে?

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে কি যেন পেয়েছিল!

—দ্রৌপদী।

—আমিও পাবো মণিকাকে।

—পেয়ে তো গেছোই। সবাই জানে আমাদের বিয়ে হবে।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, মণিকা তোমাকে বড় সহজে পেয়ে গেছি আমি। ঠিক। ডুয়েল লড়তে হয় নি, যুদ্ধ করতে হয় নি, মা-বাবা বাধা দেয় নি। কিন্তু এত সহজে কিছু কি পাওয়া ভাল?

মণিকা ভ্রূ কুঁচকে বলে, ভাল নয়, তবে তুমি কি চাও তোমার আমার মধ্যে বাধাবিঘ্ন আসুক?

—না না তা নয়।

—তবে কি তুমি আমাকে মোটেই চাও না আমি সহজলভ্যা বলে?

—তাও নয়। তোমাকে চাই। কিছু এত সহজে নয়। সহজে কিছু পেলে মনে হয় পাওয়াটায় সম্পূর্ণ হচ্ছে না। জয়ের আনন্দই আলাদা।

মণিকা হাসল, বলল—তবে বরং আমি কিছুদিনের জন্য অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে যাই! কিংবা চলে যাই দুবছরের জন্য দিল্লীর মাসীর বাড়িতে, বি. এ. পরীক্ষাটা না হয় ওখানেই দেব। নইলে চল, ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি। তুমি অনেক ঝামেলা-টামেলা করে আমাকে ফের বাঁচিয়ে তোল। তাতে বেশ দুর্লভ হয়ে উঠি আমি।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলে—না, না, অতটা করার কিছু নেই। বরং ঐ টারগেটের দোকানে চল। একটা বেলুন দেখিয়ে দাও। আমি ফাটাব।

—ফাটালে কি হবে?

—তোমাকে জয় করা হবে।

—না পারলে?

—জয় করা হবে না।

—তা হলে আমাদের বিয়েও হবে না?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল—না।

—বাবা, তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সব কিছু সহজে পেতে ভালবাসি।

সঞ্জয় তার হাতখানা ধরল। বলল—মণিকা।

—উঁ।

—ওই যে মাঝখানের হলুদ রঙের বেলুনটা, ওটাকে ফাটাব। তিন চান্সে।

—যদি না পার?

—না পারলে—

কথা শেষ করল না সঞ্জয়।

—না পারলে?

—বিয়ে হবে না।

মণিকা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, শোন।

—কি ?

—তুমি ইয়ার্কি করছ ?

—না।

—সিরিয়াস ?

—ভীষণ !

মণিকা শ্বাস ছেড়ে বলে,—তুমি ভীষণ জেদী। পুরুষমানুষের জেদ থাকা ভাল, কিন্তু যার উপর আমাদের মরণ-বাঁচন তা নিয়ে তোমার খেলা কেন ?

সঞ্জয় কাতর স্বরে বলে,—মণিকা, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই তোমার আমার ভাব। পাশাপাশি বাড়িতে বড় হয়েছি। বড় হতে হতেই জেনে গেছি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কত সহজ ব্যাপারটা বল তো ! কোনো রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই ; প্রতিযোগিতা নেই। এ কেমন পাওয়া ! আজকের দিনটাই একটু ক্ষণের জন্য এস একটু দুর্লভ হই। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তা খেলা করুক আমাদের সম্পর্কের মধ্যে।

মণিকার বড় অভিমান হয়েছিল মনে মনে। সে কি বাজীকরের দোকানের জিনিসের মতো হয়ে গেছে ? সে কি লটারীর পুরস্কার ? তাদের এতদিনকার সম্পর্ক একটা হলুদ বেলুনের আয়ুর উপর নির্ভর করবে অবশেষে ? ছোট্ট একটু দুঃখ কাঁটার মতো ফুটল বুকে। ছোট্ট কাঁটা, কিন্তু তার মুখে বড় বিষ, বড় জ্বালা। মণিকার চোখভরে জলও কি আসে নি ? এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে সে সেই জলটুকু মুছে ছিল গোপনে। বলল—শোন, আমি লটারীর প্রাইজ নই। আমি তোমাকে পেতে চেয়েছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তোমাকে যে ভালবাসি সে আমার পুজো। আমি কেন নিজেকে অত হাল্কা হতে দেব ? তুমি চল, ঐ দোকানে যেও না। ও খেলা ভাল নয়।

কিন্তু সঞ্জয় বড় জেদী, ঐ জেদই তাকে পুরুষ করেছে ! ও জেদই মণিকাকে মুগ্ধ করেছে কত বার। সঞ্জয় মাথা নাড়ল। মুখে হাসি নিয়ে বলল—শোন মণিকা, বেলুনটা আমি ঠিক ফাটাব।

—এ সব নিয়ে খেলা কর না। চলে এস।

—না, প্লীজ, তিনটে চান্স দাও।

মণিকা একটা শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে করে বলল, কিন্তু মনে রেখ, যদি না পার এ বিয়ে হবে না।

—আমিও তো তাই বলছি !

মণিকার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। গলা ধরে যায় আবেগে। সঞ্জয়ের কাছে তার অস্তিত্ব কি এতই পল্কা ! যদি ও না পারে তবে সে ওর কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে ! এই সামান্য খেলায় সারা জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে তারা ? মণিকা ইচ্ছে করলে সঞ্জয়কে টেনে আনতে পারত জোর করে, কিংবা কেঁদে-কেটে বায়না করে নিবৃত্ত করতে পারত, যেমন সে অন্য সময় করে। কিন্তু ঐ সর্বনাশা মুহূর্তে হঠাৎ এক অহংকার-অভিমান-জেদ চেপে ধরল মণিকাকেও। তার জলভরা চোখ থেকে বিদ্যুৎ বর্ষিত হল। কান্নাটা চেপে রেখে সে বলল—বেশ।

দোকানী বন্দুক ভরে এগিয়ে দিল। সঞ্জয় বন্দুক তুলে একবার মণিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল—মাঝখানের ঐ হলুদ বেলুনটা। বুঝলে লক্ষ্য কর।

—করছি। গম্ভীরভাবে বলে মণিকা।

সঞ্জয় কাঁধ পর্যন্ত বন্দুক তোলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য স্থির করতে থাকে। মণিকার একবার ইচ্ছে হয়, বন্দুকটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। সে তৃষিত চোখে চেয়ে দেখছিল, সঞ্জয়ের দীর্ঘকায়, সুন্দর দেহটি। ধারাল মুখ। অবিন্যস্ত চুল নেমে এসেছে কপালে। ঐ পুরুষ, আবাল্য পরিচিত মানুষটি একটু ভুলের জন্য চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে জীবন থেকে ! এ কী ছেলেমানুষি !

ট্রিগার টিপল সঞ্জয়। শব্দটা ছড়াক করে মণিকার বুকে এসে ধাক্কা মারল। নড়িয়ে দিল তার দুর্বল হৃৎপিণ্ড। দেওয়াল ঘড়ির দোলকের মতো বুক দুলতে থাকে। সঞ্জয় পারে নি। হ্যাঁ এবং না—এর ভিতরে, আলো আর অন্ধকারের ভিতরে, সুখ ও দুঃখের ভিতরে টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ করে যাওয়া-আসা করে তার বুকের দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম। সে শুধু ফিসফিস করে বলে—আর মাত্র দু'টো চান্স। দেখ, সাবধান।

সঞ্জয়ের মুখের হাসি মুছে গেছে। ভ্রূ কোঁচকানো। সে আবার বন্দুক নেয় দোকানীর কাছ থেকে। তোলে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করে। কিন্তু মণিকা লক্ষ্য করে, ওর হাত কাঁপছে ! বড় মায়া হয় মণিকার। সে বুঝল, এবারেও সঞ্জয় পারবে না, দু'চোখ ভরে আবার জল এল তার। ভাঙা কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন অদ্ভুত দেখায় চারধারকে, তেমনি চোখের জলের ভিতর দিয়ে সে দেখতে পেল, রঙীন আলোর সুন্দর মেলাটি যেন ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রতিবিম্বই বলে দিচ্ছে, এ পৃথিবীর সুখ ভঙ্গুর, জীবন কত অনিশ্চিত।

সঞ্জয়ের হাওয়া-বন্দুকের শব্দ এবারও কাঁপিয়ে দিল মণিকাকে। সেই সঙ্গে যেন কেঁপে উঠল পৃথিবী, ভেঙে পড়ার আগে আর্তনাদ করে উঠল সমস্ত ভুবন।

দ্রুত দোল খেতে লাগল বুকের দোলকটি, যেন বা খসে পড়ার আগে সে তার শেষ দোলায় দুলছে। এবারও লাগে নি।

সঞ্জয়ের মুখে রক্ত এসে জমা হয়েছে। ফেটে পড়ছে ভয়ঙ্কর মুখখানা। দুটো চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করে উত্তেজনায়। তার ঠোঁট সাদা। দোকানী আবার বন্দুক ভরে এগিয়ে দেয়। নির্লিপ্ত গলায় বলে—এবার মারুন। ঠিক লাগবে।

—লাগবে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

দোকানদার তো ভেতরের কথা কিছু জানে না। সে তাই ভাল মানুষের মতো বলে—আসলে মনটা স্থির করাই হচ্ছে সত্যিকারের টিপ। চোখ আর হাত তো মনের গোলাম। মনটাকে স্থির করুন, ঠিক লাগবে।

সঞ্জয় বন্দুকটা শেষ বারের মতো হাতে নিল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে চাপা গলায় ডাকল, মণিকা।

—উ!

—যদি না লাগে, তবে?

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো জানই।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলে— জানি, ঠিক। তাই একটা কথা বলে নি যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক কবে থেকে শেষ হবে।

মণিকা ধীর গলায় বলল, আজ। এখন থেকে।

—আমরা একসঙ্গে ফিরব না?

—না।

—তুমি একা ফিরবে?

—হুঁ।

—আজ থেকে অন্য মানুষ হয়ে যাবে? আমার মণিকা আর থাকবে না তুমি?

—তুমিই তো ঠিক করেছ সেটা।

সঞ্জয় ম্লান একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল— মণিকা, এবারও যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে যাবে। তবু তোমাকে বলি নি, আমি তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালবাসতাম। আর কখনো কাউকে এত ভালবাসতে পারব না।

মণিকা রুমাল তুলে দাঁতে কামড়ে ধরল, তবু কি পারে দমকা কান্নাটাকে আটকাতে! কোনক্রমে কেবল অসহায় একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শোন।

—কী?

—শেষ চান্সটা থাক্। মের না।

—কেন ?

—আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ।

—আমিও।

—তবে ওটা থাক। সারাজীবনের জন্য বাকী থাক।

—হেরে যাবো মণিকা ? পালাবো ?

—তাতে কি ? কেউ তো জানবে না।

সঞ্জয় দ্বিধায় পড়ল কি ? বন্দুকটা রাখল, একটা সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কোঁচকালো, চোয়ালের পেশী দ্রুত ওঠানামা করল। সিগারেটটা গভীরভাবে টানল সে। ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মণিকার অস্পষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, কেউ জানবে না ? কিন্তু তুমি তো জানবে ?

—কী জানবো ?

—আমি যে পালালাম।

—আমি ভুলে যাবো।

সঞ্জয় মৃদু হাসে। মাথা নাড়ে।—তা হয় না। আমাকে বুকের মধ্যে নিয়েও তুমি মনে মনে ঠিকই জানবে যে এ লোকটা কাপুরুষ। এ লোকটা শেষবার বন্দুক চালাতে ভয় পেয়েছিল। মণিকার চোখের জল গড়িয়ে নামল। দোকানদার অবাক হয়ে দেখছিল তাকে। সামান্য বেলুন-ফাটানো টারগেটের খেলায় কান্নাকাটির কী আছে তা তো তার জানা ছিল না। রঙীন আলোর মেলায় আনন্দিত মানুষজন কেউই জানত না, মেলার মাঝখানে কী এক সর্বনাশা ঘটনা কত নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে ! সঞ্জয় ধীরে বন্দুকটা তুলে নেয়। মণিকা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাওয়া বন্দুকটা ধীরে ধীরে কাঁধের কাছে তুলে নিচ্ছিল সঞ্জয়। দিন যায়, কথা থাকে। দোকানদার বলেছিল—হাত আর চোখ হচ্ছে মনের গোলাম। মন স্থির থাকলে লক্ষ্যভেদ হয়।

মণিকা ভাবে—তবে কি মনই স্থির ছিল না সঞ্জয়ের ? মণিকার প্রতি তবে কি স্থির ছিল না সঞ্জয়ের মন ? তাহলে কেন বন্দুকের খেলার ঐ হেলাফেলা উদাসীনতা ? মণিকা দাঁতে রুমাল ছিঁড়ে ফেলল টেনে। দু'হাত প্রাণপণে মুঠো করে তার চারধারে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের পৃথিবীকে দেখে নিল। নিষ্ঠুর, এবার চালাও ঐ খেলনা-বন্দুক। ভেঙে পড়ুক মণিকার জগৎ-সংসার। সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে আজ একা ঘরে ফিরে যাবে মণিকা।

চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুন। ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটা।

ফাটবে, না কি ফাটবে না? সঞ্জয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে। নলের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকে বেলুনটার দিকে। পৃথিবী সুতোয় ঝুলছে। ছিঁড়বে। এক্ষুনি ছিঁড়বে।

হাওয়া-বন্দুকের শব্দ শেষবারের মতো বেজে উঠল। সঞ্জয়ের স্খলিত হাত থেকে বন্দুকটা খসে যায়। মণিকা শিউরে ওঠে। ফিরে তাকায়।

চক্রের মাঝখানে হলুদ বেলুনটা নেই। ফেটে গেছে। নরম রবার ঝুলে আছে ন্যাকড়ার মতো। দোকানদার বলল, বাঃ, এই তো পেরেছেন!

তারা দু'জনে কেউই বিশ্বাস করে নি প্রথমে যে বেলুনটা সত্যিই ফেটেছে। বুঝতে সময় লাগে।

বিহ্বল গলায় সঞ্জয় ডাকে—মণিকা!

—উঁ।

—লেগেছে।

—যাঃ।

—সত্যিই। দ্যাখো।

মণিকা কাঁদে। তারপর চোখের জল মুছে হাসে। মেলাটা কেমন রঙীন আলোয় ভরা। সজ্জিত মানুষেরা কেমন হেঁটে যাচ্ছে চারদিকে। অবিরল ঘুরে যাচ্ছে নাগরদোলা। বেলুনটা ফেটেছে—সেই আনন্দ সংবাদ নিয়ে শীতের বাতাস চলে যায় দিগ্বিদিকে। চারধারকে ডেকে যেন সেই বাতাস বলতে থাকে —আনন্দিত হও, সুন্দর হও, সব ঠিক আছে।

তবু দিন যায়। কথা থাকে। বিয়ের পর চার বছর কেটে গেছে। তারা দু'জন এখন তিনজন হয়েছে। টুকুন তিন বছরে পা দিল। সেই মেলায় পা দিল। সেই মেলার হাওয়া-বন্দুকের খেলা তাদের কি মনে পড়ে? পড়ে হয়তো, কিন্তু কেউ মুখে বলে না। সঞ্জয় সিগারেট খেত খুব। মণিকা কোনোদিন আটকাতে পারে নি। রাত বিরেতে উঠে কাশত। মণিকা ঘুম ভেঙে উঠে উদ্বেগের গলায় বলত—ইস্। কী কাশি হয়েছে তোমার। মাগো!

সঞ্জয় কাশতে কাশতে বলে—স্মোকারস্ কাফ। ও কিছু নয়, বলেই আবার সিগারেট ধরাত।

—আবার সিগারেট ধরালে?

—সিগারেটের ধোঁয়া না লাগলে এ কাশি কমবে না। সিগারেট থেকেই এই কাশি হয়। সিগারেট খেলেই আবার কমে যায়।

—বিছানায় বসে খাচ্ছ, ঠিক একদিন মশারীতে আগুন লাগবে।

সঞ্জয় উদাস স্বরে বলে—লাগুক না।

—লাগুক না ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। শীগগির সিগারেট নেভাও।

সঞ্জয় হাসতে থাকে, সিগারেট সরিয়ে নিয়ে বলে—আগুন লাগলে কী হবে মণিকা! সংসারটা পুড়ে যাবে। এই তো? পৃথিবীতে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাক্ না পুড়ে।

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে—তুমি বড় পাষাণ, বুঝলে! বড় পাষাণ!

সঞ্জয় উত্তর দেয়—তুমি তো জানই।

মুখে যাই বলুক মণিকা, মনে মনে জানে, একটুও নিষ্ঠুর নয় সঞ্জয়, একটুও পাষাণ নয়। বরং বেশী মায়ায় ভরা সঞ্জয়ের মন। তবু তারা সুখীই ছিল। সংসারে নানা সুখ-দুঃখ ছায়া ফেলে যায়। ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট দুঃখ। সে সুখ-দুঃখ কোন সংসারে নেই। সঞ্জয় মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করে। তিন বছরের টুকুন সকাল আটটায় তার নার্সারি স্কুলে যায়। সারাদিন সংসারের গোছগাছ নিয়ে থাকে মণিকা। সে জানে তার স্বামী সঞ্জয় একটু উদাসীন তা হোক, তবু স্ত্রৈণ পুরুষের চেয়ে অনেক ভাল।

সংসারের হাজার কাজের মধ্যে যখন অবসর পায় মণিকা, তখন দক্ষিণের জানালার ধারে আলোয় এসে বসে। টুকুনের জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে। বাপের বাড়িতে চিঠি লিখে, রেডিও বাজিয়ে কখনো বা নিজেই গান গায় গুনগুন করে। সেইসব অন্যমনস্কতার সময়ে কখনো কখনো হঠাৎ মনে পড়ে দৃশ্যটা। চার-ধারে সেই রঙীন ভয়ঙ্কর খেলাটা বেশ জেগে ওঠে। দূরাগত চীৎকার শুনতে পায়, এক দোকানদারই ডেকে বলছে প্রতি শট্ পাঁচ পয়সা, আসুন হাতের টিপ দেখেন।

আর তখন, মণিকা যেন সত্যিই দেখতে পায়, সামনে চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুনের ঠিক মাঝখানেই হলুদ বেলুনটি। সঞ্জয় হাওয়া-বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে মুমূর্ষু পৃথিবী ভেঙে পড়ার আগে কেঁপে উঠছে, মণিকার বুকে দেওয়াল ঘড়ির দোলক ধাক্কা দেয়, পড়তে থাকে।

রাতে আজকাল সঞ্জয় বড় বেশী কাশে। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে তার। মণিকা ওঠে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে—জল খাও তো!

—দাও।

—কাল তুমি ডাক্তারের কাছে যেও।

—দূর দূর! ডাক্তাররা একটা না একটা রোগ বের করেই, রোগ না থাকলেও। এ কাশি কিছু না। সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে।

—খেও না, পায়ে পড়ি।

—আঃ দাও না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কমবে না।

—রোজ তোমার এক কথা। তুমি আগে ডাক্তার দেখাও তো!

—ডাক্তাররা কিছু জানে না।

—তুমি খুব জানো।

—আমি ঠিক জানি। বরং একটা ওষুধ কিনে আনব।

মণিকা বিছানায় বসে সঞ্জয়ের চওড়া রোমশ বুকের ওপর হাত রাখে স্নেহে, এই পুরুষটিকে সে খুব চিনে গেছে। ভারী একগুঁয়ে, জেদী। তবু ভেতরে ভেতরে মেয়েদের মতোই নরম।

বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মণিকা বলে—নিজের ওপর তোমার একটুও নজর নেই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ওপরে আছো। এতো ভাল নয়, বুঝলে? কাল থেকে সকালে আর দু'কাপ চা দেবো না, দ্বিতীয় বারে, চায়ের বদলে দুধ দেবো।

—ধুস্।

—ওসব বললে চলবে না। খেতে হবে, আর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে। সারাটা দিন তো বাসাতেই থাকো না। ঠিক যেন পেয়িং গেস্ট্।

—সারাক্ষণ ঘরে থাকা যায়?

—তাহলে আমি কী করে থাকি?

—মেয়েরা পারে, সংসারে তাদের জান্ পোঁতা হয়ে থাকে।

—তাই নাকি! আর, তোমার জান্ কোথায় পোঁতা আছে শুনি! নতুন করে কারো প্রেমে পড়ো নি তো?

সঞ্জয় হাসে, ইচ্ছে তো করে একটা হারেম বানিয়ে ফেলি কিন্তু এ বয়সে কে আর ফিরে তাকাবে বল।

ফিরে তাকাবার লোকের অভাব নেই। সেদিন মন্নুর বিয়েতে ওর যে একদল কলেজের বন্ধু এসেছিল তাদের মধ্যে একজন শ্যামলা মতো মেয়ে হাঁ করে তোমাকে খুব দেখছিল।

—যাঃ! তোমার যতো বানানো কথা।

—সত্যি বলছি, মাইরি।

—আমার গা ছুঁয়ে বলছো তো।

—ও বাবা! বলে মণিকা হাত টেনে নেয়।

—কী হল! হাতটা সরিয়ে নিলে কেন?

—তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম যে।

সঞ্জয় হাসে, গা ছুঁয়ে বলতে সাহস হচ্ছে না, তার মানে মিথ্যে কথা বলছো।

—না-গো, সত্যিই মেয়েটা দেখছিল।

—তবে গা ছুঁয়ে বলো।

—না না। তোমাকে ছুঁয়ে আমি কখনো দিব্যি গালি না।

সঞ্জয় বলল—তাহলে বলি, তুমি যে বড় দর্জির দোকানে ব্লাউজ বানাতে দাও সেখানকার সুন্দর মতো সেল্‌সম্যানটি তোমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে—

—যাঃ, বলবে না, নোংরা কথা। বলে মণিকা।

আর সেদিন পাড়ার ছেলেরা যে চাঁদা চাইতে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন কেন তোমার কাছে জল খেয়ে গেল জানো?

—এই, এই, এমন মারবো না; কেবল বানাচ্ছে, চুপ করো। ওসব শুনলেও পাপ।

তারা দুজনেই খুব হাসতে থাকে। কারণ তারা জানে ওসব কথা সত্যি নয়, কিংবা হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ভালবাসা গভীর, গভীর।

সকালে টুকুন দুলে দুলে পড়ছে—ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শীপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার থ্রী ব্যাগ্‌স ফুল।

মণিকা রান্নাঘরে ঝিকে বকছে—রোজ তোমার আসতে বেলা হয়ে যায়। এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে ঝাঁটপাট হয় নি, সাতটা বেজে গেল, টুকুনের স্কুলের বাস আসবে এক্ষুনি, কখন কী হবে বল তো?

ঝি উত্তর দেয়, কি করব বৌদি, বড় বাড়িতে বেশী মাইনে দেয়, তারা সহজে ছাড়তে চায় না। কেবল এটা করে যাও, ওটা করে যাও। তোমার বাড়ি সেরে আবার এক্ষুনি ও বাড়ি দৌড়তে হবে।

—বেশী মাইনে যখন, তখন ও বাড়ির কাজই ধরে রাখো, আমারটা ছেড়ে দাও। আমি অন্য লোক দেখে নিই, পইপই করে বলি আমার ছেলের সকালে ইস্কুল, কর্তারও অফিস ন'টায় একটু তাড়াতাড়ি এসো। তুমি কেবল বড়লোকের বাড়ির বেশী মাইনের কাজ দেখাও।

[বাথরুম থেকে ক্রমান্বয়ে কাশির শব্দ আসে]

টুকুন এক নাগাড়ে ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শীপ পড়ে যাচ্ছে। মণিকা ডাক দিয়ে বলে, টুকুন কেবল ঐ কবিতাটা পড়লেই হবে? একটু অঙ্ক বইটা দেখে নাও। কাল অঙ্কে ব্যাড্‌ পেয়েছো।

মণিকা—বাথরুম থেকে ক্ষীণ গলায় সঞ্জয় ডাকে।

মণিকা উত্তর দেয়, কি বলছ?

—একটু শুনে যাও।

—দাঁড়াও, আমার হাত জোড়া, ডালে সম্বর দিচ্ছি।

—এসো না।

—উঃ আমি যেতে পারব না। টুকুনের টিফিন বাক্স গোছানো হয় নি, জলের বোতলে জল ভরা হয় নি। এক্ষুনি বাস এসে পড়বে।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে, তারপর আবার শোনা যায়, তার কাশির শব্দ। দম বন্ধকরা সেই কাশি ; তারপরই ওয়াক্ তুলে বমি করার শব্দ হয়।

—ওমা! কি হল! বলে মণিকা উঠে বাথরুমের বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দেয়—এই কী হয়েছে? এই—ভিতর থেকে উত্তর আসে না, কেবল বেসিনে জল পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে থাকে।

দরজায় ধাক্কা দেয় মণিকা। এই, দরজাটা খোলো না। কী হয়েছে তোমার? বমি করছো কেন?

সঞ্জয় উত্তর দেয় না।

মণিকা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেয়—এই, কী হয়েছে? ওগো, দরজাটা, খোলো না।

মণিকা চিৎকার করে ডাকে সুধা, এই সুধা—

সুধা দৌড়ে আসে—কী হল গো বৌদি?

—ছাখো, তোমার দাদাবাবু দরজা খুলছে না। কী জানি কী হল, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

—শরীর খারাপ ছিল?

—হ্যাঁ, তুমি শীগগির বাড়িওলাকে খবর দাও।

কিন্তু খবর দেওয়ার দরকার হয় না। ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়, দরজা খুলে দেয় সঞ্জয়। তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বিমূঢ় হয়ে যায়। অত বড় মানুষটাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে। ঠোঁট সাদা, মুখে রক্তাভা, চোখের দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে। একটা হাত বাড়িয়ে সঞ্জয় বলে—ধরো আমাকে।

মণিকা দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার মানুষটাকে। কী মস্ত শরীর, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক স্বামীটি তার কী হল, কী হতে পারে মানুষটার?

—কী হয়েছে তোমার ওগো?

—কী জানি, কাশি এল খুব, কাশতে কাশতে বমি হয়ে গেল। আমাকে একটু শুইয়ে দাও।

...বাইরে বাসের হর্ন বাজে। টুকুন দৌড়ে আসে। মা, বাস এসে গেছে। টিফিন বাক্স আর জলের বোতল দাও।

—দিচ্ছি, দিচ্ছি বাবা।

টুকুন বাবাকে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে বাবা?

—কিছু না।

—শুয়ে আছো কেন? আজ তোমার ছুটি?

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে—ছুটি! না ছুটি নয়। তবে বোধ হয় এবার ছুটি হয়ে যাবে।

—কেন বাবা?

—মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয়ে যায় বিনা কারণে। বলে সঞ্জয় হাসে। বলে, তোমাকে খ্যাপালাম। কিছু হয় নি। তুমি ইস্কুলে যাও।

—যাই বাবা, টা টা।

—টা টা।

বাইরে বাসের শব্দ হয়।

মণিকা গম্ভীরভাবে ঘরে আসে। হাতে দুধের কাপ। চামচে দিয়ে ভাসন্ত পিঁপড়ে তুলছে। কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দুধটা খেয়ে নাও।

—খেতে ইচ্ছে করছে না। এখনও বমির ভাবটা আছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।

—আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, সিগারেটের প্যাকেটটা দাও।

—না, আর সিগারেট নয়।

—দাও না, মুখটা টক-টক লাগছে। সিগারেট খেলে বমির ভাবটা কমবে।

মণিকা বলল, না, এত বাড়াবাড়ি আমি করতে দেবো না।

ওঃ বলে সঞ্জয় হতাশভাবে চেয়ে থাকে।

—শোনো, তুমি টুকুনকে কী বলছিলে?

—কী বলব?

—কিছু বলো নি? আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি।

সঞ্জয় একটু হাসে—কী শুনেছো?

—ঐটুকু ছেলেকে ঐ সব কথা বলতে তোমার মায়া হল না?

—ওকি বুঝেছে নাকি?

—না-ই বা বুঝল! তুমি বললে কেন? ছুটি মানে কী তা কি আমি বুঝি না?

—কী মানে বল তো?

—বলব না। তুমিও জানো, আমিও জানি।

—মণিকা সিগারেট দাও।

—না।

—তাহলে আবার কাশি শুরু হবে।

—হোক, সিগারেট কিছুতেই দেবো না। আগে বলো কেন বলেছিলে ঐ কথা।

—এমনিই।

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একটা দৃশ্য মনে পড়ে। মেলার দোকানে মণিকাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকে লক্ষ্যভেদের খেলা খেলছে সঞ্জয়। জীবনে মণিকা কোনোদিনই ঘটনাটা ভুলতে পারবে কি? পারবে না। মনে কেবলই সংশয় খোঁচা দেয়। যাকে ভালবাসে মানুষ তাকে কী করে এক মুহূর্তের খেয়াল-খুশীতে হারজিতের খেলায় নামিয়ে আনতে পারে? তবে কি সঞ্জয় কোনোদিনই তেমন করে ভালবাসে নি তাকে? সেই জন্যই কি এই সাজানো সুন্দর সুখের সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার বড় সাধ হয়েছে তার? ও টুকুনকে কেন বলল মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয় বিনা কারণে। ঐ ছুটির জন্য বড় সাধ সঞ্জয়ের?

মণিকা বিছানার একধারে বসল। স্বামীর মাথাটা টেনে নিল বুকের ধার ঘেঁষে। চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল, অমন কথা বলতে নেই, কখন স্বস্তির মুখে কথা পড়ে যায়। আর কখনো বলো না।

—আচ্ছা।

—আমাকে ছুঁয়ে বলো, বলবে না।

সঞ্জয় হাসল, বলল, সিগারেট দাও না মণিকা।

—না।

বাইরে বাড়িওয়ালার ছেলের ডাক শোনা যায়—বৌদি।

মণিকা বলে—বোধ হয় পল্টু ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল।

মণিকা বলল—আসছি পল্টু। মণিকা গিয়ে দরজা খোলে। ডাক্তারবাবু ঘরে আসেন।

—কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন।

সঞ্জয়ের কাশির দমকাটা আবার আসে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—কিছু না। স্মোকারস্ কাফ্।

—দেখি, আপনি ভাল করে শুন তো।

ডাক্তার সঞ্জয়কে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। মণিকাকে একটা টর্চ আনতে বলেন, টর্চ দিয়ে গলাটা দেখেন ভাল করে। গলার বাইরের দিকে

কয়েকটা জায়গা একটু ফুলে আছে। সেগুলো হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে জিজ্ঞেস করেন—এগুলো কতদিন হল হয়েছে ?

—কী জানি ! সঞ্জয় উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবুর মুখটা ক্রমে গম্ভীর হয়ে আসে। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে ওঠেন। মণিকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে আসে।

—ডাক্তারবাবু !

—বলুন।

—কী রকম দেখলেন ?

—তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। ওষুধগুলো দিন। দেখা যাক।

হঠাৎ এক অনিশ্চয়তা, এক ভয় চেপে ধরে মণিকার বুক। ভগবান, ডাক্তার কেন বুঝতে পারছে না ?

কয়েকদিন কেটে যায়। ওষুধে তেমন কোনো কাজ হয় না। কাশিটা যেমনকে তেমন থেকে যায় সঞ্জয়ের। কিছু খেতে পারে না, ওয়াক্ তুলে বমি করে ফেলে। শরীরটা জীর্ণ দেখায়। মস্ত চুল ভর্তি মাথাটা বালিশে ফেলে রেখে পায়ের দিকের জানালাটা দিয়ে উদাসভাবে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কেবল চেয়ে থাকে।

মণিকা ডাকে—শুনছো ?

—উঁ।

—একটু হাঁটাচলা করো। শুয়ে থাকো বলেই তোমার খিদে পায় না।

—একটা সিগারেট দেবে মণিকা ?

—না।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ !

মণিকার চোখে জল আসে, বলে—কোনোদিন তো বারণ করিনি জোর করে। অসুখ হল কেন বলো। ভাল হও তারপর খেও।

—যদি ভাল না হই ?

—ফের ঐ কথা ? তুমি বলেছিলে না যে আর বলবে না।

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে, চুপ করে থাকে। ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যায়। একদিন চিন্তিতমুখে ডাক্তার মণিকাকে আড়ালে ডেকে বলে—গলার ঘা-টা একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে। বরং ডাক্তার বসুকে একবার দেখান।

—আপনার কি মনে হয়।

—কিছু বলা মুশকিল। দীর্ঘস্থায়ী কোন ঘা দেখলে অন্যরকম একটা সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হয়তো তেমন কিছুই নয়। তবু দেখালে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে মণিকা শুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তারের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে তার দেরি হয় না। ডাক্তাররা সহজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন না, সুতরাং—

সুতরাং মণিকা বুঝতে পারে, এতকাল ছোট সুখ, ছোট দুঃখের সঙ্গেই ছিল তার ভাব-ভালবাসা। এখন হঠাৎ সদর দুয়ার গেছে যে খুলে, অচেনা, বিশাল পুরুষের মতো এক বড় দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। লুবিয়ার মতো, মণিকার ছোটো মাথা তা বইতে পারে না। এ যে আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ যেন সমুদ্রের মতো সীমাহীন, এ দুঃখ দাবি করে সর্বস্ব সমগ্র ভুবন কেড়ে নেয়।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে টুকুন। ভাত খেয়ে আলাদা বিছানায় ঘুমুচ্ছে। বড ঘাম হয় ছেলেটার। একটা মাত্র পাতলা জামা গায়ে, তবু জলধারায় ভেসে যাচ্ছে গলা বুক। কপালে মুক্তাবিন্দু, মণিকা নিচু হয়ে টুকুনের মুখ দেখে। সবাই বলে ওর শরীরের গঠন আর চোখ দুখানা সঞ্জয়ের মতো। নিবিড় পিপাসায় দেখে মুখখানি, মণিকা ফিস্‌ফিস্ করে ডাকে।

—টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওঠ টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওরে টুকুন বেলা গেল। ওঠ।

টুকুনের উত্তর নেই। নিঃসাড়ে ঘুমোয় সে। নিশ্চিন্তে।

টুকুন ওঠ্‌রে, আয় দুজনে মিলে একটু কাঁদি। ডাক্তার বাসুর চেম্বারে ফোন করল মণিকা, পোস্ট অফিসে গিয়ে।

—ডক্টর বাসুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—উনি দিল্লীতে আছেন।

—কবে ফিরবেন?

—কন্‌ফারেন্সে গেছেন। কাল কি পরশু ফেরার কথা।

—আমার যে ভীষণ দরকার।

—কী দরকার বলুন।

—দয়া করে বলবেন, ডাক্তার বাসু কিসের স্পেশালিস্ট।

ও পাশে লোকটা বোধহয় একটু হাসলো, বলল: ক্যান্সার।

—আমি কাল আবার ফোন করব। কোন সময়ে আসার কথা?

—সকালের ফ্লাইটে। তবে কিছু বলা যায় না, হয়তো আটকেও যেতে পারেন।

মণিকা সন্তর্পণে ফোনটি রেখে দেয়। বাসায় ফিরে দেখে সঞ্জয় শুয়ে আছে। উত্তর শিয়রে মাথা, পায়ের কাছে দক্ষিণের জানালা। শেষবেলার একটু রাঙা আলো এসে পড়ে আছে পাশে। সঞ্জয় চেয়ে আছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে। অবিরল চেয়ে থাকে আজকাল। কথা বড় একটা বলে না। টুকুনকে আদর করে না, মণিকাকেও না।

শেষ চান্স-এ হলুদ বেলুনটা না ফাটলে কোথায় থাকত মণিকা আর কোথায়ই বা সঞ্জয়। মণিকা সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। পিপাসায় তার ঠোঁট নড়ে, তার দুচোখ জলে ভেসে যায়। অচেনা পুরুষের মতো বড়ো দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ার খুলে। হাতে তার হাওয়া-বন্দুক, হলুদ বেলুনের মতো ঝুলে আছে। মণিকার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবে, ভেঙে যাবে বুক।

মণিকা শব্দ করে কেঁদে ওঠে। অবাক হয়ে সঞ্জয় চোখ ঘোরায়।

—কী হয়েছে?

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

সঞ্জয় বুঝতে পেরে মাথা নাড়ে, শ্বাস ফেলে বলে—কেঁদো না, আমাকে বরং এখন থেকে একটা করে সিগারেট দিও রোজ।

মণিকা হঠাৎ মুখ তুলে বলে—সিগারেট আর সিগারেট! সংসারে সিগারেট ছাড়া তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই?

না—মাথা নাড়ল সঞ্জয়।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

মণিকা কাঁদে, সঞ্জয় চুপ করে দক্ষিণের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে, টুকুন পাশের ঘরে ঘুমোয়।

অনেক কষ্টে ডাক্তার বাসুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারে মণিকা। সঞ্জয়কে নিয়ে একদিন হাজির হয় ছায়াচ্ছন্ন চেম্বারটায়। বাসু প্রবীণ ডাক্তার, বিচক্ষণ অভিজ্ঞ দুটি চোখ তুলে বললেন—কি হয়েছে? দেখি! বলে সঞ্জয়কে চেয়ারে বসালেন। আলো জ্বালালেন কয়েকটা, ঝুঁকে ওর মুখ দেখতে লাগলেন, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, হাওয়া-বন্দুক তুলেছে এক পাষাণ, দেয়াল ঘড়ি পেণ্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে, বুকের ভিতরটা এক হলুদ বেলুন দাঁতে-চিবিয়ে আজও রুমাল ছিঁড়লো মণিকা।

ডাক্তার বাসু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু হয় নি।

—মানে ? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

—যা সন্দেহ করে এসেছেন আমার কাছে, তা নয়। আজকাল সকলেরই এক ক্যান্সারের বাতিক, স্মোক করেন ?

—করতাম।

—টন্‌সিলটা পাকা ফ্যারিঞ্জাইটস্‌ আছে, সব মিলিয়ে একটা আলসার তৈরি হয়েছে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি। সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন।

সেরেও গেল সঞ্জয়।

একদিন বলল, শোনো মণিকা।

—কি ?

মনে আছে একবার মেলায় তোমাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকের খেলা খেলেছিলাম ?

—মনে আছে।

—সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করো।

মণিকা হাসে—তুমি কি ভাবো, শেষ চান্সে বেলুনটা না ফাটলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম ?

—যেতে না ?

—পাগল।

—কী করতে ?

—আমি বন্দুকটা নিয়ে বেলুনটা ফাটাতাম। না পারলে সেফ্‌টিপিন ফুটিয়ে আসতাম বেলুনটায় !

—তুমি ডাকাত, বলে সঞ্জয় হাসে।

অলক্ষ্যে হাওয়া-বন্দুক নামিয়ে পরাজিত এক অচেনা পুরুষ ফিরে যায়। তার লক্ষ্যভেদ হল না। বিদীর্ণ হয় নি মণিকার হৃদয়। সব ঠিক আছে। কোনোদিন আবার সেই বন্দুকবাজ ফিরে আসবে। লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবে বার বার, একদিন লক্ষ্যভেদ করবেও সে। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই রঙীন মেলায় আনন্দিত বাতাস বহে যাক্‌ এই কথা বলে—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

বলা হয় ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়। বলা হয়, বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়। হয়েও শেষপর্যন্ত অবশ্য তাতে লাভ হয় না। শুধু জানা যায়, হয় যান্ত্রিক গোলযোগে নয়তো কারো অসাবধানতায় দুর্ঘটনা হয়েছিল। তাতে একটা মরা মানুষও বাঁচে না, একটা কাটা ঠ্যাংও জোড়া লাগে না। তবে মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা কেউ কেউ হয়তো ফাঁকতালে ক্ষতিপূরণবাবদ কিছু টাকা পেয়ে যায়।

যেমন পেয়েছিল গৌরী।

বন্যা কেন হল? ঝড় কেন এল? ক্যানসারের ওষুধ কবে বেরোবে? মহামারী কেন? আগুন কি করে লাগল? ছাদ কেন ধসে পড়ল? ভূমিকম্প কেন ঘটছে? খুন হল কেন? এই সব ভাবতে ভাবতে প্রত্যেকদিন শ্যামাচরণ একটু একটু বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে খবরের কাগজ তার বগলে। যখনই ফাঁক পায় তখনই খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে।

নদীর ধারে বটতলায় সুশীতল গন্ধবণিক দোকান দিয়েছে। সেখানে গিয়ে বসলে নতুন ছাঁচবেড়ার গন্ধ নাকে আসে। মিষ্টি গন্ধটি। নদীর পাড়ে গায়ে গায়ে বাঁশ পুঁতে মাটি ফেলে কাঁচা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কাঠের পাটাতনের ঘাটে নৌকো এসে লাগে। বড় নৌকো, ছোটো নৌকো। মাল্লারা নৌকো ঘাটে বেঁধে উঠে আসে। মানুষজন মাল খালাস করে। আবার বোঝাইও হয়। ছোটো নৌকোয় দূর গ্রামগঞ্জের যাত্রীরা গিয়ে ওঠে। কারো মাথায় খোলা ছাতা। নদীর জলের আঁষটে গন্ধ আসে। হু-হু বাতাসও।

সুশীতলের দোকানে বসে খবরের কাগজটা ভাল করে পড়া যায় না। বাতাসের চোটে বড় বড় পাতা ওলটপালট খায়। তা ছাড়া আছে কিছু বেহায়া লোক, খবরের কাগজ দেখলেই যারা হাত বাড়িয়ে বলে—কাগজটা একটু দেবেন, দেখব?

খবরের কাগজে শ্যামাচরণ যে কী খোঁজে তা সে নিজেও ভাল করে জানে না। কিন্তু প্রতিদিন আগাপাস্তলা কাগজটা সে যখন খুঁটিয়ে পড়ে তখন তার মনটা যেন কিছু একটা খোঁজে।

গন্ধবণিকের দোকানে সাত গাঁয়ের লোক আসে। তাদের কেউ বা

শ্যামাচরণের চেনা, কেউ আধচেনা, কেউ একেবারেই অচেনা। গঞ্জের বাজারে সকলের ট্যাকের টিকি বাঁধা। আলু সুপুরি ধান পাট যার যা আছে সব নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসে। ঘাটে খুব জটলা হয়। তারপর মানুষজন একটু দম নিতে ঘাটের দোকানে দোকানে গিয়ে বসে, চা খায়, গল্পসল্প করে, কাজ কারবারের খবর আদান-প্রদান হয়।

ঘাটের ধারে বসে থাকতে শ্যামাচরণের বেশ লাগে। এই বসে থাকতে থাকতেই কত লোকের সঙ্গে চেনা-জানা হয়ে যায়, কত নতুন নতুন খবর শোনে, অচেনা জায়গার বিবরণ পেয়ে যায়, নতুন সব চরিত্রকে জানা হয়। গন্ধবণিকের পো খাতিরও করে খুব। শ্যামাচরণ যে একসময়ে জুডিসিয়াল ম্যাজিসট্রেট ছিল তা বেশ মনে রেখেছে সুশীতল।

তবে সে-সব কথা শ্যামাচরণ নিজেই ভুলে যায়। তার জীবনটা হল বসতি উঠে যাওয়া গাঁয়েব মতো। সেখানে এককালে অনেক লোক গমগম করে বাস করত, এখন সব বাস-বসত তুলে নিয়ে গেছে। ফাঁকা।

গৌরী হল শ্যামাচরণের বড মেয়ে। প্রথম পক্ষের। আরো দুটো ছেলেমেয়ে আছে তার। তারা দ্বিতীয় পক্ষের। রেবন্ত হল তার একমাত্র ছেলে, ফরাসডাঙা কলেজের লেকচারার। ছেলে সেখানে বৌ নিযে থাকে, কালেভদ্রে আসে, মাসান্তে পচাত্তরটা টাকা পাঠিয়ে খালাস। ছোটো মেয়ে পার্বতী তার স্বামীর সঙ্গে নবাবগঞ্জে থাকে। চিঠিটাও লেখে না।

বড় মেয়ে গৌরীরই যা একটু টান ছিল বাপের ওপর বরাবর। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন তখন চলে আসত বাপকে দেখতে। বরকে লুকিয়ে টাকা পাঠাত বাবাকে। তিন সন্তানের মধ্যে গৌরীর ওপরে শ্যামাচরণের টান ছিল সবচেয়ে বেশী।

গৌরীর বর সোমনাথ ছিল পুলিশের এ এস আই। ছেলে হিসেবে ভালই। অতি সুপুরুষ, সাহসী, সৎ। প্রাণে দয়ামায়া ছিল, ভক্তি ছিল। খড়্গপুর লাইনে এক রাত্রে গাড়ি লাইন ছেড়ে মাঠে নেমে গেল। দুখানা বগি উল্টে বিশজন মানুষ দলা পাকিয়ে একশা। সেই দলা পাকানো মানুষের মধ্যে একজন ছিল সোমনাথ।

কিন্তু সোমনাথই কি? শ্যামাচরণের এই সন্দেহটা আজও যায় নি। সে ট্রেনে সোমনাথ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার লাশ শেষপর্যন্ত কেউ সনাক্ত করতে পারে নি। একটা ভাঙাচোরা থ্যাতলানো লাশ তাদের হাতে সৎকারের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু সেই লাশটার নাকের বাঁ পাশে কোনো আঁচিল ছিল না। অথচ সোমনাথ হলে আঁচিলটা থাকার কথা।

গৌরীকে কথাটা ভেঙে কোনোদিনই বলে নি শ্যামাচরণ। বলে দিলে গৌরী হয়তো খুব আশায় আবার বুক বাঁধবে। আসলে সে লাশটা না হোক, সেই দুর্ঘটনায় দলা পাকানো অন্য লাশগুলোর মধ্যে একটা না একটা সোমনাথের হবেই। কারণ, বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই ফিরে আসত এতদিনে। মরেই গেছে, তাই তার আঁচিলটার কথা শ্যামাচরণ তোলে নি।

গৌরী কিছু টাকা পেয়ে গেল। থোক কয়েক হাজার টাকা। সেই টাকা পেয়ে সোজা বাপের বাড়িতে উঠল এসে। সেই বছরই শ্যামাচরণের চাকরির এক্সটেনশন শেষ হয়ে গেল। নদীর ধারে এই বড় গঞ্জে চাকরির শেষ পাঁচ-ছ বছর কেটেছে, তাই এখানেই ছোটো মতো একটা বাড়ি সস্তায় পেয়ে কিনে ফেলেছিল সে। শেষ জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাবে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঠিক শ্যামাচরণেব অবসরের জীবন শুরুর মুখে পাহাড় প্রমাণ ঝঞ্ঝাট বুকে করে গৌবী এল।

শ্যামাচরণের স্ত্রী গৌরীকে খুব ভাল চোখে দেখে না। দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে গৌরী বাপের ঘাড়ে ভর করেছে দেখে শ্যামাচরণের স্ত্রী ক্ষমা বড় মনমরা হয়ে গেল। সেই থেকে সংসাবে শান্তি নেই। সৎমাকে ভয় খাওয়ার মেয়ে তো আর গৌবী নয়। সে পাঁচ কথা শোনাতে জানে। ক্ষমারও গলায় তেজ আছে।

তাই শ্যামাচরণ শোক ভুলে এখন বাড়ির বাইরেই থাকে বেশী। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে নাতি-নাতনী নিয়ে কেটে যায়। আর জীবনের বড় সময়টা কাটে কী যেন একটা খুঁজে।

আজকাল অশান্তির ভরা তাব পরিপূর্ণ হয়েছে। গৌরীর বয়স বেশী নয়। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বড় জোর। চেহাবাটা এখনো ঢলঢলে। এক নজরে তেইশ-চব্বিশের বেশী মনে হয় না। একে বয়সটা খুব নিরাপদ নয়, তার ওপরে সৎমায়ের সঙ্গে ঝগড়া। দুইয়ে মিলিয়ে মেয়েটার মধ্যে একটা খারাপ রোগ চেপেছে। রাজ্যের ছেলে-ছোকরাকে টলায়। তাদের মধ্যে একজন আছে কাদাপাড়ার ভুষির পাইকার বিনয় হালদারের মেজ ছেলে। ডান হাতে ঘড়ি বেঁধে মোটরবাইক হাঁকিয়ে যখন তখন আসে, গৌরীর সঙ্গে হিহি হোহো আড্ডা মারে, ক্যারিয়ারে চাপিয়ে নিয়ে যায় এধার ওধার। গঞ্জে ছিছি।

শ্যামাচরণ আজকাল নিজের সঙ্গেই কথা বলে বেশি, যখন কথা বলার আর লোক পায় না। বুড়ো মানুষের কথা শোনবার জন্য কে-ই-বা কাজকারবার ফেলে বসে থাকবে?

গঞ্জের ঘাটটা সেদিক দিয়ে বড ভাল। নদীতে স্রোত আছে, জীবনটাও এখানে বেশ বয়ে যায়। কিছু গড়ায় না, থেমে থাকে না।

গোবিন্দনগব থেকে বেগুনের চাষী মফিজুল মাল গস্ত করতে এসেছে। চা খেতে খেতে বলল—এবার একদম জল হল না। পোকায় পোকায় সাড়ে সর্বনাশ।

সাড়ে সর্বনাশ কথাটা মফিজুলেব নিজেব। সর্বনাশের ওপর আবো কিছু বোঝায়।

সে জলেব জন্য নয়। তুমিও যেমন, বাসন্তীব মাস্টাবমশাই হরিপদ বলে—এ হল কেমিক্যাল সাবের গুণ। যত সাব তত পোকাব উৎপাত। আবার পোকা মারতে ওষুধ কেনো। এসব হচ্ছে বড ব্যবসাদারদের কৌশল বুঝলে। সার দিয়ে পোকা জন্মাচ্ছে, আর সেই পোকা মারতে বিষও কেনা করাচ্ছে। দুমুখো লাভ।

মফিজুল শ্যামাচবণের দিকে চেয়ে বলে—হাকিম সাহেব, কি বলেন?

শ্যামাচরণ কি আর বলবে? জগৎ-সংসারের খবব এখন আব সে তেমন বাখে না। যে যা বলে তাই হক কথা বলে মনে হয়। এমন কি আজকাল ভূতের গল্প শুনে 'হু' দেয়, মনটা ঐ একরকম ধারা হয়ে গেছে। সেই লাশটার মুখে আঁচল ছিল না—একথাটা আজকাল বড় মনে পড়ে।

শ্যামাচরণ বসে চাষী সঙ্গীদের কথা শোনে, দু চাবটে কথা নিজেও বলে। বাদবাকী সময় খববের কাগজ দেখে। তার বড় মনে হয়, কাগজে কি একটা খবর যেন বেরোবার কথা। মনে মনে সে কতকাল ধরে সেই খববটার জন্য অপেক্ষা করছে। খবরটা বেরোচ্ছে না।

গন্ধবণিকের দোকান থেকে ভরদুপুরে ফিরছিল শ্যামাচরণ। চৌপথীতে কদমতলায় একপাল কেষ্ট দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। তারা শ্যামাচরণকে দেখে গলা খাঁকারি দেয়। একটা বদমাশ ছেলে আওয়াজ দিল—গঙ্গারামকে পাত্র পেলে?

বিনয় হালদারের ছেলের নাম গঙ্গাপ্রসাদ। শ্যামাচরণ মাথাটা নামিয়ে জায়গাটা পার হয়ে যায়।

বাজারের মুখে বুড়ো নীলমণি দাসের সঙ্গে দেখা। নীলমণি লোকটা খুব আদর্শবাদী, স্বদেশী কবত, একবার এম এল এ-ও হয়েছিল, শ্যামাচরণ হাকিম থাকবার সময় থেকে ভাব।

নীলমণি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—শ্যামা যে! কোন দিকে?

—বাড়িই যাই।

—সে যাবে। বাড়ি পালাবে না, কথা আছে।

শ্যামাচরণ কথা শুনতে উৎসাহ পায় না আজকাল। ভাল কথা তো কেউ বলে না। তাই নিরাসক্ত গলায় বলে—কিসের কথা?

নীলমণি গলা নামিয়ে বলে—আজও ওদের দেখলাম। ভটভটিয়ায় জোড়া বেঁধে কুঠিঘাটের দিকে যাচ্ছে। এই একটু আগে। ওদের যে কারো পরোয়া নেই দেখায়।

ওরা বলতে কারা তা শ্যামাচরণ জানে। তাই উদাসভাবে নীল আকাশের দিকে চেয়ে বলে—তা তো দেখছই। আমার আর কি করার আছে বলো? চাও তো বলো, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি একদিন।

—আরে রাম রাম। তুমি ঝুলবে কেন? কিন্তু বিহিতের কথা ভেবেছো কিছু?

—আমার মাথায় আজকাল কিছু আসে না।

—আমি বিয়ের কথাও ভেবে দেখেছি বুঝলে? কিন্তু তোমার মেয়ে তো বয়সেও ছোঁড়াটার চেয়ে বড। তাছাড়া হালদারমশাই তো ক্ষেপে আগুন হয়ে আছেই।

শ্যামাচরণ শ্বাস ফেলে বলে—সবই অদৃষ্ট। অকালে জামাইটা যে কেন—

বলেই শ্যামাচরণ ফের চমকে ওঠে। মনে পড়ে, লাশের মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না। কথাটা আজও বলা হয় নি গৌরীকে। না বলাটা ঠিক হচ্ছে না।

কবে মরে-টরে যাবে শ্যামাচরণ, একটা সত্য কথা তার সঙ্গেই হাপিস হয়ে যাবে তাহলে।

নীলমণি কথা বলতে বলতে খানিক এগিয়ে দিল। সাবধানে রেল লাইন পার হয়ে শ্যামাচরণ বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে। বগলে ভাঁজ-করা খবরের কাগজটা, বেশ কি একটা বলি বলি করে। কিন্তু কোনোদিনই বলে না, দুপুরে খাওয়ার পর আজ আবার খবরের কাগজটা তন্নতন্ন করে খুঁজবে শ্যামাচরণ। খবরটা থাকার কথা।

বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া সারতে বেলা চলে গেল। মেয়েটা এখন বাড়ি ফেরে নি। নাতি-নাতনী দুটো স্কুল থেকে আসবে এখন। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে শ্যামাচরণ। বৌ ক্ষমা এঁটোকাঁটা সেরে এসে বিছানার একপাশে বসে বলে —আর তো মুখ দেখানো যাচ্ছে না।

ক্ষমার বয়স হয়েছে, সাধ-আহ্লাদ বড় একটা করে নি জীবনে। সংসারে জান বেটে দিচ্ছে বিয়ের পর থেকে। আজকাল শ্যামাচরণের বড মায়া হয়।

ঘড়ি দেখে শ্যামাচরণ উঠে বসে বলে—হরিদ্বার যাবে?

—যাহোক কোথাও চলো চলে যাই। তোমার আদরের মেয়ে সুখে থাক।

—কে দেখবে ওকে?

—আহা! দেখার ভাবনা! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে ওর। জামাই মরে গিয়েও তো কত টাকা হাতে এসেছে।

—তা বটে বলেই ফের সেই লাশের ভাঙাচোরা বিকৃত মুখ মনে পড়ে। আঁচিলটা ছিল না সেই মুখে। তবে কি—?

অনেক রাতে গৌরী পাশ ফিরতে গিয়ে জেগে ওঠে। কে যেন চাপাস্বরে ডাকল।

—কে?

শ্যামাচরণ জানালার বাইরে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে। চাপা গলায় বলল—আমি তোর বাবা। শোন।

—বাবা! অবাক হয়ে বিছানা ছেড়ে গৌরী উঠে আসে, ওমা, তুমি বাইরে কেন? কি হয়েছে?

শ্যামাচরণের মুখচোখ জ্যোৎস্নায় অন্যরকম দেখায়। চোখের বসা কোল বাটির মতো, তাতে টুপটুপে ভরা অন্ধকার। চোখের তারা থেকে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করে।

শ্যামাচরণ বলে—তার মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না।

—কে? কার কথা বলছো?

শ্যামাচরণ বলে, বহুকাল ধরে চেপে রাখা গোপন কথাটা বুক থেকে বেরিয়ে যায়।

গৌরী জানালার শিকটা চেপে ধরে। তারপর আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যায়।

পরদিন শ্যামাচরণ আবার গন্ধবণিকের দোকানে গিয়ে বসে। বিশাল নদীর ওপর ফুরফুর করে নীল আকাশ। নৌকো আসে, নৌকো যায়। ব্যাপারীদের হট্টগোল ওঠে চারধারে।

শ্যামাচরণ খবরের কাগজ খুলে তন্নতন্ন করে খবরটা খোঁজে। পায় না। ব্যাপারীরা এসে গল্প রাঙিয়ে তোলে। হাওয়া দেয়। চায়ের গন্ধের সঙ্গে নদীর আঁষটে গন্ধ গুলিয়ে ওঠে।

আজ সারাদিন গৌরী বেরোয় নি। কারো সঙ্গে দেখা করে নি। কথা বলে নি। সারাদিন শুধু ঘরে শুয়ে কেঁদেছে।

দুপুরে বাড়ি ফিবে শ্যামাচরণ একই খবব পেল। গৌরী নিজের ঘবে শুয়ে কাঁদছে।

শ্যামাচবণ কাউকে কিছু বলল না। ক্ষমা প্রশ্ন করে করে হাঁপিয়ে যায়।

খেয়ে উঠে শ্যামাচরণ খবরেব কাগজটা গৌরীর ঘরের জানালা গলিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বলে—সব খবর তো কাগজেই থাকে। রোজ দেখিস তো।

গৌরী প্রথমে কথা বলে না। কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে উঠে চোখ মুছে খবরের কাগজটা পড়তে থাকে। কেন পড়ে তা বুঝতে পারে না। জগৎটা সম্পর্কে আবাব তাব ভীষণ আগ্রহ জেগেছে।

শ্যামাচরণ বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ক্ষমাকে বলে—কাল থেকে একটা ইংরিজি খবরেব কাগজও দিতে বোলো তো কাগজেব ছেলেটাকে। কত খবর থাকে। একটা কাগজে সব পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পক্ষ

একদম আনকোরা, টাটকা, নতুন বৌকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল কনিষ্ক গুপ্ত। বৌয়ের নাম শম্পা। শম্পার সঙ্গে বিয়ের আগে কখনো দেখা হয় নি গুপ্তর। প্রেম-ট্রেমের প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি বিয়ের আগে শম্পাকে চোখেও দেখে নি। একটা ফটোগ্রাফ অবশ্য পাঠিয়েছিল ওরা কিন্তু গুপ্ত সেটাও স্পর্শ করে নি।

বিয়ের আগে গুপ্তর একটা প্রেম কেঁচে যায়। সে বিয়ে করতে চেয়েছিল মলি নামে এক স্কুল-শিক্ষিকাকে। মলি দেখতে শুনতে যাই হোক, স্বভাব যেমন ধারাই হয়ে যাক না কেন, গুপ্ত তাকে ভালবাসত। মলিরও গুপ্তর প্রতি ভালবাসার অভাব দেখা যায় নি কখনো।

কিন্তু ঠিক মাস ছয়েক আগে এক বিকেলে ভিক্টোরিয়ার বাগানে বসে মলি গুপ্তকে একটা সদ্য চেনা চৌকস ছেলের বিবরণ দিয়েছিল, ছেলেটা নাকি দুর্দান্ত স্মার্ট, আই এ এস দিয়েছে এবং নির্ভুল ইংরিজি গড়গড় করে বলতে পারে। গুপ্ত এর কোনোটাই পারে না। সে একটা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক, কিন্তু অধ্যাপনায় তার একদম সুনাম নেই। বরং ছাত্ররা তার ক্লাস কামাই করে, একবার তার বিরুদ্ধে জয়েণ্ট পিটিশনও দিয়েছিল অধ্যক্ষের কাছে।

তাই মলির মুখে এক অচেনা ছেলের চৌকসের বিবরণ শুনে সে একটু নার্ভাস হয়ে যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার পছন্দ নয়। কারণ বরাবর গুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেছে।

ইস্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ার সময়ে একবার সে ইস্কুল-স্পোর্টসে নাম দেয়। একশ মিটার দৌড়ে শুরুতে সে বেশ এগিয়ে গিয়েছিল, অন্তত সেকেণ্ড প্রাইজটা পেতই। হঠাৎ নিজের এই আশু সাফল্য টের পেল সে। বুঝল, সে সেকেণ্ড হতে চলেছে। দৌড় শেষে ফিতেটাও খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু যেই ব্যাপারটা সে টের পেল অমনি তার দুই হাঁটুর একটা হঠাৎ কেন যে আর একটাকে খটাং করে ধাক্কা মারল কে জানে! সেখানেই শেষ নয়। শোধ নিতে অন্য হাঁটুটাও এ হাঁটুকে দিল গুঁতিয়ে। কনিষ্ক গুপ্ত ফিতে ছুঁতে পারল না, দৌড় শেষের কয়েক গজ দূরে নিজের দুই হাঁটুর হাঙ্গামায় জড়িয়ে বস্তার মতো পড়ে গড়াগড়ি খেল।

আর একবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চৌদ্দশো সাল আবৃত্তি করার সময়ে সে এত চমৎকারভাবে কবিতাটির অন্তর্নিহিত ব্যথা ও বেদনাকে কণ্ঠস্বরে প্রক্ষেপ করেছিল যে নিজেই বুঝেছিল, প্রতিযোগিতায় তার ধারে কাছে কেউ আসতে পারবে না। শ্রোতারাও শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। কবিতার শেষ কয়েকটা লাইনে এসে কনিষ্ক যখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এক সেট রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম পুরস্কারটি তার হাতের নাগালে তখনই হঠাৎ কোথা থেকে এক ভূতুড়ে বিভ্রম এসে তার মাথার ভিতরে জল ঘোলা করে দেয়। শেষ দুটি লাইন একদম মনে পড়ল না। বার কয়েক তোতলাল সে। তারপর নমস্কার করে লজ্জায় রাঙা মুখ নিয়ে উইংসের আড়ালে চলে এল। একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছিল সেবার।

বড হওয়ার পর একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রেসের মাঠে গিয়েছিল কনিষ্ক। রেসের কিছুই তার জানা নেই, মহা আনাড়ী যাকে বলে। সে তাই ঠিক কবল সব কটা রেসের দু নম্বব ঘোড়ার ওপব একটা করে বাজি খেলবে।

প্রথম তিনটে রেসে খেললও দু নম্বর ঘোড়ায়। 'তিনটেতেই দু নম্বর ঘোড়া হেরে গেল। তখন এক বন্ধু বলল কি আনাড়ীর মতো পয়সা নষ্ট করছিস? দেখেশুনে বাছাই ঘোড়ার ওপর খেল!

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল কনিষ্ক। তখন প্রায় পনেরো টাকার মতো লস চলছে। এই দ্বিধাই তার কাল হল। পরের চারটে রেসে সে বাছাই ফেবারিট ঘোড়াগুলোর ওপর বাজি ধরতে লাগল। সব কটাতেই হার। কিন্তু শেষ চারটে রেসে প্রতিবার জিতল দু নম্বর ঘোড়া।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতাকে তাই বড ভয় পায় কনিষ্ক গুপ্ত। মলির মুখে সেই অচেনা পুরুষটির প্রশংসা শুনে সে মনে মনে খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এতকাল মলিকে নিয়ে তার কোনো ভাবনা ছিল না। খুব সহজ ছিল সম্পর্ক।

ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার জন্য সে পরদিন নিজে থেকেই সেই ছেলেটির প্রসঙ্গ তুলে বলল—মলি, কাল তুমি সুব্রত নামে ছেলেটির কথা বলছিলে তার কথা শুনতে আমার বেশ লাগছিল। কেমন দেখতে বল তো?

মেয়েরা গন্ধ পায়। মলি একবার সচকিত হয়ে কনিষ্কের দিকে তাকাল। আর মলির সেই সচকিত ভাবটুকু দেখে কনিষ্কও বেশ সচকিত হয়ে ওঠে। মানুষের দুর্বল গোপনীয় কোনো বিষয়ে স্পর্শ হলে মানুষ ঐ রকম চমকে ওঠে।

কেমন করে। কিন্তু মলির সে ভাবটা বেশীক্ষণ রইল না। আসলে সুব্রতর চালচলনে সে এত বেশী মুগ্ধ হয়েছে যে সে কথা কাউকে না বলেই বা সে থাকে কি করে?

মলি বলল—দেখতে? ধরো ছ ফুট লম্বা, ছিপছিপে, রঙ একটু কালো হলেও মুখখানা ভীষণ চালাক। এত সুন্দর হাসে।

কনিষ্ক নিজে পাঁচ ফুট পাঁচ। রোগা, ফ্যাকাসে এবং ভাবুক ধরনের চেহারা। সে আবার ভীষণ অন্যমনস্কও। প্রায় সময়েই এক কথার আর এক উত্তর দেয়। মনে মনে নিজের পাশে সুব্রতকে কল্পনা করে সে ঘুমিয়ে গেল।

মলির সঙ্গে সেই থেকে সম্পর্কটা আর স্বাভাবিক রইল না। মাঝখানে এক অচেনা সুব্রত এসে পর্দা ফেলে দিল।

পরের এক মাস কনিষ্ক নানা জ্বলুনিতে জ্বলে গেল মনে মনে। মলি তখন প্রায় সময়েই সুব্রতর সঙ্গে প্রোগ্রাম করে। তবে সে একথা বলত—দেখ, হিংসে কোর না যেন। কোনো পুরুষই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় আমার কাছে।

কিন্তু কনিষ্ক সে কথা মানে কি করে? সে যে অনবরত হীনমন্যতায় ভুগছে।

তাই একদিন সে তার পরিষ্কার গোটা গোটা হস্তাক্ষরে চিঠি লিখে মলিকে জানিয়ে দিল—আমাদের আর বেশীদূর এগোনো ঠিক নয় মলি। এখানেই দাঁড়ি টেনে দেওয়া উচিত।

চিঠি লিখে সে দু মাসের ছুটি নিয়ে বাইরে গেল বেড়াতে। এতদিনে বাড়ির লোকেরা তার বিয়ে ঠিক করল। মাত্র পনেরো দিন আগে সে সম্পূর্ণ অদেখা, অচেনা, অজানা শম্পাকে বিয়ে করেছে। বলতে কি, শম্পার সঙ্গে তার প্রথম দেখা শুভদৃষ্টির সময়ে। ভাল করে তাকায় নি কনিষ্ক। তার মনে তখন এক বিদ্রোহ ভাব। সমস্ত পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণা, বিরাগ, ভয়।

গত পনেরো দিন সে যে শম্পার সঙ্গে খুব ভাল করে মিশেছে তা বলা যায় না। কথাবার্তা হয়েছে, পাশাপাশি এক বিছানায় শুয়েছে, প্রাণপণে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে মেয়েটির প্রতি। কিন্তু তা বলে তার মনে হতাশা ও সন্দেহের ভাবটি যায় নি। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীর সর্বত্র তার চেয়ে বহুগুণে যোগ্যতর লোকেরা ছড়িয়ে আছে। সে একটা হেরো লোক। নিজের সম্পর্কে এইসব জরুরী চিন্তা তাকে এত বেশী ব্যস্ত রেখেছিল যে তার কাম তিরোহিত হয়, আগ্রহ কমে যেতে থাকে, শম্পা দেখতে কেমন তাও সে বিচার করে দেখে নি।

কনিষ্কর মা আজ সকালে তাকে ডেকে বললেন—খোকা, বৌমা কেন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে রে? তোর কি বৌ পছন্দ হয় নি?

কনিষ্ক মুশকিলে পড়ে বলে, তা নয়। আমি তো ভাল ব্যবহারই করি।

—শুধু ভাল ব্যবহারেই কি সব মিটে যায় বাবা? পুরোনো কথা ভুলে এবার নতুন করে সব শুরু করে দাও। যাকে ঘরে এনেছো তার দিকটা এবার দেখ। বৌ তো ক্রীতদাসী নয়, তার মনের দিকে নজর দিতে হবে।

—কি করব মা? আমার হৈচৈ ভাল লাগে না।

—হৈচৈ করতে হবে না, আজ বিকেলে বৌমাকে নিয়ে বেড়াতে যা। দ্বিরাগমন সেরে আসবার পর দুজনে মিলে তো কোথাও গেলি না দেখলাম।

অনেক ভেবেচিন্তে প্রস্তাবটা গ্রহণ করল কনিষ্ক। আসলে মলি বা সুব্রতর কথা ভাবার কোনো মানেই হয় না। কেননা এই নতুন অবস্থায় সে আর পুরোনো সম্পর্কের মধ্যে ফিরে যেতে পারে না।

সিনেমা দেখার কথা ছিল, কিন্তু টিকিট পাওয়া যায় নি। তাই নিছক ঘুরে বেড়ানোর জন্যই দুজনে বেরিয়েছে। কথা আছে, আজ রাতে বড় কোনো রেস্টুরেণ্টে দুজনে রাতের খাওয়া সেরে একেবারে বাড়ি ফিরবে।

কনিষ্ক ট্যাক্সি নিয়েছিল। টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে খানিক দূর আসতেই শম্পা বলল, শোনো, ট্যাক্সিটা এবার ছেড়ে দাও।

—কেন?

—ট্যাক্সি করে আমাদের মতো লোক বেড়াতে যায় না। মধ্যবিত্তরা প্রয়োজনে ট্যাক্সি নেয়। বেড়ানোর জন্য ট্যাক্সি ভাল নয়।

—তবে কিসে যাবে? ট্রামে বাসে যা ভিড়!

—হোক। তবু ভিড় ভাল। কত মানুষ দেখা যায়।

কনিষ্ক নড়েচড়ে বলে, তুমি কি ভিড় পছন্দ কর? আমি করি না।

—ভিড় নয়, তবে মানুষ পছন্দ করি। ট্যাক্সির ভিতরে নিঝুম হয়ে বসে থাকাটা ভারী একঘেয়ে। কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না।

কনিষ্ক রাসবিহারীর মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে শম্পা বলল, তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে শাশুড়ী মা আমাকে বারণ করেছেন। কিন্তু আমার একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে।

—কি?

—তুমি এত অহংকারী কেন?

—আমি অহংকারী?

—নয় ?

কনিষ্ক অবাক হয়ে বলে—মোটেই নয় শম্পা। বরং আমি ঠিক উল্টোটাই সব সময়ে ভাবি। আমার মনে হয়, আমি বড় অপদার্থ পুরুষ।

—সে কি! কেন ?

—আমি তো তেমন স্মার্ট নই। লম্বা চওড়া নই। আমার ভিতরে হাজার রকমের ডেফিসিয়েন্সি।

শম্পা খুব খিলখিলিয়ে হাসে। বলে—তাই নাকি! তাহলে তো তোমাকে বিয়ে করাটা মস্ত ভুল হল!

—হলই তো।

—শোন। ভাবতে গেলে, আমারও হাজারটা ডেফিসিয়েন্সি। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকলে তো জীবনটাই তেতো হয়ে গেল।

শীতকালের বেলা। ক্রিস্‌মাসের ছুটি চলছে। হাজারটা লোক বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। অপরাহ্ণের কোমল কবোষ্ণ রোদে আর ছায়ায় অপরূপ হয়ে আছে পথঘাট।

এই আলোয় আজ কনিষ্ক শম্পার মুখশ্রী খুব অকপট চোখে দেখল। তুলনা করে নম্বর দিলে মলি আর শম্পা প্রায় সমান সমান নম্বর পাবে। শম্পার তুলনায় মলি কিছু লম্বা ছিল, কিন্তু সেই রকম আবার মলির চেয়ে শম্পা ফর্সা। মলির শরীরে কিছু বাড়তি মেদ ছিল বলে পেটে ভাঁজ পড়ত। শম্পার সে সব নেই। মলির মুখখানা ছিল গোল ধরনের। শম্পার মুখ লম্বাটে, লাবণ্য শম্পারই বেশী, কারণ সে বয়সে মলির চেয়ে কম করে পাঁচ বছরেব ছোটো। বি. এ. পরীক্ষা দিয়েই তার বিয়ে হয়েছে।

কনিষ্কর কথাটা ভাল লাগল। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকাটা কাজের কথা নয়।

সে বলে, আমাকে তোমার কেমন লাগে ?

—আগে বল, আমাকে তোমার কেমন ?

—শোন শম্পা, তোমাকে কেমন লাগে তা আমি এখনো ভেবেই দেখি নি।

আচমকা শম্পা বলে—মলিকে তোমার কেমন লাগত ?

কনিষ্ক থমকে যায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে, তুমি জানলে কি করে ?

—তোমার মা বলেছেন।

—মা ?

—মা সব বলে দিয়েছেন আমাকে। আরো বলেছেন, আমি যেন এসব তোমাকে জিজ্ঞেস না করি।

শ্বাস ফেলে কনিষ্ক বলে, জিজ্ঞেস করে ভালই করেছ। মলিকে আমার ভালই লাগত। শুধু শেষদিকে—

শম্পার মুখখানা ভার হয়ে গেল। কনিষ্কর মুখচোখও লাল দেখাচ্ছে। সে বড অস্বস্তি বোধ করে বলে, এসব কথা কি ভাল ?

শম্পা বলে—ভাল নয়। কিন্তু আমাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে যদি তৃতীয় কোনো লোক নাক গলায় তবে সেই তৃতীয় লোকটাকে জেনে রাখা দরকার।

অবাক হয়ে কনিষ্ক বলে—তুমি তো ভীষণ বুদ্ধিমতী। এত গুছিয়ে কথা বল কি করে ? মাথায় আসে ?

শম্পার ভার মুখ হাল্কা হয়ে গেল। হেসে বলে—যাঃ।

—সত্যি বলছি, তুমি খুব ভাল কথা বলতে পার। আমি পারি না।

শম্পা বলে, বাপের বাড়িতে আমাকে সবাই কটকটি বলে ডাকত। আমি নাকি ভীষণ কটকট করে কথা বলি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দেশপ্রিয় পার্ক বরাবর এসে গেল। গলার স্কার্ফটি ভাল করে জড়িয়ে শম্পা বলে—একটু চা খেতে পারলে বেশ হত। আজ যা শীত!

কাছেই একটা রেস্টুরেণ্ট। কিন্তু আজ ছুটির দিনে সেখানে বেশ ভিড। বসার জায়গা নেই।

কনিষ্ক বলে—আর একটু হাঁটি চল। পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে একটু এগোলে বোধহয় গাছতলায় একটা দেশওয়ালী চায়ের দোকান পাওয়া যাবে।

তাই হল। গাছতলার দোকানদার দু ভাঁড় চা বড যত্নে এগিয়ে দেয়। শম্পা আর কনিষ্ক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চুমুক দেয়।

কনিষ্ক বলে—কেমন ?

—বেশ গো।

কনিষ্ক খুশী হয়ে পয়সা মিটিয়ে দেয়। বলে—খিদে পেয়েছে নাকি ? কিছু খাবে ?

—কে খাওয়াবে ? আমার তো পোড়া কপাল, কেউ পছন্দ করে না।

কনিষ্ক হেসে বলে—কটকটি, এবার কিন্তু কথা ফেইল করলে।

—কেন ?

—যে চা খাওয়াল সেই খাবার খাওয়াতে পারে। আর কে খাওয়াবে ?

—মলির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হল কেন ? হঠাৎ শম্পা প্রশ্ন করে।

—ঝগড়া! না, ঝগড়া হয় নি তো। ও একটা ছেলের খুব প্রশংসা করত। সেটা আমার সহ্য হত না।

—ওমা! তাই নাকি? এসব তো মা আমাকে বলে নি!

—মা জানবে কি করে? কনিষ্ক গুপ্ত বলে—মা শুধু জানত, মলির সঙ্গে আমার ভাব।

—এখন তুমি মলির কথা খুব ভাব না? ভাব, আমার মতো একটা বিচ্ছিরি মেয়ের সঙ্গে কেমন হুট করে বিয়ে হয়ে গেল। সারাটা জীবন কেমন ব্যর্থতায় কাটবে।

কনিষ্ক খুব হতাশার ভাব করে বলে, কতগুলো ভাবনা আছে যা তাড়ানো যায় না। বিরহ ভোলা যায়, কিন্তু অপমান কি সহজে ভোলে মানুষ? কিংবা ঈর্ষা? হীনমন্যতা?

শম্পা মুখখানা করুণ করে বলে, আমাকে একটা কথা বলতে দেবে? ধর আজ তোমার কাছে আমার খুব একটা দাম নেই। তুমি ভালবাসতে পারছ না আমাকে। অথচ আমি তোমার কাছে কত সহজলভ্য। কিন্তু দেখ, সুজন নামে একটা ছেলে আছে। তার কাছে শম্পাই হল আকাশ-পাতাল জোড়া চিন্তা। শম্পার জন্য কি জানি সে হয়তো আত্মহত্যার কথা ভাবে। পৃথিবীতে শম্পা ছাড়া বেঁচে থাকা কত কষ্টের সে জানে একমাত্র সুজন। তুমি তা কখনো জানবে না, বুঝবে না। পৃথিবীটা ঠিক এরকম নিষ্ঠুর।

চোয়াল কঠিন করে কনিষ্ক বলে, সুজন কে?

—সে একটা ছেলে। আমাকে ভালবাসত। কোনোদিন তাকে পাত্তা দিই নি। কিন্তু আজ অনাদরের মাঝখানে থেকে তার কথা খুব মনে হয়।

কনিষ্ক স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে।

সেই রাতে শম্পা আর কনিষ্কর ভালবাসার মাঝখানে অনেকবার মলি এসে হানা দিল, এল সুজনও। দুজনে এসে এক অদৃশ্য প্রজাপতির দুটি ডানার মতো কাঁপতে লাগল। তাতে বড় সুন্দর হল কনিষ্ক ও শম্পার ভালবাসার নিরালা ঘরটি।

ইচ্ছে

দেশলাইয়ের কাঠির অর্ধেক ভেঙে দাঁত খুঁচিয়েছিল কখন। বিড়ি ধরাতে গিয়ে সাঁটুলাল দেখে খোলের মধ্যে সেই শিবরাত্রির সলতে আধখানা বারুদমুখো কাঠি দেমাক দেখিয়ে পড়ে আছে।

আজ চৈত্রের হাওয়া ছেড়েছে খুব। কাল বৃষ্টি গেছে ক' ফোঁটা, কিন্তু আজই তেজালো রোদ আর খড়নাড়ার মতো শুকনো হাওয়া দিচ্ছে দেখ। হাওয়ার থাবায় এক ঝটকায় কাঠির মিনমিনে আগুন নিবে যাবে। যদি তাই যায় তো আরো চার পো পথ বিন-বিড়িতে হাঁটো। তারপর হাজারির দোকানের আগুনে-দড়িতে বিড়ি ধরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অতক্ষণ বিড়ি ছাড়া হাঁটা যায়! মুখে থুথু আসবে, বুক আঁকুপাঁকু করবে, কী নেই-কী নেই মনে হবে।

সাঁটুলাল দেশলাইয়ের বাক্সটা নাড়ে। ভিতরে টুকাটুক শব্দ করে আধখানা কাঠি দেমাকভরে নড়ে চড়ে। কাঠিটার মতলব বুঝতে পারে না সাঁটু। শালা কি বিড়ি ধরানোর ঠিক মুখে নিবে গিয়ে তাকে জব্দ করবে?

তার জীবনে পাপের অভাব নেই। ফর্দ করতে গেলে শেষ হওয়ার নয়। বেশী কথা কি, এই দেশলাইটাই তো গত পরশু বাবুদের উঠোনে পড়ে থাকতে দেখে হাতিয়ে নেয়। ঝি উনুন ধরাতে এসে ফেলে গিয়েছিল ভুলে। পরে এসে দেশলাই খুঁজে না পেয়ে বাপান্ত করছিল। তা সে সাঁটুর উদ্দেশেই বলা, নাম ধরে না বললেও, শুনে সাঁটু ভেবেছিল—নাঃ, কাল থেকে ভাল হয়ে যাবো।

সাঁটু দেশলাইটা হাতে নিয়ে মাঠের মধ্যিখানে ঢিবিটার ওপর বসে থাকে। দাঁতে আটকানো বিড়ি। ধরায় নি। সাঁটু ভাবে, বাবুদের বাড়ির ঝি সরস্বতীর কি উচিত হয়েছে সাঁটুকে অমন বাপ-মা তুলে গাল দেওয়াটা? ছেলের মাথা খেতেও বলেছে। যত যাই হোক সরস্বতী তো সাঁটুরই বউ! আজ না হয় সে পয়সাওলা লোকের সঙ্গে বিয়ে বসেছে। তা সুখচন্দ্রের পয়সাই বা এমন কি। আটাকল খুলে ধরাকে সরা দেখছে। তারও আগের পক্ষের বউয়ের হ্যাপা সামলাতে হয়। সরস্বতী ভাবে সুখচন্দ্র তাকে চিরকাল মাথায় নিয়ে নাচবে। ফুঃ! লাথি দিল বলে। বেশী দিন নয়।

ছেলের মাথা খেতে বলা সরস্বতীর ঠিক হয় নি। ছেলে তো সাঁটুর একার

নয়, তারও। কিন্তু রেগে গেলে সরস্বতীর আর সে সব খেয়াল থাকে না। রেগে গেলে সরস্বতী একেবারে দিগ্‌বসনা।

টিবির ওপর কয়েক জায়গায় ঘাস পুড়ে টাক পড়েছে। এখানে সেখানে আংরা পড়ে আছে, ছাই উড়ছে অল্পস্বল্প। ডাকাতে সাধুটা ক'দিন আগেও এখানে থানা গেড়ে ছিল।

আজকাল সাঁটুলালের খুব ইচ্ছে হয় কারো কাছে গিয়ে মনের দুঃখের কথা সব উজাড় করে বলে। তার দুঃখ ঝুড়িভরা। সাধুর খোঁজ পেয়ে একদিন সন্ধেবেলা চলেও এসেছিল সাঁটুলাল। সাধুটা নাকি ভীষণ তেজালো, শূল চিমটে কিংবা ধুনি থেকে জলন্ত কাঠ নিয়ে লোককে তাড়া করে। তা তেজালো সাধুই সবার পছন্দ। সাঁটুরও।

সন্ধেবেলা সাঁটু টিবিতে উঠে দেখল লেংটি-পরা জটাধারী ভয়ংকর সাধু বসে বসে খাচ্ছে। কাছেপিঠে কেউ নেই, কেবল বেলপুকুরের মতিলাল একধারে চোরের মতো খোলা ছাতা সমুখে ধরে বসে আছে। তামাকের কারবারে মতিলাল গতবার খুব মার খেয়েছে। সেই থেকে লটারীর টিকিট কেনে, হাতে গুচ্ছের কবজ আর সাধুর খোঁজ পেলেই সেখানে গিয়ে খুঁটি গাড়ে।

সাঁটুলালকে দেখে মতিলাল হাতের ইশারায় ডেকে বলল—এখন কথাটথা বোলো না, বাবার ভোগ হচ্ছে। আর খুব সাবধান, বাবা কিন্তু হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে মারে। আমার ছাতার আড়ালে সরে এসো বরং।

মতিলালের ছাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে সাঁটুলাল সাধুর খাওয়া দেখে চোখের পাতা ফেলতে পারে না। ভাল ঠাহর হচ্ছিল না অল্প আলোয়, তবু মনে হচ্ছিল যেন কিসের একটা বড়সড় ঠ্যাং চিবোচ্ছে।

মতিলাল ঠেলা দিয়ে বলল—দেখছ কি! নিজের চোখে যা দেখলাম প্রত্যয় হয় না।

সাঁটু মতির কাছ ঘেঁষে বলল—কি দেখলে?

মতিলাল ফিসফিস করে বলে—সবটা দেখিনি। সন্ধের মুখে মুখে এসে হাজির হয়ে দেখি বাবার সামনে একটা আধজ্যান্ত শেয়াল পড়ে আছে, মুখ দিয়ে ভকভক করে রক্ত বেরোচ্ছে, তখনো পাঁজর ওঠানামা করছিল। ধুনি জ্বেলে সেই আধজ্যান্ত পশুকে আগুনে ভরে দিল মাইরি, কালীর দিব্যি। তারপর ঐ দ্যাখো, কেমন তার করে খাচ্ছে।

সাঁটু শুয়োরের মাংস পর্যন্ত খেয়েছে, কিন্তু শেয়াল পর্যন্ত যেতে পারে নি। শুনে আর একটু মতিলালের কাছে ঘেঁষে বসল। মতিলাল কানে কানে বলল—স্বয়ং

পিশাচসিদ্ধ মহাদেব। বুঝেছো? এমন মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া কত জন্মের ভাগ্যি।

শেযাল খেয়ে সাধু ঘাসে হাত পুঁছে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। মতিলাল খুব সন্তর্পণে উঠে গিয়ে সাধুব পা দাবাতে লেগে যায়।

সাধুর শেয়াল খাওয়া দেখে সাঁটুব গা বিবোচ্ছিল। মতি হাতের ইশারায় ডাকলে সে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ধানাই-পানাই বলতে শুরু কবল—বাবা, আমি বড় পাপী। তা বাবা, দুঃখী লোকেরা পাপ না করেই বাঁচে কিসে বলো। তাই ভাবছি বাবা, তুমি যদি আশীর্বাদ করো তো কাল থেকে ভাল হয়ে যাবো।

সাধু চিৎ হয়ে শুয়েছিল, কথা শুনে মুখটা ফিরিয়ে একবার তাকাল শুধু। ভারী ছুঁচোলো নজরটা। সাঁটুর তো ছুঁচ ফোটানোর মতো যন্ত্রণা হয়েছিল।

সাধু কিন্তু গাল দিল না, একটু হেসে বলল—শালা নিমকহারাম পাঁচটা টাকা আর একটা জবাফুল নিয়ে আসিস কাল। এখন যা।

সাঁটু চারদিকে চেয়ে শেয়ালের নাড়ীভুঁড়ি, ছাল আর পোড়া মাথাটা দেখে 'ওয়াক' তুলে সেই যে চলে এসেছিল আর যায় নি। যাবেই বা কোন মুখে? জবাফুলের যোগাড ছিল, কিন্তু পাঁচটা টাকা?

সাধু চোত সংক্রান্তির স্নানে যাবে বলে তল্পি গুটিয়েছে, কিন্তু ঢিবির ওপরকার মাটিতে দাদের মতো পোডা দাগ রয়ে গেছে। বাতাসে একটা পচাটে গন্ধও। শেয়াল খেলে লোকে পাগল হয় বলে শুনেছে সাঁটুলাল।

অর্ধেক কাঠিটা দেশলাইয়ের খোলের বারুদে ঠুকবে কি ঠুকবে না তা খানিক ভাবে সাঁটু। এ বাতাসে ধরবে না মনে হয়।

ঢিবি বেয়ে সাঁটুলাল নেমে আসে খানিক। এবার বাতাস একটু আডাল পড়েছে। 'জয় মা কালী' বলে সাঁটু কাঠিটা ঠুকে দিল খোলে। বিড়বিড়িয়ে উঠল আগুন। গেল ঃ গেল ঃ হুই রে ঃ সাঁটু বিড়ি হাতের খাপের মধ্যে গুঁজে প্রাণপণে টানে।

জয় মা! ধরেছে। নিবেই গিয়েছিল আগুনটা, শুধু কাঠিটা লালচে হয়েছিল বলে ধরল।

ভারী খুশী মনে ঢিবির ওপর বসে সাঁটুলাল দূরের দিকে চেয়ে থাকে। বিড়িটা শেষ হয়ে এলে এটা থেকেই আর একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হাঁটা দেবে।

পাপ-তাপগুলো সবই যেমন-কে-তেমন থেকে গেল তার। কাউকে বলা হল

না। মতিলালের পাপ-তাপ বোধ হয় সাধু টেনে নিয়ে গেছে। সাঁটুলাল বিড়ি টানতে টানতে ভাবল—নাঃ শালা, কাল থেকে ভাল হয়ে যাবো।

বড় রাস্তা দিয়ে একটা বাস আসতে দেখে সাঁটু তাড়াতাড়ি উঠে হাঁটা ধরে। হাত তুলতে বাসটা থেমেও গেল। কিন্তু কনডাকটার নিত্যচরণ মুখ চেনে। উঠতে যেতেই হাত দিয়ে দরজাটা আটক করে বলল—উঠছো যে, পয়সা আছে তো ?

—আছে আছে।

দোনো-মোনো করে নিত্যচরণ দরজা ছাড়লো বটে কিন্তু নাহক অপমান করে বলল—সীটে বোসো না, মেঝেয় বোসো।

তাতে সুবিধেই সাঁটুলালের। মেঝেয় বসলে তেমন নজরে পড়বে না। পয়সা মাপও হয়ে যেতে পাবে। তাছাড়া সীটে জায়গাও নেই। সে বসেই ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে নিত্যচরণের দিকে বাড়িয়ে দিল। যদি নেয় তো ভাল, না নিলে খুব দিক করবে।

তা নিত্যচরণ নিল। নেওয়ারই কথা। নিত্যচরণের দ্বিতীয়পক্ষ উলুবেড়ে থেকে চিঠি দিয়েছে আজ। বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে অত হাওয়ার মধ্যেও কি করে কোন কায়দায় যেন নিত্যচরণ বিড়িটা ধরিয়ে ফেলল। তারপর বুকপকেট থেকে ন্যাতানো পোস্টকার্ডটা বের করে জড়ানো অক্ষরের লেখা পড়তে থাকে একমনে। তার মুখে রাগ, বিরক্তি, বৈরাগ্য আর হাসি ফুটে উঠতে থাকে। চামেলি লিখেছে—শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। তারপর লিখি যে, সুপারি সব পাড়া হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দ ঠাকুরপো এবং ভাশুরঠাকুর হিসাব দেয় নাই। এত কটা মোটে দিয়াছে। তুমি বৈশাখে এসে হিসাব চেও। আমাকে দিনরাত্রি কথা শুনায়। কেন আমি কি কেউ না। সতীনপো পর্যন্ত বলে তিন্নির মা, মা ডাকে না। কথা আরো কত আছে। বলে দুই বৌতে সমান ভাগ। ভাগ বড। আমার ভাগের খড শ্যামলালকে বিক্রি করিয়াছি। পাঁচ টাকা এখনো বাকি আছে। তোমার টাকা পাইনি। কি করে সংসার চলে বলো ? তিন্নির আমাশা হওয়ায় কত খরচ হয়েছে সে খবর কেই বা রাখে। আমার কে আছে। হাটবারে মুকুন্দ ঠাকুরপোকে পাউডার আনিতে পয়সা দিয়াছিলাম। সে কি দোষের বলো। ঠাকুরপো আনে নাই পয়সা আমার হাতেও দেয় নাই, তিন্নির হাতে ফেরত দিয়া বলিয়াছে অত বিবি সাজতে হবে না পাঁচজনে কুকথা বলে। সতীন চরিত্রের দোষের কথা বলে বেড়ায়। মা কালীর নামে দিব্যি কেটে লিখি যে সে কথা কেউ বলিতে পারিবে না। পোস্টকার্ডে আর জায়গা নাই। প্রাণনাথ রাখো শ্রীচরণে! চরণাশ্রিতা চামেলি।

শেষ লাইনটা 'রাবণ বধ' যাত্রা থেকে নেওয়া। নিত্যচরণ শ্বাস ফেলে পোস্টকার্ডটা আবার পকেটে ঢোকায়। বিড়ি নিবে গেছে। আবার ধরিয়ে নিল নিত্যচরণ।

সাঁটুলাল নিত্যচরণের মুখের ভাব দেখছিল একমনে। মোটে মাইলখানেক রাস্তা। দেখি না দেখি না বলে কাটিয়ে দেবে। চিঠিটা আর একটু যদি লম্বা হত। লোকে যে কেন লম্বা লম্বা চিঠি লেখে না তা বোঝে না সাঁটুলাল।

নিত্যচরণ অবশ্য পয়সা আদায় করল না শেষপর্যন্ত। নামবার সময় শুধু বলল— এই চারশ বিশ, বাস কি জল দিয়ে চালাই আমরা ? তেল কিনতে পয়সা লাগে না!

বাস তেলে চলে না জলে চলে তা জেনে সাঁটুর হবেটা কি ? সে নিজে যে কিসে চলে সেইটাই এক ধাঁধা। চলেও গেল এই বছর পঞ্চাশেক বয়স পর্যন্ত।

পথটা খুব পার হওয়া গেছে। চোত মাসের রোদে এ পথটুকু কমতি হল সে একটা উপরি লাভ।

সুখচন্দ্রের সঙ্গে আগে আগে কথা বলত না সাঁটুলাল। এখন বলে। ভেবে দেখেছে, সুখচন্দ্রের দোষ কি ? সরস্বতীকে তো সে নিজে এসে ভাগায় নি। সরস্বতী নিজে থেকেই ভেগে গেল। বরং অন্য কারো চেয়ে সুখচন্দ্রের সঙ্গে আছে সে বরং ভাল। লোকটা কাউকে বড় একটা দুঃখ দেয় না। ফুর্তিবাজ লোক। যা আয় করে তা খেয়ে পরে ওড়ায়। বাজারের সেরা জিনিসটা আনবে। মরসুমের আমটা কাঁঠালটা বেশী দাম দিয়ে হলেও কিনবে, ঘরে তার রেডিও পর্যন্ত আছে। আগের পক্ষে বাঁজা বউ শেফালীকেও খারাপ রাখে নি। নিজের বাড়ি শেফালীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পাড়ায় সরস্বতীর জন্য আলাদা ঘর তুলেছে। দুই বাড়িতেই যাতায়াত।

অনেক ভেবেচিন্তে সাঁটুলাল দেখেছে, ব্যাপারটা খারাপ হয় নি। প্রথম প্রথম তার অভিমান হত বটে। কিন্তু এও তো ঠিক যে তিন তিনটে বাচ্চা সমেত সরস্বতী তার ঘাড়ে গন্ধমাদনের মতো চেপে ছিল এতদিন। এই যে সে গত রাতে খাড়ুবেড়েতে যাত্রা শুনতে গিয়ে রাত ভোর করে তারপর বেলাভর ঘুমিয়ে নাড়ুগোপালের মতো হেলতে দুলতে তিন প্রহর পার করে ফিরছে, সরস্বতী থাকলে হতে পারত এমনটা ? মাগী গিয়ে এখন তার ঝাড়া হাত-পা। ওদিকে ছেলেপুলেগুলো দু'বেলা খেতে পায়, পরতে পায়। সরস্বতীর চেহারা আদতে কেমন তা সাঁটুলালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পাঁচ-সাত বছর পর থেকে কেউ বুঝতে পারত না। এখন সরস্বতী পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন চামড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাত-পায়ের গোছ হয়েছে খুব। গায়ে রস হয়েছে। চোখে ঝলক খেলে। বেশ আছে।

গোঁজ মুখ করে ঘুরে বেড়াত সাঁটুলাল, একদিন সুখচন্দ্র ডেকে বলল—সাঁটুভায়া, ভগবান আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। তুমি আমি কি আলাদা ? সরস্বতী এসে জুটল, ফেলি কি করে বলো ?

এমনি দুচার কথা হতে হতে সাঁটুলাল ভাব করে ফেলল। তবে সরস্বতীর পুরোনো সব রাগ যায় নি। সুখচন্দ্র যতই মিতালী করুক সরস্বতী এখনো দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর আকাশ বাতাসকে শুনিয়ে তার কেচ্ছা গায়।

গাওয়ার মতো কেচ্ছা কিছু কম নেই সাঁটুলালের। তার সারাটা জীবন চুরি ছ্যাঁচড়ামি আর ছিনতাইয়ের কাণ্ডে ভরা। সে সব পুরোনো কথা। গত সপ্তাহে পালপাড়ার কদমতলায় সাঁটু নিজের মেয়ে কুন্তিকে গঙ্গা-যমুনা খেলতে দেখে মায়ায় পড়ে দাঁড়িয়ে গেল। শত হলেও সন্তান। মেয়েটাও খানিক খেলা করে বাপের কাচে এল দৌড়ে। একগাল মিষ্টি হেসে ডাকল—বাবা। বুক জুড়িয়ে যায়। মেয়েটার খালি গা, পরনে শুধু একটা বাহারী রঙচঙে ইজের।

সাঁটুর চোখটাই পাপে ভরা। যেখানে যত লোভানী আছে সেখানে তার পাপ নজর পড়বেই কি পড়বে। মেয়েটাকে দেখতে গিয়ে প্রথমেই তার নজব পড়ল মেয়ের কোমরের কাছে ইজেরের কবি এক জায়গায় একটু উল্টো ভাঁজ হয়ে আছে। আর সেই ভাঁজে স্পষ্ট একটা আধুলি আর কয়েকটা খুচরো পয়সার চেহাবা মালুম হচ্ছে।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে খানিক আদর করেছিল সাঁটু। তারপর মেযে ফের গঙ্গাযমুনার কোটে ফিরে গেল, সাঁটু গেল বাজারে বাবুব জন্য সিগারেট আনতে। আর যেতে যেতেই টের পেল, কখন যেন তার হাতে একটা আধুলি দুটো দশ পয়সা আর একটা পাঁচ পয়সা চলে এসেছে। মাইরি ! মা কালীর দিব্যি ! সে টেরও পায় নি কখন আপনা থেকে পয়সাগুলো এসে গেল। একেবারে আপনা থেকে।

এসে যখন গেলই তখন তাকে ভগবানের দেওয়া পয়সা মনে করে সাঁটুলাল তৎক্ষণাৎ নগদানগদি তাড়ি খেয়ে ফিরল। বাবুর বাড়ির ফটকে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী আর তার গা ঘেঁষে কুন্তি। আর যাবে কোথায় ! প্রথমে মেয়েটাই দেখতে পেয়ে চেঁচাল—মা ! মা ! ঐ যে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী ঠিক কলেরগানের পুরোনো বয়ান ছেড়ে যেতে লাগল—বাপের ঠিক নেই, নষ্ট মাগীর পুত, কেলেকুত্তার পায়খানা ! ডোমে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তোকে টেনে ভাগাড়ে ফেলবে। নিব্বংশের ব্যাটা, মেয়েকে পয়সা দিয়ে ডাল আনতে পাঠিয়েছি—আর মেয়েরও বলিহারি বাবা—কোন আক্কেলে তুই ঐ গরুচোরের

ব্যাটাকে সোহাগ দেখাতে গেলি! গেল তো ঘাটের মড়ার আক্কেল দেখ। মেয়ের ইজেরের কষি থেকে পয়সা মেরে দিল। বলি ও ঢ্যামনা, পয়সার জন্য তুই না পারিস কি বল দেখি!

বলত আরো। বাবুর বউ বেরিয়ে এসে চোখা গলায় বলল—দেখ সরস্বতী, ছোটলোকের মতো চেঁচাবে তো দূর হয়ে যাও। সাঁটু, তুমিও এক্ষুনি বিদেয় হও। একটা চোর, আর একটার মুখ আঁস্তাকুড। আমার বাচ্চাটা এ সব শুনে আর দেখে শিখবে। যাও, যাও।

সরস্বতী অবশ্য বাবুর বউকে ভয় খায় না। উল্টে তেজ দেখায়। কিন্তু সেদিন আর বাড়াবাড়ি করে নি। শুধু শাসিয়ে রেখেছিল আটাচাক্কির বিশেকে দিয়ে মার খাওয়াবে। সেদিনই সন্ধের মুখে বিশে সাঁটুকে ধরে দোকানঘরের পিছনে আবডালে টেনে নিয়ে দিলও ঘা কতক। আরো দিত, সুখচন্দ্র সাড়াশব্দে এসে পড়ে বলল—যাক গে, বারো আনা তো মোটে পয়সা। কিন্তু সুখচন্দ্র মাপ করে তো সরস্বতী করে না। সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—মুখ দিয়ে রক্ত বেরোবার পর ছাড়া পাবে। সাঁটুলাল সরস্বতীর পা ধরতে উবু হয়ে বসে বলল—কাল থেকে আর হবে না।

সাঁটুলাল নিজেকে আজও জিজ্ঞেস করে—পয়সাটা কি সত্যিই মেরেছিল সাঁটু। সাঁটু শিউরে উঠে বলে—মাইরি না। মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি। শালার পয়সাগুলোই ফক্কড, বুঝলে। আমাকে জব্দ করতে কোন ফাঁকে সুট করে চলে এল হাতে।

এইসব দুঃখের কথা সাঁটুলাল কাউকে বলতে চায়। উজাড করে বলবে সব। কিন্তু সাধুটা সটকেছে। আছেই বা কে?

গতকাল সাঁঝের মুখে বাবুর বউ নদীয়াল মাছ কিনতে পয়সা দিয়ে পইপই করে বলেছিল—দেখো সাঁটু, পয়সার হিসেব দিও। সবে পোড়ো না।

সাঁটুলাল মনে মনে দিব্যি কেটেছিল—আর নয়। এবার মানুষ হতে হবে। পাঁচজনের কাছে দেখানোর মতো মুখ চাই।

পয়সাটা ফেরত দিত সাঁটু যদি নিজে সে ফিরত। হল কি গ্রহের ফের। বাজারে গিয়ে দেখল নদীয়াল মাছ ওঠেনি। কয়েকটা ন্যাটা চ্যাং মাছ উঠেছে যা বাবুরা খায় না। পয়সা নিয়ে ফিরেই আসছিল। তেমনি সময়টায় হরগোবিন্দ খবর দিল খাড়ুবেড়েয় যাত্রা হচ্ছে। যাবে নাকি সাঁটুলাল? আগুপিছু ভাবনা সাঁটুলালের কোনো কালেই ছিল না। চাঁদনী রাত ছিল। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। বাবুর বাড়িমুখো হতে আর ইচ্ছে হল না তার। মনে মনে ভাবল

—আজকের রাতটাই শেষ পাপ-তাপ করে নিই। কাল থেকে মাইরি—কাল থেকে ভাল হয়ে যাব একেবারে। এই ভেবে তাড়ি খেয়ে নিল প্রাণভরে। তারপর খাড়ুবেড়ের রাস্তা ধরল।

আজ তাই ফিরতে একটু লজ্জা-লজ্জা করছে তার। সরাসরি গিয়ে ঢুকে পড়লে বাবুর বউ বড় চেঁচামেচি করবে।

সাঁটুলাল তাই বাজারের দিকে আটাচাক্কির দোকানে গিয়ে উঠে বলল—কি খবর হে সুখচন্দ্র? ভাল তো?

সুখচন্দ্র বেশ মানুষ। মুখে একটা নির্বিকার ভাব। ঝড় হোক, ভূমিকম্প হোক সুখচন্দ্রর মুখে কোনো শুকনো ভাব নেই। বলল—ভাল আর কই? কাল থেকে নাকি তুমি হাওয়া। বাবুর বাড়িতে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে, যাও।

—যাচ্ছি। বলে সাঁটুলাল বেঞ্চিতে বসে পড়ে। বিশে চাক্কি চালাচ্ছিল। আটা উড়ছে ধুলোর মতো চারদিকে। হুড়ো দিয়ে বলল—যাও যাও। কাজের সময় বসতে হবে না।

সাঁটুলাল দাঁত খেঁচিয়ে বলে—তুমি কে হে। যার দোকান সে কিচ্ছু বলে না তোমার অত ফোপরদালালী কিসের?

লেগে যেত। কিন্তু এ সময়ে সাঁটুর ছেলে বিষ্ণু রাস্তা থেকে উঠে এসে সুখ-চন্দ্রকে বলল—বাবা, মা বলে দিল ফেবার সময় আনাজ নিয়ে যেতে।

সাঁটু প্রাণভরে দেখছিল। তার ছেলে। হ্যাঁ তারই ছেলে। সুখচন্দ্রকে 'বাবা' ডাকছে! আহা ডাকুক। ওর "বাবা" ডাকাব মতো লোক চাই তো। সে নিজে তো আর মানুষ নয়।

ছেলে বেরোলো তো পিছু পিছু সাঁটুলালও বেরোয়। ছেলে কয়েক কদম হেঁটেই পিছু ফিরে বলে—তুমি আসছো কেন?

সাঁটু একটু রেগে বলে—কেন, তোর বাবার রাস্তা?

—তুমি অন্য বাগে যাও। নইলে মাকে বলে দেবো।

—কী বলবি?

—তুমি কুন্তির পয়সা চুরি করেছিলে না? মনে নেই?

—ওঃ চুরি! গঙ্গাযমুনা খেলতে গিয়ে ছুঁড়ি কোথায় পয়সা হারিয়ে আমার ঘাড়ে চাপান দিলে।

—সে যাই হোক, তুমি কাছে আসবে না আমাদের।

—বাপকে কি ভুলে গেলি বিষ্টু?

ছেলে চলে গেল।

পালপাড়ার পুকুরধারে শেফালী ধরল তাকে। গা ধুয়ে ঘরে ফিরছে। দেখতে পেয়ে বলে—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

শেফালী মোটা মানুষ। শরীর ঢিলাঢালা হয়ে গেছে। ঘামাচিতে গা কাঁথার মতো হয়ে আছে। গোলপানা বোম্বা মুখখানা দেখলে কাতলা মাছের মাথার কথা মনে পড়ে। দাঁতে নস্যি দেওয়ার নেশা আছে। একগাল হেসে বলল —খবর শুনেছো নাকি? তোমার যে আবার ছেলে হবে।

ছেলে কি বাতাসে হয়! সাঁটু অবাক হয়ে বলে—আমার ছেলে হবে কি গো!

—ঐ হল! তোমার বউয়ের।

সাঁটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল—কি যে বলো বউঠান!

—বলছি বাপু, শুনে রাখো। তবে এও বলি, সরস্বতীর পেটেরটা যদি তোমার ছেলে না হয় তবে সে তোমাদের সুখবাবুর ছেলেও নয়।

সরস্বতীর ছেলে হবে শুনে সাঁটুলাল খুশীই হল। আহা! হোক, হোক। ছেলেপুলে বড ভালবাসে সরস্বতী। ছেলেপুলে নিয়ে সব ভুলে থাকে।

খুশী মনে সাঁটুলাল বলল—ভাল, ভাল।

ভাল কি! অ্যাঁ। ভালটা কি দেখলে? পাঁচজনে যাই বলুক, আমি তো সুখ বাবুর মুরোদ জানি। ছেলের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা সে মেনীমুখোর নেই। থাকলে আমার বাঁজা বদনাম ঘুচত। তুমি বুঝি ভেবেছো সুখবাবুর ক্ষমতায় কাণ্ডটা হচ্ছে? আচ্ছা দিনকানা লোক তোমরা। এ সুখবাবুর কাজ নয় গো। সাঁট আছে।

—কিসের সাঁট?

থোম্বা মুখে ঢলাঢলি হাসি খেলিয়ে শেফালী বলে—দেখেও দেখ না নাকি! বিশে যে তোমাকে সেদিন খুব ঠেঙাল সে কেন জানো? বিশেকে যে দীনবন্ধুবাবু তার কারবারে বেশী মাইনেয় লাগাতে চেয়েছিল তাতে বিশে গেল না কেন জানো? সে যে এখানে বিশ টাকা মাইনে আর দু'বেলা খোরাকি পেয়ে আঠার মতো কেন লেগে আছে জানো? বোঝো না? বিশে আর সরস্বতীর ভাবসাব দেখেও বোঝো না? চোক কান খোলা রেখে চলবে। তা হলে আর পাঁচজনের কাছে শুনে বুঝতে হবে না। যাও, বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।

ভাবাভাবির কি আছে তা সাঁটুলাল বোঝে না। দিনের মতো পরিষ্কার ব্যাপার। তবে কিনা সাঁটু এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আসল ব্যাপার হল, সরস্বতীর আবার ছেলে হচ্ছে।

বাড়ি ঢুকতেই আগে বাবুর সঙ্গে দেখা। বাগানের রাস্তায় শোয়ানো চেয়ার পেতে

বসে বই পড়ছে। কেবল বই পড়ে। শোনা যায় কলেজের খুব নাম-করা মাস্টার। মেলা বিদ্যা জানে। যদিও ধান আর চিটের তফাত বুঝতে পারে না। তা সে যা হোক, বেশী বোঝেন না বলেই ভাল। বুঝলে বড় মুশকিল।

বাবু মুখ তুলে দেখে বললেন—সাঁটুলাল যে! কোথায় গিয়েছিলে?

—এই আজ্ঞে। কাল থেকে আর হবে না।

—সে জানি। কিন্তু বাড়ির সবাই ভাবছিল খুব।

—আর হবে না।

বাবু রোগা রোগা লোক, বেশী কথা বলে না। শুধু গম্ভীর হয়ে বলল—বিশ্বাসী লোক পাওয়া বড় মুশকিল দেখছি।

ভিতর-বাড়িটা থমথম করছে। বউদি এই সবে দুপুরের ঘুম থেকে উঠল। মুখ-টুখ ফুলে রাবণের মা। তার ওপর এলোকেশী ঠোঁটে শুকনো রক্তের মতো পানের রস। গলায় কপালে ঘাম। আঁচল কুড়োতে কুড়োতে কুয়োতলায় যাচ্ছিল, ভিতরের বারান্দায় তাকে দেখে থমকে গিয়ে বলল—তুমি কার হুকুমে বাড়িতে ঢুকেছো? বেরোও এক্ষুনি।

সাঁটুলাল টপ করে কান ধরে ফেলে বলল—কাল থেকে আর হবে না।

ঘুম থেকে উঠলে মানুষের তখন তখন আর তেমন তেজ থাকে না। বউদিরও রাজ্যের আলিস্যি। হাই তুলে বলল—পয়সাটা ফেরত দেবে তো?

—মাইনে থেকে কাটান দিয়ে দিবো বরং।

—চায়ের জল চড়াও গে যাও। বলে বউদি কুয়োর দিকে গেল।

চায়ের জল চড়ানোর কথা সাঁটুলালের নয়। সে বাইরের কাজের লোক। জল তোলে, গরুর দেখাশোনা করে, দুধ দোয়ায়, বাগান করে, কাপড় কাচে আর ফাই-ফরমাশ খাটে। ঘরের কাজ সরস্বতীর ওপর। রান্না, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁটানো বা মোছা। তাই চায়ের জল করার কথায় অবাক মানে সাঁটুলাল।

কাজ তেমন জানা নেই। তবু পায়ে পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগোলো। রান্নাঘরের দরজা জুড়ে মেঝেয় আঁচল পেতে সরস্বতী শোওয়া। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আহা, ঘুমোক। আবার মা হবে। এ সময়টায় শরীর এলিয়ে যায়। সরস্বতীর হাঁ মুখের কাছে মাছি উড়ছে, বসছে। হাত নেড়ে তাড়াল সাঁটুলাল।

তারপর খুব সাবধানে সরস্বতীকে ডিঙিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সে। কেরোসিনের স্টোভকে জুত করতে পারছিল না। খুটুরমুটুর করে নাড়ছিল। শব্দ পেয়ে সরস্বতী পাশ ফিরে রক্তচোখে চেয়ে বলল—ও কি! রান্নাঘরে ধুলোপায়ে ঢুকেছো যে বড়! বাইরের জামাকাপড় নিয়ে ছিষ্টি ছুঁচ্ছো! তুমি কি মানুষ? সাতবাসী

হেগো মোতা কাপড়। তার ওপর কোথায় কোন আঁস্তাকুড়ে রাত কাটিয়েছো! বেরোও!

সাঁটুলাল সরস্বতীর মুখপানে চেয়ে খুব হাসে। বেশ লাগছে দেখতে। মা হওয়াব চেহারাই আলাদা।

সরস্বতী উঠে বসতে বসতে বলল—চৌকাঠ পেরোলে কেমন কবে বলো তো। আমাকে ডিঙোলে নাকি?

—তা কি কববো!

—কি করব মানে? জলজ্যান্ত মানুষকে ডিঙোতে হয়?

সাঁটুলাল খুব গম্ভীর মুখ করে বলল—পোয়াতি মানুষ যেখানে সেখানে শুয়ে থাকো কেন? এ সময়টায় অসাবধান হওয়া ভাল না।

কে জানে কেন, এ কথায় সরস্বতীব মুখে বন্ধন পড়ে গেল। আর একটাও কথা না বলে উঠে চলে গেল বোধ হয় কুয়োতলায়। একটু বাদে ভেজা মুখচোখ নিয়ে ফিবে এসে বলল—সরো, আমি চা কবছি।

সাঁটুলাল সরল বটে, কিন্তু গেল না। দরজাব চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সরস্বতীর দিকে। সরস্বতী টেব পাচ্ছে তবু চোখ তুলে তাকাচ্ছে না।

সবস্বতী তাকাচ্ছে না বলে যে সাঁটুকে খাতির দেখাচ্ছে তা নয়। আসলে এই পোড়ামুখখানা দেখাতে তার ইচ্ছেই করে না।

স্টোভের সলতে কমে গিয়েছিল। টিনের চোঙগুলো খুলে সরস্বতী সলতে টেনে বড করে দেশলাই জেলে সলতে ধবাল। কেটলি চাপিয়ে কেরোসিনের হাত ধুতে গেল উঠোনবাগে। দেশলাইটা পড়ে রইল মেঝেয়।

সাঁটুলালের দেশলাই ফুরিয়েছে। সেই আধখানা কাঠি দিয়ে কখন একটা বিড়ি খেয়েছে। ভাবাভাবির বড ঝামেলা। দেশলাইটা তুলে নিয়ে সাঁটু সরে পড়ল। রাজ্যের কাজ পড়ে আছে। জল তুলতে হবে, গরুর জাবনা দিতে হবে, গোয়ালে ধোঁয়া। তার আগে আবডালে কোথাও বসে ভরপেট বিড়ি খাবে এখন।

তেঁতুলের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে সাঁটুলাল পশ্চিম আকাশে রঙের বাহার দেখছিল। বিড়ি খেলে মাথাটা খুলে যায়। সব ভাল লাগে কিছুক্ষণ। তাড়ি খেলে আরো খোলে। গাঁজা খেলে তো স্বর্গরাজ্য হয়ে যায় দুনিয়াটা।

বিড়িটা যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন বাবুর ছ বছরের মেয়ে বাবলি এসে পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরল—সাঁটুদা, তুমি পয়সা চুরি করে পালিয়েছিলে?

সাঁটু একগাল হেসে বলে—না। মাইরি না।

—আমি জানি। তুমি পয়সা চুরি করে কাল চলে গিয়েছিলে। কান ধরো।

সাঁটু কান ধরে জিভ কেটে বলে, ছি ছি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। কাল থেকে আর করব না।

রোজ নতুন নতুন সব ব্যাপার শিখছে বাবলি। আজকাল ইস্কুলে যায়। ইস্কুল থেকে কত কি শিখে আসে। যেমন এখন বাবলি একটা শুকনো গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে বলে—হাত পাতো।

সাঁটু হাত পাতে। বাবলি দুর্বল হাতে গাছের ডালটা দিয়ে সাঁটুর হাতে মারে। বলে, আর করবে?

—না গো।

—নীলডাউন হও।

সাঁটু নীলডাউন হয়।

আর কি করবে ভেবে না পেয়ে বাবলি বলে—আচ্ছা, হয়েছে। মেরেছি তো! শাস্তি দিয়েছি তো! এস, এবার আদর করি।

বলে কাছে এসে বাবলি সাঁটুর মাথাটা নিজের কাঁধে চেপে ধরে চুলে হাত বুলিয়ে বলে—ষাট, ষাট, ষাট। লেগেছে সাঁটুদা?

বড় যন্ত্রণা হল সাঁটুর বুকটার মধ্যে। এক পুকুর জল উঠে আসতে চায় চোখে। মাথা নেড়ে বলে—না, না, লাগে নি। আমি চোর খুকুমণি, তাই আমার ছেলেপুলেরাও আমাকে ঘেন্না পায়। তুমি রোজ মেরো আমাকে। বুঝলে?

—এমন শাস্তি দেবো তোমাকে রোজ সাঁটুদা, দেখবে ভয় পেও না, আবার ষাট করে দেবো।

ভিতর-বাড়িতে দেশলাই নিয়ে ফের চেঁচামেচি হচ্ছে। হোক। সব দিকে কান দিলে হয় না। সাঁটুলালের অনেক কাজ। তাই উঠে গোয়ালঘরের দিকে গেল।

সন্ধের পর বাগানের রাস্তা থেকে বাবুর শোয়ানো চেয়ার আর জল বা চা রাখবার ছোট টুল তুলতে গিয়ে সাঁটুলাল সিগারেটের প্যাকেটটা পেয়ে গেল। তাতে দু' দুটো আস্ত সিগারেট। সাঁটু খুব অভিমানভরে ভাবল, নিলে লোকে বলবে চোর। কিন্তু এই যে হাতের নাগালে দুটো সিগারেট তার ভাগ্যে পড়ে আছে, এর মধ্যে কি ভগবানেরও ইচ্ছে নেই?

সাঁটু সিগারেটের প্যাকেটটা কামিনীঝোপের মধ্যে গুঁজে রেখে দিল। রাতে ভাত খাওয়ার পর জমবে ভাল।

রাতের কাজ সেরে সরস্বতী বিদেয় নিয়েছে। বিকেলে দেশলাই নিয়ে আজ আর বেশী চেঁচায় নি। মুখোমুখি দেখা হতে তেমন চোখে চোখে তাকায়ও নি লাল চোখ করে। বাবু আর বউদিও আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুতে গেল।

বাইরের বারান্দায় শতরঞ্চি আর একটা কাঁথা পেতে শুয়ে সিগারেট টানছিল সাঁটুলাল। ঠিক সে সময়ে অন্ধকার ফুঁড়ে সরস্বতী উঠে এসে বলল—আমি পোয়াতি—এ কথা কে বলল তোমায়?

সাঁটু শুয়ে শুয়েই ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে—আমার সঙ্গে থাকতে তিনবার হয়েছিলে, লক্ষণ সব চিনি কি না। বলবে আবার কে?

সরস্বতী উবু হয়ে বসে বলে—মিছে ব'লো না। শেফালী কুচ্ছো গেয়ে বেড়াচ্ছে। তার কাছেই শুনেছো। আচ্ছা পাজী মেয়েছেলে যা হোক। নিজের হবে না, অন্যের হলে শতেক দোষ খুঁজবে। এসব কথা জানাজানি হলে সুখকর্তা আর রাখবে ভেবেছো?

সাঁটুলাল মাথা চুলকোয়।

সরস্বতী আস্তে করে বলল—শোনো, তুমি সুখচন্দ্রকে বুঝিয়ে বলবে যে, তোমার সঙ্গে যখন থাকতুম তখনো আমার চরিত্রের দোষ ছিল না, এখনো নেই। বুঝলে? তোমার মুখের কথার দাম হবে। নইলে সুখচন্দ্র আজ রাতে ঐ মাগীর কাছে থাকতে গেছে, রাতভর এমন বিষ ঢালবে কানে যে, পুরুষটা বিগড়োবে। কালই গিয়ে সুখচন্দ্রের সঙ্গে বসে নানা কথার মধ্যে এক ফাঁকে কথাটা তুলো।

উদাসভাবে সাঁটুলাল বলে—তুলব'খন।

—তুলো! তুমি লোক খারাপ নয় আমি জানি। দুটো টাকা রাখো। বলে আঁচলের গেরো খুলে ভাঁজ-করা টাকা বের করতে যায় সরস্বতী।

ভারী লজ্জা পায় সাঁটুলাল। বলে—আরে থাক, থাক। ওসব রাখো।

—নাও। বিড়িটিড়ি খেও। মাসে দশ টাকা মাইনে পাও, তাতে কি হয়। রাখো এটা। আমি দোর ভেজিয়ে রেখে চলে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—হ্যাঁ, যাও। চারিদিকে ভারী চোর-ছ্যাঁচোড়।

—সে জানি। বলে সরস্বতী আঁধারে মিলিয়ে যায়।

সাঁটুলাল দু'নম্বর সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলে। সরস্বতী বলে গেল, সে নাকি ভাল লোক। সত্যিই কি আর বলেছে! মন রাখা কথা। কিন্তু যদি সত্যিই তাকে ভাল লোক বলে জানত সবাই।

হাতের সিগারেটটার দিকে চেয়ে রইল সাঁটুলাল। ভারী রাগ হল নিজের ওপর। আচমকা সিগারেটটা প্রায় আস্ত অবস্থায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের দু' গালে ঠাসঠাস করে কয়েকটা চড় দেয়।

রাগ তাতে কমে না। নিজের ঘাড় ধরে নিজেকে তোলে সে। তারপর

নিজেকে নিয়ে ফটকের বার করে দিয়ে বলে—যা হারামজাদা আহম্মক ছ্যাঁচড়া চোট্টা কোথাকার! ফের যদি আসিস তো জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।

এই বলে হাত ঝেড়ে সাঁটুলাল ফিরে আসে। কালই গিয়ে সুখচন্দ্রকে বুঝিয়ে আসবে যে, সরস্বতী বড় সতী মেয়ে। তার গর্ভে সুখচন্দ্রেরই ছেলে। আর টাকা দুটোও ফেরত দেবে সরস্বতীকে। সে ঘুষ-টুষ খাবে না আর। পুরোনো সাঁটুলাল বিদেয় নিয়েছে।

খুব আনন্দে খানিক ডগমগ হয়ে বসে রইল সাঁটুলাল। মনটা ভারী বড়সড হয়ে গেছে। বুকে যেন হাওয়া-বাতাস খেলছে। প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

কামিনীঝোপের নিচে পড়ে থাকা সিগারেটটা ধোঁয়াচ্ছে। এখনো অনেকটা রয়েছে। খামোকা পয়সা নষ্ট।

সাঁটুলাল গিয়ে সিগারেটটা তুলে আনল ফের। বসে বসে মনের সুখে টানতে লাগল। দেশলাইটা নেড়ে দেখল অনেক কাঠি রয়েছে। বাঁ ট্যাঁকে সরস্বতীর দেওয়া টাকাটা।

সাঁটুলাল ভাবল—এই শেষ পাপ-তাপ বাবা। কাল থেকে ভাল হয়ে যাচ্ছি।

পুনশ্চ

বিজু বলল—আমি যাচ্ছি মা।

সুচেতা বিজুর থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুক করে শব্দ করে বলল—এসো। দেরি কোরো না! টিফিন খেয়ো। জলের বোতল নিয়েছো তো ভরে।

বিজু বিরক্ত হয়ে বলে—আজ ম্যাচ আছে। বোতল-টোতল কেন একগাদা দিলে? কত বই, টিফিন বাক্স! রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় আমি গাধার মতো মোট বয়ে নিয়ে যাই।

—দূর পাগল! সবই কাজে লাগে। কিচ্ছু ফেলনা নয়।

—একদিন সব হারিয়ে আসবো দেখো।

ছেলের লম্বাটে ছিমছাম চেহারা, সতেজ মুখের দিকে চেয়ে সুচেতা কয়েক পলক মুগ্ধ থাকে। এই তার রক্তের ডেলা, তার আপন সৃষ্টি, তার গাছের মহার্ঘ ফল। ফের ভাবে, নজর লাগল বুঝি!

তাই বিজুর বাঁ হাত টেনে নিয়ে দাঁতে একটু কামড়ে গায়ে থুঃ থুঃ করে বলে—সাবধানে যাবে। খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ো না।

বিজু পিঠে ব্যাগ নেয়, কাঁধে বোতল ঝোলায়। তারপর বুটের শব্দ তুলে সতেজ পায়ে বেরিয়ে যায়।

২

সারাদিন হাওয়া বয় তিনতলার ঘরদোরে। খুব হাওয়া। টুকটাক কাজ আর সুচেতার শেষ হতে চায় না। কোলের মেয়েটা জ্বালায় বড। হাম হয়েছে। সারা বাড়ি হামা টেনে বেড়াচ্ছে। মেঝেয় পেচ্ছাপ কবে সেই জলে থাপুর-থুপুর করে দুই হাতে।

—এই রে! দেখেছো! বলে উনুন থেকে কড়া নামিয়ে রেখে সুচেতা ছুটে যায়। হামে যদি ঠাণ্ডা লাগে তবে বিপদ। অরুন্ধতীর ছেলেটা হাম বসে মরতে চলেছিল।

মেয়েকে কোলে নিয়ে আঁচলে তার হাত পা মোছায়, জাঙ্গিয়া পাল্টে দেয়। পেচ্ছাপের জায়গাটা মোছে। মেয়েকে খেলা দিয়ে আবার গিয়ে চাপড়ঘণ্টের কড়া চাপায়।

এইভাবেই যৌবন শেষ হয়ে আসে বুঝি! এই তিনতলার ঘরে সংসারে আবদ্ধ জীবন। বেড়ানো, খেলানো নেই, কলেজ জীবনের আড্ডা নেই, রোমাঞ্চ নেই।

শমীক সন্ধে পার করে এল।

সুচেতা তাকে চা দিয়ে কাজে বসে বলল—কী ভেবেছো বলো তো?

—কী ভাবলাম? শমীকের ভীতু গলায় জবাব।

—এইভাবে আমাকে নিঙড়ে শেষ করবে? এর চেয়ে যে ঝি-গিরি অনেক সম্মানের। খাটাচ্ছো, কিন্তু শখ-আহ্লাদও পূর্ণ করবে তো। স্বার্থপর কেন বলো তো?

৩

বিজু ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে কলেজে ভর্তি হল। মেয়ে চন্দনা সিক্স থেকে ফার্স্ট হচ্ছে। ভাল নাচে, গায়।

এক-আধদিন আজকাল শমীক বলে—বড্ড টায়ার্ড লাগে।

—কেন?

—কী জানি। লো প্রেশারটা তো আছেই।

—আমারও মাথা ঘোরে। হজম হয় না।

শমীক বলে—চলো তো দুজনেই ডাক্তারের কাছে যাই আজ।

পাড়ার চেনা ডাক্তার দুজনকেই দেখে বলেন—তেমন কিছু নয়। মিসেস চ্যাটার্জিকে নিয়ে একটু ঘুরে-টুরে আসুন কোথাও।

সুচেতা বলে—ওঁকে ভাল করে দেখুন।

—দেখেছি।

—কী?

—কিছু নয়। চল্লিশের পর শরীরে ক্ষয় শুরু হয়। ও সব একটু-আধটু অসুবিধে এখন থেকে হবে। একটু একসারসাইজ দরকার।

সুচেতা ভাবল চল্লিশের ওপর? এই সেদিনও তার বরটি মাত্র চব্বিশের ছিল যে! হিসেবে অবশ্য তাই হয়। সে নিজেও আটত্রিশ ছুঁল।

৪

বরপক্ষ চন্দনাকে একবারে পছন্দ করল।

ছেলের বাবা বললেন—দেনা-পাওনার কথা ওঠে না। যা দেওয়ার মেয়েকে দেবেন। ছেলের কিছু চাই না, শুধু লক্ষ্মীমন্ত বউ চাই।

শমীক অলক্ষে সুচেতার দিকে তাকায়। সুচেতার মুখেচোখে মেয়ের জন্য অহংকার। শমীক অতটা খুশী নয়। মেয়ে তার প্রাণ। মেয়ের বিয়ে হলে থাকবে কী করে?

রাত্রিবেলা শুয়ে জনান্তিকে সুচেতাকে বলল—তুমি তো বিয়ের নামে টগবগ করছো। আমি থাকবো কী করে?

—আমিও তো মা।

—আমার বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে।

—টাকার কথা ভাবছো?

—সে ভাবনাও আছে। কিন্তু চন্দিকে ছেড়ে থাকা।

—ভেবো না। সয়ে যাবে।

—মেয়েরা বড় নিষ্ঠুর।

—মেয়েরা নয়, তোমরাই। আমাকে যখন আমার বাপ মার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে তখন এত মায়া কোথায় ছিল?

শমীক চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে—কিন্তু চন্দির কথা আলাদা।

—সকলের কাছেই নিজের মেয়ে আলাদা।

—তুমি হার্টলেস।

—জানোই তো।

শমীক ঘুমোলো। কিন্তু সুচেতা জেগে রইল। একবার উঠে গিয়ে পাশের ঘরে ঘুমন্ত মেয়েটাকে দেখে এল। মাঝরাতে নীরবে চোখের জল ফেলল কিছুক্ষণ। বিজু বিদেশে। মেয়েও চলল শ্বশুরঘর।

৫

বাথরুম থেকে ঘরে আসতে পারছিল না শমীক। কী দূর হয়ে গেছে ঘর! কত দূর! তার গলার স্বর পৌঁছোয় না ঘরে সুচেতার কাছে। তবু সে প্রাণপণে ডাকে—সুচেতা! ডাকটা ফোটে না। অস্ফুট গোঙানির শব্দ হয়।

শেষ রাতে সুচেতা টের পেল, শমীক বিছানায় নেই। অনেকক্ষণ নেই। চমকে ওঠে বুক। বয়সটা ভাল নয় তো! উঠে সে স্বামীকে খোঁজে।

বাথরুমে যখন খুঁজে পায় তখন শমীকের জ্ঞান নেই। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। হাত পায়ে খিঁচুনি।

ডাক্তার বলল—মাইলড্ স্ট্রোক। এরপর থেকে কিন্তু খুব সাবধান।

খবর পেয়ে দুর্গাপুর থেকে কর্মব্যস্ত বিজু এল। মুখ থমথমে, গম্ভীর।

চন্দনা এল তার তিন বছর আর দু মাসের দুই বাচ্চাকে নিয়ে। বাবার শিয়রে বসে রইল ভাইবোনে। সুচেতা নাতি নাতনী সামলাতে লাগল।

শমীক বলল—তোরা অমন ভেঙে পড়িস না। আমি এখন ভাল আছি।

চন্দনা কাঁদতে থাকে। বিজু ছুটি বাড়ানোর দরখাস্ত পাঠায়।

শমীক সেরে ওঠে।

যাওয়ার আগে বিজু একদিন আড়ালে মাকে বলে—সব সময় তো বিয়ে-বিয়ে করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছো। ভাল পাত্রী পেয়েছো তো বলো কবে ফেলি।

—তিন তিনটে হাতে রেখেছি। এবারই দেখে পাকা কথা দিয়ে যা।

বিজু খুব লাজুক স্বরে বলল—আর একটা দেখাত' আছে, বলো তো তোমাদের দেখিয়ে দিই।

—ওমা! তাই বলি—বলে সুচেতার গালে হাত।

৬

বিরক্ত হয়ে শমীক বলল—সবই কি আর মনের মতো হয়? মানিয়ে নিতে হবে।

সুচেতা বলে—তুমি পুরুষমানুষ, আত্মভোলা শিবের জাত। মানিয়ে নিতে পারো। মেয়েরা পারে না।

শমীক মৃদু হেসে বলে—পারো না কেন? মেয়েরা বড় জেলাস, কারো সঙ্গে কারো বনে না। ছেলের বউ তো শাশুড়ির চিরকালের শত্রু।

—না মশাই, আমি আমার শাশুড়ির শত্রু ছিলাম না। তুমি কি ভাবো তোমার ছেলে যে বউটি ঘরে এনেছে সে আমার নখের যুগ্যি ?

—তা বলছি না।

—তাই বলছো। জানো না বলেই বলছো। অত দেমাক কিসের ওর ? গায়ের রংটা একটু কটা আর এম-এ পাস—যোগ্যতা তো এটুকুই। এম-এ পাস নই বলে আমরাও কম যাই নাকি ?

—ঐ তো জেলাসির কথা। তোমাকে কম কে বলছে ?

—অনেকে হয়তো ভাবে। তুমিও বউকে আশকারা দাও, বউকে কিছু বললে ছেলেরও মুখ ভার। না বাপু, দুর্গাপুরে আর নয়। কলকাতা চলো। ছেলের সংসারে ঢের হয়েছে।

৭

জামাই রবীনের পাতে আরো একটু মুর্গী দিয়ে সুচেতা হাসিমাখা মুখে বলে—বলছেই না যখন—

রবীন মুখ তুলল না। চিন্তিতভাবে চুপ করে রইল।

চন্দনা টেবিলের অন্য ধার থেকে বলে—বলবে কী করে ? একা ওই-ই তো সংসারের সব খরচ চালায়। ভাইরা কিছু দেয় নাকি ? যাও বা দেয় শাশুড়ি তা ব্যাংকে জমা করেন। বড় ছেলেই চক্ষুশূল।

শমীক এসব কথা পছন্দ করে না। সে প্রাচীনপন্থী মুখখানা বিভীষণ করে খাচ্ছিল। অর্ধেক খেয়ে উঠে গেল কিছু না বলে।

সুচেতা লক্ষ্য করে ব্যাপারটা। তবু মেয়ের স্বার্থ তাকে তো দেখতেই হবে। সে মৃদুস্বরে বলে—সংসারের শান্তি চাইলে কিছু অপ্রিয় কাজও করতে হয়। আমি বলি কি, একটা আলাদা বাসা করে চলে এসো তোমরা। আমার কাছাকাছি চলে এসো, ছেলেমেয়ে আমিও দেখতে পারব'খন।

রবীন জবাব দেয় না। কিন্তু কথাটা ভাবে।

চন্দনা বলে—আমিও তো কবে থেকে তাই বলছি। ও কেবল বাপ মায়ের প্রতি কর্তব্যের নামে থাকতে চায়।

সুচেতা বলল—কর্তব্য দূরে থেকেও করা যায়! বরং বেশীই করা যায়। থোক টাকা দেবে মাসে-মাসে।

রবীন একবার চন্দনার দিকে রাগ-চোখে চায়। কিন্তু বাদে সেও প্রায় ভরা পাত ফেলে ওঠে।

রাতে শমীক সুচেতাকে বলে—এসব প্রশ্রয় দিচ্ছো! পরে ভুগবে।

—আহা, কী কথা। জামাই তার সব রোজগার সংসারে ঢালছে, মেয়েটার ভবিষ্যৎ নেই? দুটো পয়সা রাখতে পারছে না।

শমীক রাগ করে পাশ ফিরে শোয়।

৮

মস্ত প্রোমোশন পেয়ে বিজু বদলী হয়েছে কলকাতায়। বউ হাসনু আর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে হৈ-হৈ করে এসে হাজির হল একদিন।

সুচেতার আনন্দ ধরে না। শমীকের গম্ভীর মুখে খুশীর বেলুন ফাটল।

সুচেতা বলল—বলতে নেই বৌমা, তোমার শরীরটা একটু সেরেছে। বিয়ের সময় যা রোগা ছিলে।

—দুর্গাপুরের জল ভাল মা।

—কলকাতায় এলে তো। এবার বুঝবে।

—তা হোক মা, দুর্গাপুরে লাইফ নেই। এখানে কত লোকজন, আলো। ওখানে যেন মৃত্যুপুরী। কতদিন থেকে আসবো আসবো করছি।

খুব সাবধানে সুচেতা জিজ্ঞেস করে—এ বাড়িতেই থাকবে তো! নাকি—?

হাসনু মাথা নত করে বলে—ওকে তো অফিস থেকে আলাদা ফ্ল্যাট দেবে।

সুচেতা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। হাসনু বলে—ওর অবশ্য আপনাদের কাছেই থাকার ইচ্ছে।

—শুধু ওর ইচ্ছেয় তো হওয়ার নয় মা, তোমারও ইচ্ছে থাকা চাই।

হাসনু জবাব দেয় না।

৯

পর্দার আড়াল থেকে সুচেতা শুনল, হাসনু বিজুকে বলছে—অফিসের ফ্ল্যাটের কী হল?

—নিচ্ছি না। এই তো বেশ আছি। মা বাবার কাছে। ছেলে-মেয়ে দুটো দাদু ঠান্নু বলতে অস্থির।

বাইরে থেকে তো ভালই লাগছে। এদিকে যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। চন্দনা আর রবীন কাছেই ফ্ল্যাট নিয়েছে, রোজ আসে।

—তাতে কী?

—কী আবার। মায়ে মেয়েতে দিনরাত গুজগুজ ফুসফুস। কী বলে কে জানে! বিয়ের পর মেয়েদের বাপের বাড়ির সঙ্গে অত মাখামাখি কেন থাকবে? ওর বরটাও ম্যাদাটে মার্কা। শ্বশুরবাড়ি বলতে অজ্ঞান।

—বাদ দাও।

—কেন বাদ দেবো? অশান্তির শুরু এইভাবেই হয়। আমি কিছুতেই এখানে থাকবো না। তুমি ফ্ল্যাটে চলো। মাসে মাসে বরং থোক টাকা দিও।

—মা বাবা যে বড্ড একলা হয়ে পড়বেন।

—সে ভাবতে হবে না। মেয়ে কাছে এসে উঠেছে। একলা কিসের? বরাবরই দেখেছি মাব টান তোমার চেয়ে চন্দনার ওপর বেশী। আমার ছেলেমেয়েদের চাইতে চন্দনার ছেলেমেয়েবা এ বাড়িতে ঢের বেশী আদর পায়।

—যাঃ, ও তোমাব মনের ভুল।

—আমি খুকী নই। তুমি স্নেহে অন্ধ বলে দেখতে পাও না। নইলে ব্যাপারটা দিনের আলোব মতো পবিষ্কার।

আড়ালে স্বচেতা চোখের জল মোছে। ওবা থাকবে না।

১০

জয় বলল—আমি যাচ্ছি মা।

হাসনু জয়ের মাথাটা দুহাতে ধরে একটু আদর করে বলল—এসো গিয়ে। টিফিন খেয়ো কিন্তু। ওয়াটার বটলটা ভুলে যেয়ো না।

জয় বিরক্ত হয়ে বলে—নিয়েছি নিয়েছি।

হাসনু ছেলের লম্বাটে ছিপছিপে চেহাবাটা একটু দূব থেকে দেখে। মুখখানায় বুদ্ধির ঝিকিমিকি। দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। তাবপর হঠাৎ খেয়াল হয়, ওরকমভাবে দেখতে নেই। আজকাল সে এসব সংস্কাব মানে। ছেলেব চোখের আড়ালে সে একটু হাতজোড কবে ঠাকুরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে—ভাল রেখো।

বিজু অফিসে, জয় স্কুলে। মেয়েটা এক মনে ছবি আঁকছে। আবোল-তাবোল ছবি। জ্বর থেকে সদ্য উঠেছে।

হাসনু মেয়েকে বলে—ধিয়া, দুধ খেলি না?

—না। বমি পায়।

সারাদিন হাসনুর কাজের শেষ নেই। কিছুই তাকে নিজের হাতে করতে হয় না। আয়া, চাকর, রাঁধুনি আছে। তবু সবদিকে চোখ রাখতে হয়। সারা বাড়ি ছুটতে হয়।

সন্ধে পার করে বিজু এল। হাসনু তার মুখোমুখী বসে বলে—কী ভেবেছো বলো তো!

—এরকম ভাল সন্ধে কাটানো যায়? এর চেয়ে ঝি-গিরি ভাল ছিল। তোমার সংসার দেখছি, আমারও তো কিছু সাধ আহ্লাদ তোমাকে দেখতে হবে!